কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ২০
রকিব হাসান
সেবা

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম-২০

(খুন! + স্পেনের যাদুকর + বানরের মুখোশ)

রকিব হাসান

ভলিউম ২০

তিন গোয়েন্দা

৭০, ৭১, ৭২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1181 X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও বক্স. ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল· ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Volume-20
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

উনপঞ্চাশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৩/-
তি. গো. ভ ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৩৭/
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৮৩ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি) ৪৩/-

---

খুন!

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯৩

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যালান কিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকালেন বাগানের দিকে। বড়সড় শরীরের মানুষ, ফ্যাকাসে রক্ত শূন্য মুখ। গম্ভীর স্বভাব, কিন্তু এই মুহূর্তে পাতলা এক চিলতে হাসি বেশ আকর্ষণীয় করে তুলল চেহারাকে।

বাগান ভালবাসেন তিনি। বসন্ত চলছে এখন। এই সময়টাতেই সব চেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে বাগানটা। হাসি ফুটেছে সে জন্যেই। রঙে রঙে ঝলমল করছে বাগান, বাতাসে ফুলের সুবাস।

গেট খোলার শব্দে ফিরে তাকালেন তিনি। কে এল? আরি! আশ্চর্য! একে তো আশা করেননি! কল্পনাই করেননি এই সময়ে এখানে এসে হাজির হবে ও!

প্রায় চিৎকার করে বললেন কিন, 'কিশোর পাশা, তুমি?'

কোন ভুল নেই। রকি বীচের বিখ্যাত তিন গোয়েন্দার প্রধান কিশোর পাশাই ঢুকেছে তাঁর বাগানে।

'হ্যাঁ,' কাছে এসে জবাব দিল কিশোর, 'আমিই। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম কোনদিন এদিকে এলে দেখা না করে যাব না। কথা রাখলাম।'

'খুশি হলাম,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন কিন। 'বসো। চা খাবে?' বাগানে পেতে রাখা কয়েকটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন তিনি।

'না,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল কিশোর। 'ঠাণ্ডা কিছু থাকলে দিতে পারেন। কোক-টোক।' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'যা গরম পড়েছে।'

'তারপর?' আরেকটা চেয়ারে বসলেন কিন, 'এদিকে কি মনে করে? বেড়াতে?'

'না। কাজ।'

'কাজ? এখানে? এরকম নিরালা জায়গায়?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, অপরাধগুলো নিরালা জায়গাতেও ঘটে।'

হেসে উঠলেন কিন। 'তা ঘটে। গাধার মত কথা বললাম। তা কোন অপরাধের তদন্ত করতে এসেছ? নাকি আমার জানতে চাওয়াটা উচিত না?'

'না, জানতে পারেন। বরং আমি চাইছিলাম আপনি জিজ্ঞেস করুন।'

কৌতূহল ফুটল কিনের চোখে। কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে ছেলেটা। বললেন, 'অপরাধের তদন্ত করতে এসেছ।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'জঘন্য কোন অপরাধ?'

'জঘন্যতম।'

'তুমি বলতে চাইছ…'

'হ্যাঁ। খুন।'

এমন ভাবে কথাটা বলল কিশোর, থমকে গেলেন কিন। সরাসরি তাকালেন কিশোরের দিকে। ছেলেটার চোখে এমন কিছু দেখলেন যা আবার দ্বিধায় ফেলে দিল তাঁকে। কি বলবেন যেন বুঝতে পারছেন না। অবশেষে বললেন, 'কিন্তু এখানে কোন খুন হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

'না। আপনার শোনার কথাও নয়।'

'কে খুন হলো?'

'এখনও কেউ হয়নি।'

'কী?'

'সে জন্যেই তো বললাম শোনার কথা নয়। এমন একটা অপরাধের তদন্ত করছি আমি যেটা এখনও ঘটেইনি।'

'কি বোকার মত কথা বলছ।'

'মোটেও না। খুনটা হয়ে যাওয়ার আগেই তদন্ত শুরু করে দেয়াটা ভাল না? হয়ে গেলে তো আর কিছু করার থাকে না। আগে থেকে চেষ্টা করলে ঠেকানো সম্ভব।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কিন। 'মনে হচ্ছে তুমি মজা করছ, কিশোর!'

'একটুও না।'

'সত্যিই একটা খুন হবে একথা তুমি বিশ্বাস করো?'

'কোকের কথা বলেছিলাম মিস্টার কিন,' কিশোর বলল। 'ফ্রিজে আছে, না? নিয়ে আসি।' কিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল কোকের বোতল নিয়ে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম আর গেলাস রাখা আছে। একটা গেলাসে কোক ঢেলে বড় করে চুমুক দিয়ে তাকাল কিনের দিকে। প্রশ্নটার জবাব দিল এতক্ষণে, 'হবে, যদি আমরা সময়মত সেটা ঠেকাতে না পারি।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমরা। আপনার সহযোগিতা আমার দরকার।'

'সে জন্যেই এসেছ?'

আবার কিনের দিকে তাকাল কিশোর, আবার তার দৃষ্টি অস্বস্তিতে ফেলে দিল ভদ্রলোককে।

'আমি এসেছি মিস্টার কিন, আমি আপনাকে পছন্দ করি বলে।'

গেলাসে চুমুক দিল আবার কিশোর। কথা বলল, বদলে গেছে কণ্ঠস্বর, 'আরি, মিস্টার কিন, একটা ভীমরুলের চাক দেখছি। সাংঘাতিক বিষ তো ওগুলোর। বাগানে রেখেছেন, মেরে ফেলা দরকার। কখন হুল ফোটায়...'

আচমকা এই প্রসঙ্গ পরিবর্তন আরও অবাক করল কিনকে। কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাসাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মারব। তবে আমি না, টম এসে মারবে। টমাস ডিফারসনের কথা মনে আছে? সেদিন রাতে ডিনারে একই

পার্টিতে ছিল আমাদের সাথে? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম? সে-ই আসছে আজ পোকাগুলোকে মারতে। এসব কাজ করতে নাকি তার ভাল লাগে।'

'তাই? তা, কি করে মারবে?'

'পেট্রল দিয়ে। বাগানের গাছে ওষুধ দেয়ার সিরিঞ্জে ভরে ছিটিয়ে দেবে বাসার ওপর। বলেছে নিজের সিরিঞ্জ নিয়ে আসবে। আমারটার চেয়ে নাকি ওরটা বড় আর ভাল।'

'আরও একটা জিনিস দিয়ে মারা যায়, তাই না? পটাশিয়াম সায়ানাইড।'

হালকা বিস্ময় দেখা দিল কিনের চোখে। 'যায়। কিন্তু সেটা বিপজ্জনক। ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'হ্যাঁ। মারাত্মক বিষ।' পুরো এক মিনিট চুপচাপ গেলাসে চুমুক দেয়ার পর আবার বলল একই কথা, 'মারাত্মক বিষ।'

'শাশুড়ির জ্বালাতন থেকে রক্ষা পেতে এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর নেই।' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসলেন কিন।

কিন্তু কিশোর হাসল না। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'মিস্টার কিন, পেট্রল দিয়েই ওগুলোকে মারবে টম, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'না, ভাবছি। হলিউডের একটা কেমিস্টের দোকানে গিয়েছিলাম আজ। আমার কয়েকটা কেমিক্যাল কেনার দরকার হয়েছিল। কিনতে গিয়ে সই করতে হয়েছে রেজিস্টারে। পয়জন বুক। ওই যে, বিষাক্ত রাসায়নিক কিনতে চাইলে যাতে সই করতে হয় ক্রেতাকে, নামঠিকানা লিখতে হয়। আমার আগের সইটা দেখলাম। টমাস ডিফারসন। পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনেছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিন। 'অবাক কথা শোনালে তো। টমাস আমাকে বলল, 'ওই জিনিস ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারে না সে।'

কয়েকটা ফুলগাছের ওপর চোখ বোলাল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে যেন ছুঁড়ে মারল প্রশ্নটা, 'টমাস ডিফারসনকে আপনি পছন্দ করেন?'

তাকিয়েই রয়েছেন কিন। আরেকটা ধাক্কা খেয়েছেন। ছেলেটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাঁকে। একের পর এক এমন সব কথা বলছে...আমতা আমতা করে বললেন, 'ইয়ে...আমি... মানে...নিশ্চয় করি। পছন্দ করি। কেন করব না?'

'না, ভাবছি আরকি। সত্যি করেন কিনা।'

জবাব দিলেন না কিন।

আশাও করেনি কিশোর। নিজেই বলল আবার, 'ভাবছি সে আপনাকে পছন্দ করে কিনা।'

'কি বলতে চাইছ তুমি, কিশোর? কিছু একটা ভাবছ তুমি। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, বুঝিয়েই বলি। বিয়ে করার জন্যে এনগেজমেন্ট করেছিলেন আপনি। মিস শীলা হেণ্ডারসনকেও চিনি আমি। রকি বীচেই থাকে তো। খুব সুন্দরী। চোখে পড়ার মত। আপনার সঙ্গে এনগেজমেন্ট করার আগে টমাস ডিফারসনের সঙ্গে

করেছিল। আপনার জন্যেই তাকে বাদ দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন কিন।

'কেন একাজ করল শীলা, জিজ্ঞেস করিনি তাকে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কিন্তু যত কারণই থাক, ব্যাপারটা সহজ ভাবে মেনে নেবে টমাস, এটা না-ও হতে পারে।'

'ভুল করছ, কিশোর। বাজি রেখে বলতে পারি তোমার অনুমান ভুল। টম স্পোর্টসম্যান। সব কিছুকেই খেলা হিসেবে নিতে পারে। জিততেও পারে হারতেও পারে, এরকম মনোভাব। আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। বন্ধুর মত।'

'সেটা অস্বাভাবিক লাগেনি আপনার? বলছেন ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু আপনার বলার ভঙ্গিতে তো মনে হয় না আপনি তাকে ভাল চোখে দেখেন।'

'মানে?'

'মানে সহজ।' আরেক রকম হয়ে গেছে কিশোরের কণ্ঠস্বর, 'তীব্র ঘৃণা মনে চেপে রেখে হাসিমুখে সুযোগের অপেক্ষা করতে পারে অনেক মানুষ।'

'ঘৃণা?' মাথা নাড়তে নাড়তে আচমকা হেসে উঠলেন কিন।

'অতিরিক্ত চালাক মানুষও অনেক সময় বোকা হয়ে যায়। ভাবে সবাইকে ঠকিয়ে যাবে। তার চালাকি বুঝতে পারবে না আর কেউ। স্পোর্টসম্যান, ভাল লোক, কেউ কল্পনাই করবে না ওরকম মানুষের মনেও শয়তান বাসা বাঁধতে পারে। নিজেকে চালাক ভাবলেই বোকা বনে যেতে হয় অনেক সময়। বেশি সাহস দেখাতে গিয়েও অকালে মারা পড়ে অনেকে।'

'তুমি আমাকে সাবধান করছ বুঝতে পারছি,' গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেললেন কিন। 'টমাস ডিফারসনের ব্যাপারে আমাকে হুঁশিয়ার করছ। আজকে এসেছ আমাকে সাবধান করতে...'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কিন। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিশোর পাশা। একটা মাছি মারার ক্ষমতাও তার নেই।'

'মাছির কথা হচ্ছে না এখানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবু একটা কথা মনে না করিয়ে দিয়ে পারছি না। আপনি বলছেন একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই। অথচ সেই লোকই আঁটঘাট বেঁধে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার ভীমরুলের জীবন নাশ করার জন্যে। কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না কথাগুলো?'

তক্ষুণি জবাব দিতে পারলেন না কিন।

এইবার লাফিয়ে ওঠার পালা কিশোরের। মিস্টার নিকের মুখোমুখি দাঁড়াল। একটা হাত রাখল তাঁর বাহুর ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মানুষটার মুখের দিকে। তারপর ফিরল ভীমরুলের বাসার দিকে। কথা বলতে গিয়ে চাপা হিসহিসে হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর, 'মিস্টার কিন, দেখুন, ওই বাসাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। দিনের শেষে বাড়ি ফিরছে ভীমরুলরা, যার যার কাজ সেরে। সহজ, স্বাভাবিক, নিশ্চিন্ত। কল্পনাও করতে পারছে না আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ওদের ওপর নেমে আসবে চরম দুর্যোগ। অবশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা ওদের আছে

কিনা জানি না। থাকলেই বা কি? কেউ গিয়ে বলবে না ওদের, হুঁশিয়ার করবে না, কি ঘটবে। ওদের তো আর গোয়েন্দা কিশোর পাশা নেই। মিস্টার কিন, আমি বলেছি, খুনের তদন্ত করতে এসেছি আমি এখানে। আর সেটা ঘটে যাওয়ার আগেই ঠেকাতে চাই। পোকাগুলোকে মারতে ক'টা সময় আসবে টমাস?'

'অ্যাঁ!' যেন শুনতেই পাননি কিন।

'ক'টার সময়?'

'ছ'টা।'

আর অপেক্ষা করল না কিশোর। ঘুরে রওনা হয়ে গেল গেটের দিকে। কয়েক পা এগিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ছ'টার সময় আবার আসব আমি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন কিন, বলার সুযোগ দিল না কিশোর। বলল, 'কি বলবেন জানি। টমাস ভাল, টমাসের মন নরম, সে কখনও এরকম কাজ করতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। পারুক আর না পারুক, সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে ছ'টায় আমি আসছি। ভীমরুল মারা দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

জবাবের অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল কিশোর। গেট পেরিয়ে এল। বেরিয়ে একটা মোড় নিয়েই কমিয়ে দিল গতি। ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বেজে দশ। আনমনে বিড়বিড় করল, 'আর পৌনে এক ঘণ্টা বাকি। এতটা কোথায় কাটাই?'

থেমে গেল সে। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে। একবার ভাবল, যাওয়াই উচিত তারপর অন্য কথা ভাবল। মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, কোন একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

ছ'টা বাজতে আর কয়েক মিনিট বাকি। আবার কিনের বাড়ির কাছে ফিরে এসেছে কিশোর। বাগানের দিকে এগোচ্ছে। শান্ত একটা বিকেল। বাতাস বন্ধ। গরম খুব বেশি। কেমন যেন থমকে গেছে প্রকৃতি, ঝড়ের আগে যেমনটা হয়।

চলার গতি বাড়ছে ওর। গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ করেই সতর্ক হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে অস্বস্তি আর দ্বিধা। এরকম কেন লাগছে বুঝতে পারছে না।

গেটের কাছে দেখা গেল টমাস ডিফারসনকে। পাল্লা খুলে বেরোতে গিয়ে কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল। বলল, 'আরে, কিশোর না? কি মনে করে?'

সে কথার জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'মিস্টার ডিফারসন, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন?'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল টমাস। 'মানে?'

'ভীমরুলগুলোকে মেরেছেন?'

'ভীমরুল? না, আজকে মারা হয়নি।'

'ও। মারেননি।' মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করল কিশোর, 'তাহলে কি

করছিলেন?'

'কি করব? বসে বসে গল্প করছিলাম অ্যালানের সঙ্গে। পুরানো দিনের কথা। তা তুমি এখানে কি মনে করে? রকি বীচ থেকে এত দূরে?'

'কাজ।'

'অ্যালানের সঙ্গে দেখা করবে মনে হচ্ছে? যাও। বারান্দায়ই আছে। সরি, আর দেরি করতে পারছি না। কাজ আছে আমার।'

তাড়াহুড়া করে চলে গেল টমাস। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। সুন্দর চেহারার ভীতু স্বভাবের একজন তরুণ।

'বারান্দায় তাহলে পাব মিস্টার কিনকে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল কিশোর। 'অবাকই লাগছে।' খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। বাগানের পথ ধরে এগোল। একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন কিন। মূর্তি হয়ে। নড়া নেই চড়া নেই। কিশোরের পায়ের আওয়াজ শুনেও মুখ তুলে তাকালেন না।

কাছে এসে কিশোর বলল, 'তাহলে ভালই আছেন আপনি?'

যেন ঘুম থেকে জেগে জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করলেন কিন, 'কি বললে?'

'জিজ্ঞেস করলাম ভাল আছেন নাকি?'

'না থাকার কোন কারণ আছে?'

'না, মনে হচ্ছে সুস্থই আছেন। ভাল।'

'সুস্থ আছি মানে? কিসে অসুস্থ করার কথা?'

'ওয়াশিং সোডা।'

ঝট করে পিঠ সোজা করলেন কিন। 'ওয়াশিং সোডা? মানে?'

মাপ চাওয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। 'সত্যিই আমি দুঃখিত। আপনার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। অবিকল এক রকম শিশি। টমাস যেটাতে করে পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনেছে।'

'আমার পকেটে! কেন?'

বোকা হয়ে গেছেন যেন কিন। তাকিয়ে রয়েছেন কিশোরের দিকে।

কথা বলতে লাগল কিশোর। তার সেই বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গিতে, রহস্যের কিনারা করার পর যেভাবে লেকচার দেয়, 'দেখুন, গোয়েন্দাগিরির একটা বড় সুবিধা, কিংবা অসুবিধাও বলতে পারেন, কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই মিশতে হয় অপরাধীদের সঙ্গে। আর যেহেতু ওরা স্বাভাবিক লোকের চেয়ে কিছুটা আলাদা, অনেক বিচিত্র কাণ্ড করে বসে। অনেক কিছু শেখার আছে তাদের কাছে। এই যেমন ধরুন পকেটমারদের কথাটাই। লোকের পকেট থেকে জিনিস তুলে নেয়, অথচ টেরই পায় না লোকটা, এটা একটা সাংঘাতিক ক্ষমতা। একবার এক পকেটমারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। ওস্তাদ লোক। সহজেই আমাকে শিখিয়ে দিল কয়েকটা কৌশল। তাই ইচ্ছে করলেই এখন কারও পকেটের জিনিস বের করে নিতে পারি আমি, কিংবা কিছু ঢুকিয়ে রাখতে পারি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম ওয়াশিং সোডা, পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশিতে ভরে।'

'এখন আসি আরেক কথায়,' বলে চলেছে কিশোর। 'যদি কেউ তাড়াহুড়া

করে বিষ বের করে টেবিলে রাখা গেলাসের পানিতে মিশিয়ে দিতে চায়, কারও চোখ এড়িয়ে, তাহলে কোন্ পকেটে রাখলে সুবিধে হবে? যদি বাঁইয়া না হয়? অবশ্যই ডান পকেটে। কাজেই বুঝতে অসুবিধে হয়নি কোটের ডান পকেট আছে।'

নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট শিশি বের করল সে। ভেতরে সাদা দানা। সেগুলো কিনকে দেখিয়ে বলল, 'এতক্ষণ পকেটে নিয়ে বেড়িয়েছি। ভয়ানক বিপজ্জনক।'

শান্তই রয়েছে সে। ধীরেসুস্থে আরেক পকেট থেকে বের করল বড় মুখওয়ালা একটা বোতল। তাতে সাদা জিনিসগুলো ফেলে জগ থেকে পানি ঢালল তার ভেতরে। শক্ত করে ছিপি এঁটে ঝাঁকিয়ে গুলে নিতে লাগল। সম্মোহিতের মত কিশোরের দিকে তাকিয়ে তার কাজকর্ম দেখছেন কিন।

গলানো শেষ করে শিশির পানির দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। এগিয়ে গেল ভীমরুলের বাসার দিকে। ছিপি খুলে শিশি উপুড় করে ভেতরের তরল মিশ্রণটা ছিটিয়ে দিল বাসায়। দুই পা পিছিয়ে এসে মাথা সামান্য কাত করে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল কি ঘটে।

বাসার বাইরে ঘোরাফেরা করছিল কিছু ভীমরুল। ওগুলোর গায়ে পড়ল মিশ্রণ। একটু কাঁপল কোনটা, কোনটা বার কয়েক পা ঝাড়া দিল, মরে গেল চোখের পলকে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিছু, যেন মরার জন্যেই। দুটো মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। ভীমরুলের মৃত্যু দেখল। তারপর ধীরপায়ে আবার ফিরে এল বারান্দায়।

'ভয়ংকর বিষ,' বলল সে। 'নিমেষে শেষ করে দেয়।'

অহেতুক কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন কিন। 'কতখানি জানো তুমি?'

সরাসরি তাঁর দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনাকে বলেছি, খাতায় টমাস ডিফারসনের নাম দেখেছি। কিন্তু বলিনি, তার পর-পরই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি আমি। জানিয়েছে, আপনার অনুরোধেই নাকি ভীমরুল মারার জন্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনেছে। আপনি কিনে দিতে বলেছেন। অবাক হলাম। পেট্রল দিয়েই মেরে ফেলা যায়। সহজটা ফেলে মারাত্মক বিষ মেশানোর ঝামেলা করতে যায় কে?'

'বলে যাও।'

'আরও একটা কথা জানা আছে আমার। টমাস আর শীলাকে একসাথে এমন এক জায়গায় এমন এক সময়ে দেখা গেছে, যেখানে বা যখন ওদের যাওয়ার কথা নয়। আর দেখা যে গেছে সেটা ওরা জানে না। কি নিয়ে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গিয়েছিল দু'জনে, আপনার সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছিল শীলা, জানি না। কিন্তু আবার ওদেরকে একসাথে দেখা গেছে যখন শুনলাম, বুঝলাম মিটমাট হয়ে গেছে, মিল হয়ে গেছে আবার।'

'বলে যাও।'

'আরও কিছু জানি আমি, মিস্টার কিন। হলিউডের ডাক্তার হারভের চেম্বার

থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি পরশু। ডাক্তার সাহেবকে চিনি আমি। কি রোগের চিকিৎসা করেন তা-ও জানি। আপনার চেহারার অবস্থাও দেখেছি তখন। একটা সময়ই ওরকম চেহারা হয়ে যায় মানুষের, যখন একেবারে ভেঙে পড়ে, বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তখন। মৃত্যুদণ্ড দেয়া আসামীর চেহারায়ও দেখেছি ওই ছাপ। ঠিক বলছি তো?'

'বলছ। আমাকে আর দু'মাস সময় দিয়েছে ডাক্তার।'

'আমাকে আপনি দেখতে পাননি, তার কারণ তখন খুব চিন্তিত ছিলেন। প্রায় দিশেহারা অবস্থা। আজ বিকেলে আপনার চেহারায় দেখেছি অন্য ভাব। যেন কোন কিছু লুকানোর চেষ্টা করছেন। ঘৃণা দেখেছি আপনার চোখে। যত চেষ্টাই করুক মানুষ, ঈর্ষা, ঘৃণা, রাগ এসব লুকাতে পারে না। কথা বলার সময় কোন না কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়ই।'

'বলে যাও,' তৃতীয়বার একই কথা বললেন কিন।

'আর তেমন কিছু বলার নেই। দুটো কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে গেছে, সে জন্যেই একটা খুন থেকে বেঁচে গেল একটা জীবন। কিংবা বলা যায় দুটো জীবন। পরশু দিন ডাক্তারের চেম্বার থেকে আপনাকে বেরোতে দেখে ফেলাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, আরেকটা, বিষের খাতায় টমাসের নাম দেখে ফেলাটা। এসবে আজকাল আর অবাক হই না আমি। পৃথিবীতে এরকম অনেক কিছুই ঘটে। যাই হোক, খাতা দেখার পরই সন্দেহ হওয়ায় চলে গেলাম টমাস ডিফারসনের বাড়িতে। তার সঙ্গে কথা বললাম। জানলাম, আপনিই বিষ কিনতে বলেছেন তাকে। অথচ একথাটা আমার কাছে চেপে গেলেন আপনি। আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। ওরকম হুট করে চলে আসব কল্পনাই করতে পারেননি। তবে পরে ভেবেচিন্তে বুঝলেন আমি আসাতে ভালই হয়েছে। আমার সন্দেহকে আরও চাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। টমাসের কাছেই শুনেছি সে আসছে সাড়ে পাঁচটায়, ভীমরুল মারা দেখতে। মারতে নয়। আমি যে জানি সেকথা আপনি জানতেন না। মিথ্যে করে বললেন ছ'টায় আসছে, মারতে। আশা করেছিলেন ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যাবে। আমি এসে লাশ দেখতে পাব।'

'কেন এলে তুমি!' ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল কিনের, চিৎকার করে উঠলেন, 'কেন! না এলেই ভাল হত!'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'এসে খারাপ করেছি বলে মনে হয় না। তাছাড়া অপরাধ আর রহস্যের গন্ধ পেয়েছি। দূরে থাকি কি করে, বলুন?'

'কি অপরাধ?'

'সেটা তখনই বলেছি। খুন।'

'আত্মহত্যা বলতে চাইছ তো?'

'না, খুন।' তীক্ষ্ণ স্বরে পরিষ্কার ভাবে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল কিশোর। 'খুনের কথা বলতে চাইছি আমি। বিষক্রিয়ায় আপনার মৃত্যুটা হত দ্রুত, সহজে। কিন্তু টমাসের জন্যে যে মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিলেন, ফাঁসির দড়ি কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ার, সেটা বড় ভয়ংকর। যন্ত্রণাদায়ক। সুস্থ মস্তিষ্কের কোন-মানুষই

চাইতে পারে না নিজের মৃত্যু হোক ওভাবে। বিষটা টমাস কিনেছে, আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছে, এবং একা সময় কাটিয়েছে। বাড়িতে অন্য কেউ ছিল না। হঠাৎ করে মারা গেছেন আপনি। আপনার পাকস্থলীতে, আপনার গেলাসে পাওয়া যেত পটাশিয়াম সায়ানাইড। হাজার বলেও কাউকে বোঝাতে পারত না টমাস যে আসলে আপনি আত্মহত্যা করেছেন। ধরে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয়া হত তাকে। এটাই ছিল আপনার পরিকল্পনা। কল্পনাই করতে পারেননি তৃতীয় আরেকজন, অর্থাৎ আমি সব জেনে ফেলেছি। আদালতে সাক্ষি দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে পারব টমাসকে।'

গুঙিয়ে উঠলেন কিন। অনেকটা আর্তস্বরেই আবার বললেন, 'কেন এলে তুমি, কেন!'

'আসার আরেকটা কারণ আছে, শুধু খুন ঠেকানো নয়। আপনাকে পছন্দ করি আমি, মিস্টার কিন। এমনিতেই মারা যাবেন আপনি। মারাত্মক ক্যানসার শেষ করে এনেছে আপনার আয়ু। দু'মাস পরে এমনিতেই ভালবাসার মেয়েটির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে আপনাকে, চিরকালের জন্যে। কেন খামোকা নষ্ট, অপরাধী মন নিয়ে যাবেন? এইবার বলুন তো, আমি আসাতে সত্যিই দুঃখ পেয়েছেন, না খুশি হয়েছেন?'

সামনে ঝুঁকলেন কিন। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ছাড়া আর কেউ জানে এসব?'

'না। কেউ জানবেও না। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।'

পুরো একটা মিনিট চুপ করে রইলেন কিন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অন্য দৃষ্টি ফুটেছে এখন চোখে, ঝলমলে হয়ে উঠেছে চেহারা। যেন লড়াইয়ে জিতেছেন। হাসিমুখে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। কিশোরের হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'খুশি হয়েছি আমি, কিশোর, সত্যি খুশি হয়েছি। সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছ তুমি। তোমাকে ধন্যবাদ।'

ভ্যাম্পায়ারের গুহা

আঁধার নামছে। অ্যালিঘেনি পর্বতের ওপরে ঝুলে আছে যেন ধোঁয়াটে কুয়াশা। সরাইখানার জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর পাশা। মুসা আর রবিনও তার সঙ্গে এখানেই উঠেছে। একটা পাহাড়ের ঢালে তৈরি করা হয়েছে সরাইখানাটা। এখান থেকে চোখে পড়ে পর্বতের গায়ের গুহামুখটা। ক্র্যাগি কেভ নাম ওটার।

'পর্বতটা তো তখন সুন্দরই লেগেছে,' বিড়বিড় করে আনমনে বলল কিশোর। 'এখন জানি কেমন লাগছে, ভূতুড়ে ভূতুড়ে একটা ভাব। আলো কমে যাওয়াতেই এরকম হয়েছে।'

'ভেতরে ঢুকলে নিশ্চয় আরও গা ছমছম করবে,' রবিন বলল। বেড়াতে এসেছে ওরা। এই সরাইয়ে ওঠার পরামর্শটা তারই। ম্যাপ আর গাইডবুক দেখে

এখানকার অনেক কিছুই জেনে নিয়েছে। 'ভেতরে পাতাল নদী আছে, স্ফটিকের গুহা আছে, আরও অনেক কিছুই আছে। গাইডবুকে পড়েছি এসব। তবে মিসেস গিলহ্যামের মুখে যা শুনলাম, সেটা ভয়ংকর। গুহাগুলোতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি,' জোর দিয়ে বললেন এরিনা গিলহ্যাম। এই সরাইয়ের মালিক। বয়েসের ভারে বাঁকা হয়ে এসেছে কোমর, তবু কাজ করা বন্ধ রাখেননি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন।

'বলুন তো শুনি,' আগ্রহী হলো কিশোর।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। দু'হাত নেড়ে বলল, 'দরকার নেই ওসব ভূতফূতের গল্প শোনার।'

'আমি শুনব,' মুসার কথা কানে তুলল না রবিন। এরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বলুন।'

'বললামই তো ভূতের উপদ্রব আছে,' এরিনা বললেন। 'ঘোরাফেরা করার যদি ইচ্ছেই হয়, ওখানে কেন। আরও হাজারটা জায়গা আছে।'

'কিন্তু গুহায় ঢুকলে ক্ষতিটা কি?' কিশোর বলল, 'আমার বেশ ভালই লাগে গুহা দেখতে।' তাকিয়ে রয়েছে মহিলার মুখের দিকে। ভয় দেখতে পেল তাঁর চোখে।

'গুহাটা বাদুড়ে বোঝাই,' মহিলা বললেন।

'বাদুড়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'তাহলেই হয়েছে! আমি বাপু আর ঢুকছি না!'

ধূসর চুলে ঢাকা মাথাটা ঝাঁকালেন এরিনা। 'হ্যাঁ, বাদুড়। আরও খারাপ খবর আছে। একসময় সোনা খোঁজার ধুম পড়ে গিয়েছিল এদিককার পাহাড়ে। ওই সময় একটা চোরকে তাড়া করেছিল শেরিফের লোকেরা, গুহায় ঢুকে পড়েছিল লোকটা। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। লোকে বলে বাদুড়ের কামড়ে মারা গিয়ে ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে সে।'

'একথা আপনি বিশ্বাস করেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

প্রশ্নের জবাব দিলেন না এরিনা। বলতে থাকলেন, 'ক্র্যাগি কেভের ভেতরে যখন ঢাক বেজে ওঠে, রক্তের তৃষ্ণা পায় তখন ভ্যাম্পায়ারের। জেগে ওঠে।' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল তাঁর, খসখসে হয়ে এল, 'কাছাকাছি মানুষ দেখলেই তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

'কিন্তু ভ্যাম্পায়ার বলে তো কিছু নেই,' তর্ক শুরু করল কিশোর।

'ওকথা আমাকে বলো না!' রেগেই উঠবেন মনে হলো এরিনা। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। কুচকুচে কালো চুল, বরফের মত সাদা মুখ। কালো চোখের চাহনিতে কেবলই শয়তানী, অন্তর ভেদ করে ঢুকে যায় সে দৃষ্টি। ওর লম্বা সাদা শ্বদন্তও দেখেছি আমি। মানুষের গলায় বসিয়ে দেয়।'

আবার জোরে জোরে হাত নাড়ল মুসা, 'দোহাই আপনার, আর বলবেন না! ঘুমাতে পারব না তাহলে!'

কিশোরের দিকে তাকালেন এরিনা। 'কালো পোশাক পরে, সব কালো। কেবল কালো আলখেল্লার লাইনিংগুলো লাল। ওখানে গেলে মরবে। ক্র্যাগি কেভের কাছেই যেয়ো না।'

'দেখি, সকালে আলোচনা করব এনিয়ে,' রবিন বলল। 'দিনের বেলা অনেক ভয়ই দূর হয়ে যায়। রাতে যেমন লাগে, তেমন আর লাগে না।'

একমত হয়ে কিশোর বলল, 'ঠিক বলেছ। সকালেই কথা বলব। চলো, আজকে তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ি। কাল আবার অনেক খাটতে হতে পারে।'

তার কথা শেষও হলো না, ভারি একটা গুমগুম শব্দ ভেসে এল পর্বতের দিক থেকে। শিউরে উঠলেন এরিনা। আতঙ্কিত স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওই যে, জেগে উঠেছে ভ্যাম্পায়ার!'

'ও কিছু না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'বাজ পড়ার শব্দ।' যেন তার কথার সমর্থন জানাতেই চালার ওপরে আঘাত হানতে শুরু করল বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা।

উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। চলে এল নিজেদের ঘরে। সে রাতে ভাল ঘুম হলো না মুসার। কেবলই চমকে চমকে জেগে উঠল, অস্থির হয়ে এপাশ-ওপাশ করল বিছানায়।

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে বন্ধুদেরকে বলল, 'বিচ্ছিরি একটা রাত গেল। সারারাত কেবল দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, ভ্যাম্পায়ারে তাড়া করল আমাকে। দেখতে একেবারে সিনেমার ড্রাকুলার মত।'

বলল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় এরিনার ভূতের গল্প ওর কাছেও ততটা ভয়াবহ মনে হলো না। সারাদিন কি করে কাটাবে, তার পরিকল্পনায় মাতল ওরা। রবিন বলল, 'গুহায় তো অনেকেই ঢুকেছি আমরা। নতুন করে আর কিছু আলোচনার নেই। গুহায় ঢুকলেই পথ হারানোর ভয় থাকে। এখানকারগুলোতে আরও বেশি ভয়। অনেক সুড়ঙ্গ, এঁকেবেঁকে, একটার সঙ্গে আরেকটা ক্রস করে চলে গেছে এদিক ওদিক।'

'হুঁ,' কিশোর বলল, 'আমিও পড়েছি বইটা। আরও ভয় আছে। সিংক হোল। কোনমতে ওগুলোতে পড়লেই হলো। জীবনেও আর উঠতে হবে না।'

এসব শুনতে ভাল লাগছে না মুসার। মুখ বিকৃত করে বলল, 'জানি, বলবে, এসব বিপদে পড়ে অভ্যেস আছে আমাদের। বেরিয়ে আসতে পারব। তবু বলি, ওরকম গুহায় না ঢুকলেই কি নয়?'

তিরস্কারের ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'মুসা, মাঝে মাঝে কোথায় হারিয়ে যায় তোমার দুঃসাহস? ভূত বলে তো আসলে কিছু নেই। জীবনে একটি বারের জন্যেও তো ভূত দেখোনি, বুকে হাত দিয়ে জোর করে বলতে পারবে না, তাহলে কেন? মিস্টার উলফ কি বলে দিয়েছেন নিশ্চয় মনে আছে? প্রচুর বেড়ানোর আর দেখার জায়গা আছে এখানে। ক্র্যাগি কেভের নাম বিশেষ করে বলেছেন তিনি।'

'অস্বীকার করছি না,' কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মুসা, 'তবু ওখানে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না আমার। ভূত দেখিনি, ঠিক, কিন্তু নেই, একথা জোর দিয়ে বলতে পারো না। পৃথিবীতে কত রকম কত কিছু আছে. সব কিছুর কি ব্যাখ্যা

হয়? আশেপাশে গুহা আরও আছে, ওগুলোর কোনটাতে ঢুকলেই পারি। ভ্যাম্পায়ারের বাসস্থান দেখার আমার কোন আগ্রহই নেই।'

'যদি আছে সত্যিই, জানতাম,' হালকা গলায় বলল রবিন, 'তাহলে আমাকেও কেউ ঢোকাতে পারত না। চলো, অহেতুক সময় নষ্ট না করে জিনিসপত্র কিনে নিইগে।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'কি জিনিস কিনবে?'

'গুহায় ঢুকতে কি জিনিস লাগে, ভাল করেই জানো তুমি। নাইলনের দড়ি, টর্চ বসানো হেলমেট, ব্যাটারি, সাধারণ টর্চ...' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রবিন, 'আর মুসা আমানের জন্যে প্রচুর ভুরিভোজনের ব্যবস্থা। এখানকার কিছু কিছু খাবার শুনেছি খুবই ভাল।'

গোয়েন্দা সহকারীকে কি করে নরম করতে হয় জানা আছে নথি-গবেষকের। কাজ হলো। নরম হয়ে এল মুসা। আর প্রতিবাদ করল না। অবশ্য জানে, করেও লাভ হবে না। কিশোর যদি কোন কাজ করবে বলে একবার, করেই ছাড়ে। তার সঙ্গে এখন যোগ দিয়েছে রবিন, ঠেকানো অসম্ভব।

'ফারনি জোনসের দোকানে পেয়ে যাবে সব জিনিস,' এরিনা বললেন। আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলেন কাপে। 'বয়েস বেশি না, এই বিশ-একুশ। দোকানটা সে-ই চালায়। স্পোর্টস ইক্যুইপমেন্ট আর উপহারের জিনিসপত্র বিক্রি করে। আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী হলো সে। ফোনে ওকে পেলে বলে দিতে পারব, শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে তোমাদের।'

ফোনে পাওয়া গেল ফারনিকে। মিনিট দশেক পরেই লম্বা, সোনালি চুল এক তরুণ একটা পুরানো, ধুলোমাখা জীপ নিয়ে হাজির হলো। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরোল শহরে।

ফারনির কাছে এই অঞ্চলের অনেক কথা জানতে পারল ওরা। ক্র্যাগি কেভের ভূতের কথা জিজ্ঞেস করতেই হেসে ফেলল ফারনি। বলল, 'ওসব বিশ্বাস করো না। খেয়েদেয়ে কাজ নেই যাদের তারা ওসব ফালতু কথা নিয়ে মেতে থাকে।'

'এরিনা গিলহ্যাম তো বললেন তিনি নিজের চোখে নাকি দেখেছেন,' মুসা বলল।

মুখ বাঁকাল ফারনি। 'কল্পনায় দেখেছে আর কি। বয়েস হয়েছে তো। তার ওপর বহুবছর ধরে থাকছে ক্র্যাগি কেভের কাছে। কখন যেতে চাও ওখানে?'

'আজ বিকেলে,' রবিন বলল। 'প্রথমে উলফ ম্যানশনটা দেখে আসতে চাই।'

'কিন্তু ওটা তো এখন বন্ধ। মালিক নেই। ইউরোপে গেছে।'

'জানি। মিস্টার উলফ আমার বাবার বন্ধু। তিনি বলেছেন, ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে গিয়ে পেইনটিংগুলো দেখতে পারি আমরা। প্রেসিডেন্টকেও বলে রেখেছেন।'

হেনরি উলফ মস্ত ধনী। ব্যক্তিগত একটা জাদুঘর আছে তাঁর। সেখানে নানা রকম বিচিত্র জিনিসের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন কতগুলো পেইন্টিং, অনেক টাকা দামের। সেগুলো দেখার খুব কৌতূহল তিন গোয়েন্দার।

অবাক মনে হলো ফারনিকে। 'সত্যিই চাবি দেবে তোমাদেরকে?'

'নিশ্চয় দেবেন,' কিশোর বলল। 'প্রেসিডেন্ট মিস্টার হার্বার্ট ডনের কাছ থেকে চাবি নিয়ে নেব। আমরা আজ যাব জানেন তিনি। নামিয়ে দেবেন ব্যাংকে, প্লীজ? পরে গিয়ে আপনার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে নেব।'

ফারনি হাসল। 'দেব না কেন। চাইলে ম্যানশনেও নিয়ে যেতে পারি তোমাদের। তবে ঢোকার ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারব না,' যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে, মিস্টার ডন সত্যিই চাবি দেবে ওদেরকে। 'ছবিগুলো দেখার আমারও খুব শখ। এখানে এতদিন ধরে আছি, অথচ কখনও দেখিনি দোকানে আমার সেলসম্যান টনি আছে। আমি না গেলেও চলবে এখন, সে-ই সামলাতে পারবে।'

ব্যাংকে পৌঁছল ওরা। আর্থার জনসন নামে একজন ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলল কিশোর। ছোটখাট একজন মানুষ তিনি, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মনে হয় সব সময় উদ্বেগে ভোগেন। ইন্টারকমে মিস্টার ডনের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিয়ে তারপর তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চললেন প্রেসিডেন্টের অফিসে। ফারনিও সঙ্গে চলল।

মিস্টার ডন রীতিমত ভদ্রলোক। ছেলেদেরকে দেখে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'তোমাদের নাম আমি শুনেছি। বিখ্যাত হয়ে গেছ রকি বীচে। ফারনি, তুমি কি ভেবে? তিন গোয়েন্দার গাইড নাকি?'

হাসল উলফ। 'অনেকটা সেরকমই। মিসেস গিলহ্যাম অনুরোধ করলেন, ওদেরকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে। ওরা ম্যানশন দেখতে যাবে, আমি যদি যাই সাথে আপনার আপত্তি আছে? জায়গাটা দেখার বড় শখ।'

'না, আপত্তি থাকবে কেন? মিস্টার জনসন যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। অ্যালার্মটা অফ করে দেবে। তিন গোয়েন্দার কথা তো মিস্টার উলফই বলে গেছেন। তোমাকেও অবিশ্বাস করছি না আমি। তবে বেরিয়ে আসার সময় দরজায় তালা লাগাতে ভুলবে না। তাতে আবার আপনাআপনি চালু হয়ে যাবে সিকিউরিটি সিস্টেম। চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো আমাকে।'

প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। জীপের সামনে বসল কিশোর। পেছনের সীটে রবিন আর মুসার সঙ্গে গাদাগাদি করে বসলেন জনসন। 'তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে হেঁটেই অফিসে ফিরতে পারব আমি,' বললেন তিনি। 'বেশি দূরে না।'

উলফ ম্যানশনের বিশাল সিংহ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জীপ। ক্র্যাগি কেভে যাওয়ার পথেই পড়ে বাড়িটা, শহরের একধারে। গাড়ি থামাল ফারনি। নামল সবাই। ভারি ওককাঠে তৈরি দরজাটা খুলে দিলেন জনসন। অ্যালার্মটা অফ করে দিলেন। চাবিটা কিশোরের হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও, দেখো। দারুণ সব জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছেন মিস্টার উলফ। দেখলে ভুলতে পারবে না।'

'থ্যাংকস,' বলল কিশোর।

রওনা হয়ে গেলেন জনসন।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে রইল অন্য তিনজন। বিশাল এনট্রেন্স হলের

মার্বেলের মেঝেতে জুতোর শব্দ হতে লাগল, ছড়িয়ে পড়ে ডিম্বাকার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বিচিত্র কাঁপা কাঁপা প্রতিধ্বনি তুলল।

'খাইছে! দারুণ তো!' সাজানো, অলঙ্করণ করা লিভিং রুমে ঢুকে থমকে দাঁড়াল মুসা। সেখানে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে ঢুকল আরেকটা ঘরে। আরেকবার থমকে দাঁড়ানোর পালা। লাফ দিয়ে যেন কয়েক শো বছর পিছিয়ে গেছে এখানে সময়। ঘর, আসবাব, সব পুরানো ঢঙে তৈরি করে সাজানো হয়েছে। আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে সেরকম করেই। দেয়ালে ঝুলছে দুর্লভ পেইন্টিংগুলো।

দেয়ালের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওখানেও ছবি ঝোলানো ছিল। কি হলো ওগুলো, ভাবছে কিশোর। বলল, 'মনে হয় মিস্টার উলফ বিক্রি করে দিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হতে পারে। কিংবা হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়েছেন।' বলে অন্য ঘরে দেখতে চলল সে।

মুসা আর কিশোর দেখতে লাগল খোদাই করে অলঙ্করণ করা ভারি একটা টেবিল। টপটা এক রকমের কাঠ দিয়ে তৈরি না করে বিভিন্ন কাঠ দিয়ে করা হয়েছে।

রবিনের সঙ্গে এল ফারনি। স্টাডিতে ঢুকল দু'জনে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে একটা ছবি ঝোলানো রয়েছে। বাগানে দাঁড়ানো এক মহিলার ছবি। ঝলমলে রঙ থেকে চোখ ফেরানো যায় না। স্টাডিতেও দেখার অনেক কিছু আছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে রবিন, হঠাৎ মেঝেতে চোখ পড়ল। একটুকরো কাগজ পড়ে আছে। তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

'কি ওটা?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল উলফ। রবিনের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল দেখার জন্যে।

'ছবির লিস্ট। মিস্টার উলফই হয়তো করেছেন।'

আরেকটা ছবির ওপর চোখ পড়তে এগোল সেদিকে। লিস্টটা রেখে দিল পকেটে। উলফকে ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'কি দারুণ সব জিনিস দেখছেন! এঁকেছে বটে! মহিলার চোখগুলো এমন কেন? যেন ভূতে তাড়া করেছে?'

'কিংবা মহিলাই ভূত হয়ে গেছে!' হাসল উলফ। ঘড়ি দেখল। 'এবার যেতে হয়। অনেক দেরি করে ফেলেছি। দোকানে যাই। পরে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। দরকার হলেই ডেকো। যদি মনে করো, গুহাতেও নিয়ে যেতে পারি তোমাদের।'

'তাহলে তো ভালই হয়। দেখি কিশোরকে জিজ্ঞেস করে।' আবার ছবিটার দিকে নজর দিল রবিন। বাইরে জীপের ইঞ্জিনের শব্দ হলো। চলে গেল উলফ।

পুরানো কতগুলো তলোয়ার দেখছে কিশোর আর মুসা, রবিন তখন স্টাডি থেকে গিয়ে ঢুকল পাশের বিশাল লাইব্রেরিতে। ওখানেও ছবি রয়েছে। দেখতে লাগল সেগুলো। তারপর এগোল একটা দরজার দিকে। ভাবল, পাশে অন্য কোন ঘর আছে। তালায় লাগানো রয়েছে একটা পুরানো আমলের চাবি, সামান্য ফাঁক

হয়ে আছে দরজার পাল্লা।

নব ধরে টান দিয়ে পাল্লাটা খুলেই হেসে ফেলল সে। ওপাশে ঘর নেই। রয়েছে বিরাট এক আলমারি। দরজাটা আলমারির, অথচ দেখলে মনে হয় ঘরের। আবার বন্ধ করতে যাবে এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের শব্দ। ঘুরে তাকাতে যাবে, কিন্তু মাথাটা পুরোপুরি ঘোরানোর আগেই পিঠে হাত দিয়ে জোরে ঠেলা মারল কেউ। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে দেয়াল-আলমারির ভেতরে পড়ল সে। কপাল ঠুকে গেল দেয়ালে।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। সামলে নিল রবিন। রেগে গেছে। খোলার চেষ্টা করল দরজাটা, পারল না, তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে শেষে চিৎকার করতে শুরু করল, সঙ্গীদের ডাকল। ওদের কানে পৌছল না তার ডাক।

ব্যাপারটা অসম্ভবই লাগছে রবিনের কাছে। ওরা ছাড়াও আরও কেউ ছিল ঘরে। কে? উলফ তো আগেই চলে গেছে। জীপের ইঞ্জিনের শব্দ নিজের কানে শুনেছে সে। সদর দরজা খুলে রেখে যায়নি তো? সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়েছে তখন লোকটা।

দরজায় কিল মারতে লাগল আবার রবিন। চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর আর মুসার নাম ধরে।

সাড়া পেল না।

ওরা তখন নেই আগের জায়গায়। দোতলায় চলে গেছে, চমৎকার সাজানো-গোছানো বেডরুমগুলো দেখার জন্যে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখেটেখে কিশোর বলল, 'হয়েছে। এবার যাওয়া যায়।'

'রবিন আসছে না কেন এখনও?' মুসা বলল, 'গেছে তো বহুক্ষণ।'

'তাই তো,' কিশোর বলল, 'ফারনির সঙ্গে চলে যায়নি তো?'

'নাহ্। তাহলে বলে যেত।'

'চলো তো দেখি। আমি ওপরতলার ঘরগুলো দেখি। তুমি নিচে গিয়ে খোঁজো। কোন ঘরে ঢুকে বসে আছে কে জানে।'

নিচতলায় চলে এল মুসা। একের পর এক ঘরে ঢুকে দেখতে লাগল, পেল না রবিনকে। অবশেষে আরেকটা ঘরে ঢুকে একটা শব্দ কানে এল। কোন কিছুতে, বোধহয় কাঠের গায়েই কিল মারছে কেউ। শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে এগিয়ে ঢুকল লাইব্রেরিতে। থেমে গেল শব্দটা।

কি করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে ওপর তলায় উঠে এল আবার মুসা। কিশোরকে জানাল। দু'জনে মিলে নেমে এল নিচতলায়, লাইব্রেরিতে।

আবার শুরু হলো শব্দ। জিরিয়ে নিয়ে কিল মারতে শুরু করেছে রবিন।

আলমারির দরজার কাছে এসে নব ধরে টান দিল কিশোর। খুলল না। পাল্লার কাছাকাছি মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, তুমি ভেতরে?'

'হ্যাঁ। খোলো।'

'দাঁড়াও। চাবি তো নেই। অন্য ব্যবস্থা করছি।' পকেট থেকে আট ফলার

সুইস নাইফটা বের করে কাজে লেগে গেল কিশোর। তিরিশ সেকেণ্ড পরেই কিট করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল তালা।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল রবিন। মলিন হাসি হেসে বলল, 'বাঁচলাম! যেমন গরম তেমন অন্ধকার। দম আটকে যাচ্ছিল। এই শোনো, আরও কেউ আছে এবাড়িতে। খুঁজে বের করা দরকার ব্যাটাকে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'অনেক বড় বাড়ি। লুকানোর জায়গার অভাব নেই। লোকটা মনে হয় বাড়িটা চেনে। তাহলে এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়বে, হাজার খুঁজেও বের করতে পারব না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সব কথা মিস্টার ডনকে জানানো দরকার।'

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মুসা। গায়ে কাঁটা দিল। ফিসফিস করে বলল, 'সদর দরজায় তালা ছিল। আমরা খুলেছি। অ্যালার্ম সিসটেম রয়েছে। চুরি করে কারও পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ভূত-টূত না তো...'

'ধ্যাত্তোর, শুরু করল আবার!' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। 'চলো, ব্যাংকে...'

সদর দরজার কাছে প্রায় দৌড়ে এল ওরা। তালায় চাবি ঢোকানোই রয়েছে, এতে বন্ধ থাকে অ্যালার্ম সিসটেম। খুলে নিলেই আবার চালু হয়ে যাবে। জোর করে কেউ তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে।

দরজার পাল্লা লাগিয়ে চাবিটা খুলে নিল কিশোর। 'ব্যস, চালু হয়ে গেল সিসটেম। লোকটা ভেতরে রয়ে গেলে ওখানেই আটক থাকতে হবে। এদিক দিয়ে দরজা খুলে বেরোনোর চেষ্টা করলেই পড়বে বিপদে।'

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করেছে ততক্ষণে রবিন। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েই ঝট করে মুখ তুলে তাকাল প্রাসাদের ছাতের দিকে। পুরানো কিছু বাতিল আসবাব বোধহয় জমা করে রাখা হয়েছে ওখানটায়, সেখান থেকেই ভারি একটা টেবিল নিচে পড়তে শুরু করল।

সোজা ছুটে আসছে রবিনের দিকে।

চোখের পলকে লাফিয়ে সরে গেল সে। প্রচণ্ড শব্দ করে এসে কংক্রীটের ওপর আছড়ে পড়ে ভাঙল টেবিলটা, মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল রবিন। মাথায় পড়লে মরেই যেত। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল কাঠ।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ছাতে! ছাতে রয়েছে লোকটা!'

যেন তার কথার সমর্থনেই পায়ের শব্দ শোনা গেল ছাতের ওপর। ছুটে চলেছে বাড়ির পেছন দিকে। একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। ছুটল পেছন দিকে। তার পেছনে ছুটল রবিন আর কিশোর। বিশাল প্রাসাদ ঘুরে যাওয়াও সহজ কথা নয়। অনেক সময় লেগে গেল। পেছনে যখন পৌঁছাল, দেখল উঁচু একটা গাছ বেয়ে ছাত থেকে নেমে আসছে একজন লোক। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। অনেকটা নেমে পড়েছে। ওদেরকে দেখেই লাফ দিয়ে পড়ল একটা ঘন ঝোপের ভেতরে।

তেড়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু বাড়িটা ভাল করেই চেনা লোকটার, বোঝা গেল। ঝোপের ভেতরে ভেতরে কোন দিক দিয়ে গিয়ে যে হারিয়ে গেল, বোধহয় পেছনের ঘন বনেই ঢুকে পড়ল, বোঝা গেল না। ধরতে পারল না ওরা ওকে।

'বাড়ির ভেতর বাইরের সব কিছু চেনা ব্যাটার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন। বলল, 'তোমরা দোতলা থেকে এক সিঁড়ি দিয়ে নেমেছ, ও তখন নিশ্চয় আরেক সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিল। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে গাছ বেয়ে ছাতে উঠেছিল। আমরা অ্যালার্ম সিসটেম চালু করে দেয়ার আগেই।'

'কিন্তু তোমার পেছনে লাগল কেন?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'ওর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছ?'

'জানি না,' অবাকই লাগছে রবিনের।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ঠিকই বলেছে মুসা। প্রথমে তোমাকে আলমারিতে ঠেলে ফেলল। আটকে রাখতে না পেরে শেষে টেবিল ফেলেই জখম করার চেষ্টা করল। কেন?'

'হয়তো,' আন্দাজ করার চেষ্টা করল রবিন, 'ও যেখানে ছিল ভুল করে আমি সেখানে চলে গিয়েছিলাম। ওর কোন কাজে বাধা পড়েছিল। আমি না গিয়ে তোমাদের কেউ গেলে হয়তো তোমাদের ওপরই হামলাটা আসত। একটা ব্যাপার বোঝা গেছে, ও চায় না আমরা এ বাড়িতে থাকি। তাড়ানোর চেষ্টা করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তাহলে আর দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো, গিয়ে মিস্টার ডন আর পুলিশকে বলি।'

হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংকে ফিরে এল ওরা। গেটের ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন জনসন, ওদেরকে দেখেই যেন চট করে চলে গেলেন অন্য পাশে।

'আশ্চর্য তো!' রবিন বলল, 'মনে হলো এইমাত্র ফিরল কোনখান থেকে। উলফ ম্যানশন থেকে এলে তো অনেক আগে চলে আসার কথা।'

'তা-ই এসেছিল,' মুসা বলল, 'তারপর অন্য কোথাও গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরল এখন।'

মাথা দোলাল কিশোর, 'সেটা হতেই পারে। কিন্তু এমন ভাবে ঢুকে গেল কেন? আমাদেরকে দেখে চমকে গেছে। ওর ভাবসাব ভাল মনে হচ্ছে না আমার। নজর রাখতে হবে।'

'মিস্টার ডনকে বলবেন নাকি ওর কথা?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না। মিস্টার জনসন খারাপ কিছু করেছে কিনা জানি না আমরা, কোন প্রমাণ নেই। অহেতুক একটা লোকের নামে উল্টোপাল্টা কথা বলতে গিয়ে শেষে আমরাই বিপদে পড়তে পারি। চুপ থাকি। নজর রাখি। পরে দেখা যাবে। এখন গিয়ে উলফ ম্যানশনের ঘটনাগুলোর কথা শুধু বলব।'

ছেলেদের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলেন মিস্টার ডন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন

পুলিশকে। রিসিভার রেখে দিয়ে বললেন, 'এখুনি যাচ্ছে। ভালমত খুঁজে দেখবে পুরো বাড়ি। কোন জিনিস খোয়া গেলে রেগে আগুন হয়ে যাবেন মিস্টার উলফ। তোমরাও সতর্ক থাকো, চোখকান খোলা রাখো। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই জানাবে আমাকে।'

'জানাব,' কথা দিল কিশোর।

মিনিট পনেরো পর ফারনির দোকানে ঢুকল ওরা। দোকানটা বেশ বড়। মালপত্রে বোঝাই। স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট, উপহার সামগ্রী, পার্টিতে কাজে লাগে এমন জিনিস, এমনকি হ্যালোউইন কস্টিউমও রেখেছে বিক্রির জন্যে। গুহায় ঢুকতে হলে যা যা জিনিস দরকার সব এনে দিল ফারনি। হেলমেটগুলো সব এক রঙের না নিয়ে তিনটে তিন রঙের বাছাই করল গোয়েন্দারা। ওরা যখন পছন্দ করছে, ফারনি তখন উপহার দেখাচ্ছে আরেকজন খদ্দেরকে।

ওখানকার কাজ শেষ করে আবার এল গোয়েন্দাদের কাছে। কেনাকাটা শেষ করে গিয়ে জীপে উঠল তিন গোয়েন্দা। ফারনিও বেরোল। ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে গুহার কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে। আগের বার কিশোর বসেছিল ওর পাশে, এবার বসল রবিন। মুসার সঙ্গে কিশোর বসল পেছনে।

ছোট শহরটা পার হয়ে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। পাহাড়ের দিকে চলল জীপ। উলফ ম্যানশনে সময় কেমন কাটল জিজ্ঞেস করল ফারনি। সব কথা শুনে রীতিমত চমকে গেল।

'রবিন,' রাগত কণ্ঠে বলল সে, 'কাজটা যে-ই করে থাকুক, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে। ব্যাটাকে ধরা দরকার। পুলিশের প্যাঁদানি খেলেই সুড়সুড় করে বলে দেবে সব কথা। ভেব না, ধরে ফেলবে। যাবে কোথায়।'

এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ফারনি, সামনের মোড়টাও যেন চোখে পড়ল না। গতি কমানোর কথা ভুলে গেল। শেষ মুহূর্তে ব্রেক করল ঘ্যাচ করে। শাঁই শাঁই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁয়ে কেটে কোনমতে পার হলো মোড়টা। আরেকটু ডানে সরলেই অ্যাক্সিডেন্ট করত। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রবিনের পাশের দরজা। সীটে বসে থাকাই মুশকিল হলো ওর জন্যে।

রবিনের ঠিক পেছনেই ছিল কিশোর। লাফিয়ে উঠে শার্ট খামচে ধরল, নইলে বাইরেই পড়ে যেত রবিন। টেনে আবার ওকে বসিয়ে দেয়া হলো সীটে।

আরেকবার ব্রেক করল ফারনি। পাথুরে পথে টায়ারের আর্তনাদ তুলে অবশেষে থেমে দাঁড়াল গাড়ি। লাফিয়ে নেমে গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে ঘুরে রবিনের পাশে চলে এল সে। দরজাটা পরীক্ষা করেই দাঁতে দাঁত চাপল, 'হুড়কোটা নষ্ট করে রেখেছে! ওই শয়তানটাই কিনা কে জানে, যে তোমাকে প্রাসাদে মারতে চেয়েছিল!'

কিশোর প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু সে কি করে জানল আমরা আপনার জীপে করে পাহাড়ে যাব?'

'সকালে হয়তো আমাদের দেখেছে একসাথে,' জবাব দিল ফারনি। 'রবিনের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে প্রাসাদে। জেনেছে, তোমাদেরকে জীপে করে পাহাড়ে

পৌঁছে দেয়ার কথা আছে আমার।'

মুসা বলল, 'আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। ফলো করছে কিনা দেখা দরকার। গুহার ভেতরে ঢুকে কিছু করে বসলে মহা বিপদে পড়ে যাব।'

পেছনে তাকাল ফারনি। আবার গাড়ি চালানোর সময় বার বার তাকাতে লাগল রিয়ার ভিউ মিররের দিকে। বলল, 'কই, কাউকে তো দেখছি না। তবু, সাবধানের মার নেই। মেইন রোড থেকে নেমে গিয়ে গলিপথ দিয়ে ঘুরে এসে আরেক দিক দিয়ে উঠল সে, যদি কেউ অনুসরণ করে থাকে ধরা পড়ে যাবে। কয়েকবার এরকম করে কেউ পিছু লাগেনি নিশ্চিত হয়ে নিয়ে এগোল ক্র্যাগি কেভসের দিকে।

গুহার ব্যাপারে জ্ঞান দিতে লাগল সে গোয়েন্দাদেরকে, 'ঢুকে কিছুদূর গেলেই একটা স্ফটিকের গুহা পাবে। ক্রিস্টাল কেভার্ন বলে ওটাকে। দেখবে, তিনটে সুড়ঙ্গ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। বাঁয়েরটা ধরে এগিয়ে গেলে আরেকটা গুহা পাবে। এখানকার অনেকেই জানে না এই গুহার কথা। সেটার শেষ মাথা থেকে একটামাত্র সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। যদি কোন বিপদে পড়ে যাও সেটা দিয়ে এগোলেই বেরিয়ে আসতে পারবে পাহাড় থেকে।'

'থ্যাঙ্কস,' মুসা বলল। 'আমার আসলে ঢোকারই ইচ্ছে নেই।'

'কেন, গুহায় ঢুকতে ভয় পাও নাকি তুমি?'

জবাবটা দিল রবিন। হেসে বলল, 'আরে না, গুহাকে ভয় পাবে কেন? কোন কিছুকেই ভয় নেই ওর। যত ভয় কেবল ভূতকে। নাম শুনলেই কাবু হয়ে যায়। ওই একটা ভয় যদি না থাকত, দুনিয়ার সব চেয়ে দুঃসাহসী মানুষদের তালিকায় নাম উঠে যেত মুসা আমানের।'

গুহামুখের কাছে এনে জীপ থামাল ফারনি। নামল গোয়েন্দারা। জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে নিল তিনজনে। হেলমেট মাথায় পরল। দড়ির বাণ্ডিল কাঁধে তুলে নিল কিশোর। রবিন নিল টর্চ লাইটগুলো আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। খাবারের ব্যাগ আর বাকি জিনিস নেয়ার ভার পড়ল মুসার ওপর।

গুহায় ঢোকার আগের ক্ষণে ফিরে তাকাল তিনজনেই। ওদেরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফারনি। হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে জীপ স্টার্ট দিল।

গুহায় ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। স্ফটিকের মস্ত গুহাটায় আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে বৈদ্যুতিক তার লাগানো হয়েছে। দেখার মত জায়গা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা। টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠে গেছে চুনাপাথরের স্তম্ভ। ছাতে ঝাড়বাতির মত ঝুলে রয়েছে স্ট্যালাকটাইটের ঝাড়ি।

'স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাকটাইট,' বিড়বিড় করে বলল মুসা, 'নাম দুটোর মধ্যে এত বেশি মিল, কোনটা যে কোনটা মনেই রাখতে পারি না।'

'এ তো সহজ,' কিশোর বলল। 'মাটিতে থাকে স্ট্যালাগমাইট। ভূমি, অর্থাৎ গ্রাউণ্ডের প্রথম অক্ষর "জি" মনে রাখবে। আর ছাত অর্থাৎ সিলিঙের "সি" মনে রাখলেই তো হয়ে গেল। স্ট্যালাগে আছে জি আর স্ট্যালাকে আছে সি।'

আলোকিত গুহাটা থেকে ফারনির কথামত বাঁয়ের সুড়ঙ্গে ঢুকল ওরা। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই অন্ধকার যেন গিলে নিল ওদের। হেলমেটে বসানো

আলো জ্বালল তিনজনেই। যতই সামনে এগোল সরু হয়ে এল সুড়ঙ্গ, নিচু হয়ে আসতে থাকল ছাত। শেষে এমন অবস্থা হলো, দাঁড়ানো তো দূরের কথা, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'এই অবস্থা হবে, এটা কিন্তু আমাদেরকে জানায়নি ফারনি।'

খুব সাবধানে এগোতে এগোতে কিশোর জবাব দিল, 'সামনের প্রতিটি ইঞ্চি দেখে চলতে হবে।'

মিনিটখানেক পরেই শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ, আরেকটা গুহায় ঢুকল ওরা। ফিরে তাকিয়ে সরু সুড়ঙ্গটার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'আর সামান্য সরু হলেই আটকে যেতাম। আমি অন্তত বেরোতে পারতাম না। ওই পথে আর ফিরছি না আমি।'

সামনে অন্ধকারে পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে। সেদিকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। একটা পাতাল নদী দেখা গেল। তার ওপাশে কি আছে দেখার জন্যে উঠল সে। এগিয়ে এল জলধারার কাছে। পানি বেশি গভীর মনে হলো না। হেঁটেই পার হওয়া যাবে ভেবে পা রাখল পানিতে। যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে গভীর পানি। আরেকটা বিষয়ে তেমন মনোযোগী হয়নি, তার ফলও ভোগ করতে হলো। তীব্র স্রোত। হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে কাত করে ফেলে দিল। হাত থেকে ছুটে উড়ে গিয়ে পড়ল টর্চটা। চোখের পলকে ওকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল স্রোত। অসহায় হয়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করল।

'রবিন, শুনলে!' পানিতে পড়ার ঝপাৎ শব্দ কানে আসতেই চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'নিশ্চয় পড়ে গেছে কিশোর। পাতাল নদীতে। এখুনি কিছু করতে না পারলে মরে যাবে ও!'

পানির কিনারে দৌড়ে এল ওরা। পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে উঠছে পানি, এসে লাগল দু'জনের গায়ে। টর্চ জ্বালল রবিন। অনেক বড় একটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে আছে, ঠিক ওটার পরেই যেন টগবগ করে ফুটছে পানি। ওই পাথরটা ধরে নিজেকে আটকে রেখেছে কিশোর।

'রবিন,' মুসা বলল, 'জলদি! দড়ির বাণ্ডিল!'

ভাগ্যিস বাণ্ডিল মাটিতে নামিয়ে রেখে পানিতে গিয়ে নেমেছিল কিশোর। দৌড়ে গিয়ে বাণ্ডিলটা নিয়ে এল রবিন। একটা মাথা খুলে ছুঁড়ে মারল কিশোরের দিকে। থাবা দিয়ে এক হাতে সেটা ধরে ফেলল কিশোর। পাথর থেকে হাত ছুটে যেতেই একটানে পানি তাকে নিয়ে ফেলল ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। তলিয়ে গেল মাথাটা। দড়ি ছাড়ল না।

রবিন আর মুসা মিলে টেনে তাকে নিয়ে এল কিনারে। নিজের ওঠার আর ক্ষমতা নেই। মুসার জিন্‌সের শার্ট খামচে ধরে রাখল রবিন, যাতে মুসাও পিছলে পানিতে পড়ে কিশোরের মত ভেসে না যায়। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে কিশোরের হাত ধরল মুসা। টেনে তুলে আনল কিনারে।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মাটিতেই শুয়ে পড়ল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে

বলল, 'থ্যাঙ্কস! বাঁচালে! গেছিলাম আজ!'

'চলো, বেরিয়ে যাই,' মুসা বলল। 'জায়গাটা শুরু থেকেই আমার ভাল লাগেনি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দাঁড়াও। কাপড় খুলে চিপে নিই।'

'এদিকে একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখেছি,' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'ফারনি বোধহয় এটার কথাই বলেছে। বেরোনোর পথ। তাহলে যে পথে এসেছি সে পথে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এই রাস্তা সহজ হবে।'

'এত বেশি অন্ধকার,' অভিযোগের সুরে বলল মুসা, 'ভাল লাগে না। কোথায় যাচ্ছি কিছুই বোঝার উপায় নেই। অনেক ধরনের বিপদ থাকতে পারে। অচেনা শর্টকাটের চেয়ে বরং চেনা...' থেমে গেল সে। কান পেতে শুনল। ফিসফিস করে বলল, 'এই, শুনলে?'

রবিন আর কিশোরও কান পাতল। সামনে কোনখান থেকে আসছে শব্দটা।

'ঢাক!' আতঙ্ক ফুটল মুসার কণ্ঠে। 'এরিনা গিলহ্যাম বলেছিলেন! ভ্যাম্পায়ার আসার আগে নাকি ওরকম শব্দ হয়!'

হেলমেটের আলোর ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। কিশোরের টর্চটা হারিয়েছে। মুসা আর রবিনের হাতে যে দুটো আছে, ব্যাটারি ফুরানোর ভয়ে জ্বালছে না। এখান থেকে বেরোতে আরও অনেক সময় লাগবে। আলোর প্রয়োজন আছে। ব্যাটারি কমে যাওয়ায় আলোও কমে গেছে। অন্ধকার গুহায় থাকতে আর ভাল লাগল না কারোরই।

'চলো,' কিশোর বলল। 'শর্টকাটই ভাল। তাহলে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারব। মুসা, অত ভয় পেয়ো না। ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই।'

'অত শিওর হয়ো না,' বিড়বিড় করল মুসা।

কয়েক কদম এগিয়ে আরেকটা সুড়ঙ্গে ঢুকল ওরা। ওপর থেকে আসছে এখন বিচিত্র শব্দ। ছাতের দিকে তাক করে টর্চ জ্বালল রবিন। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ছোট্ট একটা চিৎকার।

শত শত বাদুড় উড়ছে মাথার ওপরে। ছাতে ঝুলে রয়েছে হাজার হাজার। ডানার শব্দ আর চিৎকার মিশে গিয়ে বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনি হয়ে ওই বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করছে।

ওরা যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকের একটা বড় সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকছে বাদুড়ের দল।

'গুড,' সেদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'ওদিকে যাচ্ছে, তার মানে ওটা বেরোনোর পথ। খেতে যায় ওখান দিয়ে। চেষ্টা করলে আমরাও বেরোতে পারব ওপথে।'

প্রায় সম্মোহিতের মত বাদুড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল। তারপর রওনা হলো ওই সুড়ঙ্গ ধরে। রবিন যাচ্ছে আগে আগে, কিশোর মাঝখানে, আর মুসা রয়েছে পেছনে। হঠাৎ কিসে যেন, পাথরেই হবে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুসা। তাকে উঠতে সাহায্য করার জন্যে ঘুরল

কিশোর। 'কি হলো?'

'কিছু না।' হাঁটু ডলতে ডলতে বলল মুসা, 'জুতোতে লেগে গেল। সামলাতে পারলাম না।'

ইতিমধ্যে অনেকটা আগে চলে গেছে রবিন। হঠাৎ সুড়ঙ্গের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল। ধপ করে এসে পড়ল একেবারে তার সামনে। চমকে লাফিয়ে পিছিয়ে এল সে। আলো ফেলল ওপরে। পরক্ষণেই দিল গলা ফাটিয়ে চিৎকার।

একপাশে দেয়ালের ওপরে বেশ চওড়া তাকমত রয়েছে। সেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি। কালো চুল, কালো চোখ, বরফের মত সাদা মুখ। ঠোঁটের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আছে শ্বদন্ত। কালো আলখেল্লায় ঢাকা শরীর, তাতে লাল লাইনিং। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাদের দিকে।

বিমূঢ় গোয়েন্দারা কিছু করার আগেই ঝাঁপ দিল ওটা। আলখেল্লার ঝুল বাদুড়ের ডানার মত উড়িয়ে, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে, বিকট শব্দ করতে করতে নামল মাটিতে। খপ করে আতঙ্কিত রবিনের কব্জি চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল।

ভয় না পেলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করত রবিন। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করার কথাও যেন ভুলে গেছে। কেবল চেঁচাতে লাগল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, ভূতে খেয়ে ফেলল...'

হঠাৎ করেই থেমে গেল তার চিৎকার।

ছুটে গেল কিশোর, 'রবিন, কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।

দৌড়ে পরের মোড়টার কাছে চলে এল কিশোর আর মুসা। একজনের হাতেই শুধু টর্চ। সেটা সামনে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে।

'শোনো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

কান খাড়া করল দু'জনেই। মনে হলো, রবিনের কণ্ঠ শুনতে পেল। আবার সামনে ছুটল ওরা। আচমকা যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। মুসার হাত টেনে ধরে তাকে থামাল। 'দাঁড়াও! যেয়ো না! সিংকহোল!'

সামনে মেঝেতে বিশাল এক গর্ত যেন হাঁ করে রয়েছে ওপরের দিকে, শিকার ধরার অপেক্ষায়। ওরা আরেক পা এগোলেই গিয়ে পড়ত ওটার মধ্যে। নিচে থেকে আসছে রবিনের কণ্ঠ।

আলো ফেলে উঁকি দিল দু'জনে। গর্তের দেয়ালে একটা পাথর প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে রবিন! হাত ফসকালেই সর্বনাশ। গিয়ে পড়বে কোন অতলে কে জানে। গর্তের তলই দেখা যায় না। পড়লে শেষ।

দ্রুত হাতে দড়ি খুলতে শুরু করল কিশোর। চেঁচিয়ে আশ্বাস দিল মুসা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দড়ির একটা মাথা ছুঁড়ে ফেলল নিচে। দু'জনে মিলে টেনে তুলল ওকে।

ওপরে উঠে মেঝেতেই বসে পড়ল রবিন। হাঁপাতে লাগল। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বলল, 'ড্রাকুলাটা আমাকে ঠেলে দিয়েছিল ওখানে! রক্ত না খেয়ে আমাকে ওখানে ফেলল কেন?'

'সেটা অবশ্যই জেনে নেব ওর কাছ থেকে,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। 'আসল ভ্যাম্পায়ার নয়, তাহলে রক্ত খাওয়ারই চেষ্টা করত। এখন বেরোনো দরকার। ওই যে, সুড়ঙ্গের মাথায় আলো দেখা যাচ্ছে। বেশি দূরে নেই আর গুহামুখ।'

'সাবধান থাকতে হবে,' মুসা বলল। 'হয়তো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে। বেরোলেই কিছু করে বসবে।'

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। তৈরি হয়ে একযোগে হুড়মুড় করে বেরোল যাতে আঘাত এলে ঠেকাতে পারে। কিছুই ঘটল না। কেউ নেই ওখানে। উজ্জ্বল রোদ। গাছে গাছে পাখি গান গাইছে। অন্ধকার থেকে বেরিয়েছে, আলো যেন চোখ ধাঁধিয়ে দিল ওদের।

তাড়াতাড়ি পা চালাল ওরা। সরাইখানায় ঢুকতেই পড়ল এরিনার সামনে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন তিনি। ধীরে ধীরে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে হচ্ছে ড্রেনের মধ্যে পড়েছিলে?'

'ড্রেন নয়, পাতাল নদী। ওঠার পর ভেজা শরীরে মাটি লেগেছে।'

ভুরু উঁচু হয়ে গেল বৃদ্ধার। 'সত্যিই তাহলে ঢুকেছিলে ওখানে!'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আপনার ভ্যাম্পায়ারকেও দেখেছি।'

তীক্ষ্ণ হলো এরিনার দৃষ্টি। 'তোমাদেরকে আগেই হুঁশিয়ার করেছি...'

কাপড় বদলাতে গিয়ে উলফ ম্যানশনে কুড়িয়ে পাওয়া কাগজের টুকরোটার কথা মনে পড়ল রবিনের। বের করল প্যান্টের পকেট থেকে।

'আশ্চর্য!' বলল সে, 'ছেঁড়া! যখন পেয়েছিলাম তখন তো আস্তই ছিল।' ভালমত পকেট হাতড়ে দেখে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, নেই বাকিটুকু।'

'কি ওটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ছবির একটা লিস্ট। বোধহয় মিস্টার উলফই করেছিলেন। তাঁর স্টাডিতে ফায়ারপ্লেসের কাছে পেয়েছি। ফারনিকে দেখিয়েছিলাম। বলতে পারল না কেন লেখা হয়েছে।'

রবিনের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'আর্থার হেরিং...আর কিছুই তো নেই...' শ্রাগ করে কাগজটা রবিনকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও। কাজে লাগতে পারে।'

জামাকাপড় বদলে শুকনো আরেক জোড়া জুতো পায়ে দিয়ে বলল সে, 'চলো, মিস্টার ডনের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে আসি কি কি ঘটেছে।'

'তাঁকে আবার বলার দরকার কি?' মুসার প্রশ্ন। 'গুহার ভার তো আর তাঁর ওপর নয়...'

'দরকার আছে।'

আধ ঘণ্টা পর ব্যাংকের কাছাকাছি চলে এল তিন গোয়েন্দা। ফারনিকে দেখল জীপ থেকে নামছে। ওদেরকে দেখতে পায়নি। চলে গেল সদর দরজার দিকে। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ভাঁজ পড়েছে কপালে। চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে।

'একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল সে। 'তোমরা দু'জন ঢোকো। ফারনিকে নিয়ে

মিস্টার ডনের অফিসে চলে যাও। তাঁকে বলো গুহায় কি ঘটেছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি। দু'জনকে আটক রাখবে ততক্ষণ, যে ভাবেই পারো।'

মাথা ঝাঁকাল দুই সহকারী। অহেতুক প্রশ্ন করল না। জানে, জবাব পাবে না। যতটুকু বলার ঠিক ততটুকুই বলেছে কিশোর। সময় না হলে আর কিছু বলবে না।

ব্যাংকে ঢুকে জনসনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। বলল, মিস্টার ডনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওদেরকে প্রেসিডেন্টের অফিসে পৌঁছে দিয়ে ওদেরই নির্দেশে ফারনিকে খুঁজতে চললেন। ওকে নিয়ে আসার পর তিনজনের উপস্থিতিতেই গুহায় কি কি ঘটেছে বলতে লাগল রবিন আর মুসা।

ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের কথা খুলে বলল রবিন। এই আলোকিত অফিসে বসেও গায়ে কাঁটা দিল মুসার।

'অবাক কথা শোনালে!' মিস্টার ডন জানতে চাইলেন, 'কিশোর কোথায়?'

'এখনই আসবে। আমাদেরকে এখানে থাকতে বলেছে।'

ফারনি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, কে এভাবে তোমাদের পিছে লাগল। মনে হচ্ছে এ শহরে ঘোরাফেরা করতে পুলিশ এসকর্ট লাগবে তোমাদের জন্যে।'

ওরা কথা বলছে, এই সময় নিঃশব্দে খুলে গেল অফিসের দরজা। উঁকি দিল একটা ভ্যাম্পায়ারের মুখ।

হাঁ হয়ে গেলেন ব্যাংকার আর তাঁর সহকারী। চিৎকার করে লাফ দিয়ে গিয়ে মিস্টার ডনের চেয়ারের পাশে পড়ল মুসা। রবিন সরে গেল দেয়ালের কাছে।

ঘরে ঢুকল ভ্যাম্পায়ার। আস্তে করে টান দিয়ে খুলে নিল মুখোশ।

'কিশোর!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল রবিন আর মুসা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফারনির মুখ। দরজার দিকে পা বাড়াল। দুই কদম যাওয়ার আগেই আড়াল থেকে এসে দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন একজন পুলিশ অফিসার। ওর পথ আটকালেন।

'টনির কাছ থেকে এটা আদায় করতে বেশ কষ্টই হয়েছে, ফারনি,' মুখোশটা দুলিয়ে বলল কিশোর। 'পুলিশের ভয় দেখালাম, তখন দিল আপনার ড্রয়ার থেকে বের করে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিস্টার ডন। কড়া গলায় বললেন, 'আমরা এখানে কেউ ছেলেমানুষ নই। এই খেলার অর্থ কি?'

'খেলাটা ফারনিই শুরু করেছিল, আমি শেষ করলাম। অনেকখানিই আন্দাজ করে ফেলেছি আমি। বাকিটা তার মুখ থেকে বের করে নিতে পারবে পুলিশ।'

'কি বলছ বুঝতে পারছি না,' মুখ কালো করে ফারনি বলল, 'আমি আবার কি খেলা শুরু করলাম...'

'আপনি যা করেছেন, খুব খারাপ করেছেন। রবিনকে আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিলেন আজ।'

'কি যা তা বলছ! আমি একাজ করতে যাব কেন?'

'করেছেন, তার কারণ, উলফ ম্যানশনের ছবির লিস্টটা কুড়িয়ে পেয়েছিল রবিন। ছবিগুলো চুরি করার সময় কোন ভাবে আপনার পকেট থেকে পড়ে

গিয়েছিল হয়তো ওটা। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় খালি, সেখানে ছবি ঝোলানো ছিল। এখন নেই।'

সব কটা চোখ ফারনির ওপর। হেসে উঠল সে। 'কি পাগলের মত কথাবার্তা! তালা দেয়া ঘর। আমি ঢুকব কি করে? চাবি ছাড়া কারও পক্ষেই ঢোকা সম্ভব না। দরজা-জানালা ভেঙে ঢুকতে গেলেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল। 'তবে আপনি একটা গোপন পথ পেয়ে গিয়েছেন। ক্র্যাগি কেভ থেকে উলফ ম্যানশন। স্টাডির ফায়ারপ্লেসের নিচে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গটা, তাই না? সবগুলো ঘরে ঢুকে ছবির একটা লিস্ট করেছিলেন। তারপর যোগাযোগ করেছিলেন চোরাই ছবি যারা কেনে তাদের সঙ্গে। কোনটা কোনটা কিনবে জেনে নিয়েছিলেন। বেছে বেছে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো।'

থামল সে। তারপর আবার বলতে লাগল, 'কিন্তু আপনার কপাল খারাপ। লিস্টটা পড়ে গিয়েছিল। আর সেটা পেয়ে গেল রবিন। ঘাবড়ে গেলেন আপনি। পুলিশকে দেখালে আপনার হাতের লেখা সনাক্ত করে আপনাকে ধরে ফেলতে পারে। কাজেই লাগলেন ওর পেছনে, ঠেকানোর জন্যে।'

'আপনিই তাহলে ধাক্কা দিয়ে আলমারিতে ঢুকিয়েছিলেন,' রবিন বলল ফারনির দিকে তাকিয়ে। 'পরে অন্ধকার হলে এসে আমার কাছ থেকে লিস্টটা কেড়ে নিতেন। অন্ধকারে আপনার চেহারা দেখতাম না, চিনতাম না, আপনারও কাজ সারা হয়ে যেত।'

'যত্তোসব ফালতু কথা,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল ফারনি। 'আমি ধাক্কা দিলাম কখন? তার অনেক আগেই তো চলে এসেছিলাম।'

'কিন্তু রাস্তার ধারে গাড়িটা পার্ক করে আবার ফিরে গিয়েছিলেন,' বললেন জনসন।

সব কটা চোখ এখন ঘুরে গেল তাঁর দিকে।

'আপনি কি করেন দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ,' আবার বললেন ক্লার্ক। 'দেরি হয়ে গেলে মিস্টার ডন বকাবকি করবেন, এই জন্যে চলে এসেছিলাম। নইলে আরও থাকতাম।'

'হুঁ, তার মানে আপনি দেখেছেন।' আবার ফারনির দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'রবিনকে গুহায় আক্রমণ করেছিলেন তার পকেট থেকে লিস্টটা বের করে নেয়ার জন্যে। পুরোপুরি পারেননি, কিছুটা ছিঁড়ে রয়ে গিয়েছিল। কিংবা রবিনকে আলমারিতে ঠেলে দেয়ার আরও একটা কারণ হতে পারে, ওই সময়ই তার পকেট থেকে লিস্টটা বের করতে চেয়েছিলেন। ঠেলা দেয়ার সুযোগে। পারেননি। তারপর যখন পরে এসে নেয়ার আশাটাও ভেস্তে গেল, ছাতে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। টেবিল ছুঁড়ে মারলেন তার দিকে। জখম হয়ে সে হাসপাতালে গেলে তাকে দেখতে যাওয়ার ছুতোয় পকেট হাতড়ে কাগজটা বের করে নেয়ার উদ্দেশ্যে।

'ওই উদ্দেশ্যও সফল হলো না আপনার। তখন জীপের দরজা আলগা করে লাগালেন। রবিন আপনার পাশে উঠে বসতেই নিশ্চয় বুদ্ধিটা এসেছিল আপনার মাথায়। ইচ্ছে করেই ওরকম করে গাড়ি চালিয়েছিলেন, হঠাৎ মোড় নিয়েছিলেন

যাতে মাটিতে পড়ে যায় রবিন। তাকে তোলার ছুতোয় কাগজটা বের করার চেষ্টা করতেন।'

'গল্পটা ভালই তৈরি করেছ,' শীতল কণ্ঠে বলল ফারনি। 'চেষ্টা করলে ভাল রহস্য গল্প লিখতে পারবে।'

ওর কথা কানেই তুলল না কিশোর। 'গুহার সামনে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে এলেন। কায়দা করে বলে দিলেন কোন দিকে আমাদের যেতে হবে। তাহলে ভ্যাম্পায়ার সেজে ওখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারবেন আপনি। আবারও সেই একই কারণ, লিস্টটা চান। ধরে নিয়ে গেলেন রবিনকে। লিস্টটা বেরও করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোটা বেরোয়নি, ছিঁড়ে রয়ে গিয়েছিল একটা টুকরো। তাতে যতটুকু লেখা আছে তাতেই প্রমাণ করে ফেলা যাবে ওটা আপনারই হাতের লেখা।' সরাসরি তাকাল সে ফারনির দিকে। 'লিস্টটা নিয়েছেন, ভাল কথা, কিন্তু রবিনকে সিংক হোলে ঠেলে ফেলেছিলেন কেন? জানেন না, ও মারা যেতে পারত? নাকি ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সামনে যে হোল আছে খেয়াল করেননি?'

পকেট থেকে রবিনকে কাগজের টুকরোটা বের করতে দেখে ঝুলে পড়ল ফারনির চোয়াল। সেটা মিস্টার ডনের হাতে দিতে দিতে বলল রবিন, 'এই যে নিন। ব্যাঙ্কে নিশ্চয় ফারনির হাতের লেখা আছে?'

'আছে। সই আছে, লেখা আছে, ফর্মে। মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।'

হেরে গেছে, বুঝতে পারল ফারনি। আর অস্বীকার করে লাভ নেই। ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ওর দিকে তাকাল মুসা। 'একটা প্রশ্ন আছে আমার। এর আগেও ভ্যাম্পায়ার ভ্যাম্পায়ার খেলেছেন আপনি। মিসেস এরিনা গিলহ্যাম পাহাড়ের গুহায় ভ্যাম্পায়ার দেখেছেন। কেন করতেন ওকাজ?'

শ্রাগ করল ফারনি। 'ক্র্যাগি কেভ থেকে ম্যানশনে যাওয়ার একটা পথ আছে, এটা আমি চাচার মুখে শুনেছিলাম। সে বেঁচে থাকতে সাহস করিনি, মারা যাওয়ার পর গিয়ে সুড়ঙ্গটা খুঁজতে শুরু করলাম। দিনের পর দিন ওটা খুঁজেছি। লোকে গুহায় ঢুকত দেখার জন্যে, বাধা পড়ত আমার কাজে। শেষে ওদেরকে তাড়ানোর জন্যে ভ্যাম্পায়ার সাজার বুদ্ধিটা বের করলাম। কাজ হলো। কয়েক দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল গুজবটা, লোকে ভয়ে গুহায় ঢোকা বন্ধ করে দিল।'

'আমাদের সাথে ম্যানশনে গিয়েছিলেন কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'ছবিগুলো তো দেখাই ছিল আপনার।'

'দেয়ালের মাঝে মাঝে যে ছবি খোয়া গেছে এটা বোঝো কিনা তোমরা দেখতে গিয়েছিলাম। তাহলে মিস্টার ডনকে গিয়ে বলে দিতে। আমারও ছবি সরানো বন্ধ হয়ে যেত। যখন অনুমান করলে, মিস্টার উলফই ছবিগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন, স্বস্তি পেলাম। তিনি ইউরোপ থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি। সমস্ত ছবি ততদিনে সরিয়ে ফেলতে পারব...'

'কিন্তু পারলে না,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন মিস্টার ডন। 'তোমার শয়তানীটা থামিয়ে দিল ওরা,' চোখের ইশারায় তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন তিনি। 'শুধু যে

চুরির জন্যে জেলে যাবে তা নয়, সেই সাথে হামলার অভিযোগও চাপবে। খুনের চেষ্টা করেছিলে যদি প্রমাণিত হয়...'

শিউরে উঠল কারনি। তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল, 'না না, বিশ্বাস করুন, সে চেষ্টা আমি করিনি। কেবল কাগজটা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম...'

বাধা দিয়ে বললেন মিস্টার ডন, 'আমাকে বলে কি হবে। আদালতকে বিশ্বাস করিয়ো সেটা।'

মিস্টার জনসন হেসে বললেন, 'যাক, একটা ব্যাপার খুব ভাল হলো। ক্র্যাগি কেভে আবার টুরিস্টদের আনাগোনা শুরু হবে। ভূতের ভয় আর নেই জানলেই আবার ঢুকতে আরম্ভ করবে লোকে। 'খুশি হবে।'

'একজন বাদে,' কিশোর বলল। 'তিনি ভীষণ হতাশ হবেন।'

'কে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ডন।

'মিসেস গিলহ্যাম। জমিয়ে আর ভ্যাম্পায়ারের গল্প বলতে পারবেন না সরাইয়ের মেহমানদের কাছে। বাড়ির পাশে আর কোন ভ্যাম্পায়ার বাস করে না ভাবতেই কষ্ট হবে তাঁর।'

জলদস্যুর খুলি

এক

'গুড মর্নিং,' বালির পথ ধরে হেঁটে আসা পার্ক রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর পাশা, হাসিমুখে। নর্থ ক্যারোলিনার একটা ছোট্ট দ্বীপ পেলিক্যান আইল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। থাকার জন্যে ভাড়া নিয়েছে কটেজ।

এগিয়ে এলেন মাঝবয়েসী রেঞ্জার। গোলগাল হাসি-হাসি মুখ। বললেন, 'তাহলে জলদস্যুর সোনা দেখতে যাচ্ছ তুমি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছ দেখে। কেউই ওঠেনি এখনও।'

'ভোররাতে সেই যে ভাঙল আর ঘুম এল না। ঠিকই বলেছেন। ডাবলুনগুলো দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

হারবারের ধার দিয়ে ঘুরে রেঞ্জার স্টেশনের দিকে এগোল দু'জনে। রেঞ্জারের নাম আর্থার ডিকসন। হাঁটতে হাঁটতে জানালেন দ্বীপের উত্তর উপকূলে ডাবলুনগুলো পেয়েছে একজন জেলে।

'আশপাশের অন্যান্য দ্বীপের মতই,' জানালেন তিনি, 'পেলিক্যান আইল্যাণ্ডেও জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মত কুখ্যাত ডাকাতও এসে লুকিয়েছিল এখানে। সতেরোশো আঠারো সালে মারা পড়েছিল এই এলাকাতেই। ভার্জিনিয়ার গভর্নর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে একটা জাহাজ ভাড়া করেছিলেন। লোকজন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এখানে ডাকাতটাকে শেষ করার জন্যে।'

'মারতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না?' কিশোর বলল, 'ব্ল্যাকবিয়ার্ড তো শুনেছি সাংঘাতিক জলদস্যু ছিল।'

'তা তো ছিলই। অনেক চেষ্টার পর মারতে পারা গেছে ডাকাতটাকে। কোণঠাসা করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট রবার্ট মেনার্ড। পাঁচটা বুলেট আর তরবারির বিশটা খোঁচা লেগেছে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে শেষ করতে। ওর মাথা কেটে জাহাজের গলুইয়ে গেঁথে রেখেছিলেন মেনার্ড। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের মৃত্যু নিয়ে একটা গান রচনা করেছে বুড়ো রড বেনি। শুনে দেখো। ভাল লাগবে।'

'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ডাবলুনই তো, যেগুলো দেখানোর জন্যে রাখা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হতে পারে। হয়ে থাকলে আমাদের সাবধান হতে হবে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন ডিকসন। 'অভিশাপ দিয়ে গেছে ব্ল্যাকবিয়ার্ড। যে তার মোহরে হাত দেবে তার সর্বনাশ হবে।' গতি কমালেন তিনি। 'এই যে, এসে গেছি।'

দ্বীপের মেইন ডকে একটা কাঠের বাড়িতে করা হয়েছে রেঞ্জার স্টেশন। দেখতে ছোটখাট একটা গোলাঘরের মত। জানালা নেই। কেবল বড় একটা দরজা।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোস্ট গার্ডেরা বাড়িটা তৈরি করেছিল,' ডিকসন বললেন, 'জিনিসপত্র রাখার জন্যে।' অনেকটা কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বললেন, 'আশা করছি, শীঘ্রি একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে যেতে পারব আমরা।'

তালা খুলে ভারি কাঠের পাল্লাটা ঠেলে খুললেন রেঞ্জার।

'ওই যে পুরানো সিন্দুক, যেটাতে...' কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন তিনি।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে কিশোরও থমকে গেল। এক কোণে পুরানো একটা জাহাজের ওপর বসে রয়েছে যেন একটা মড়ার খুলি।

'ডাবলুনগুলো নেই!' প্রায় চিৎকার করে বললেন রেঞ্জার। তাকিয়ে রয়েছেন খুলিটার দিকে। ফিসফিস করে বললেন, 'ব্ল্যাকবিয়ার্ড!' চারপাশে তাকাতে লাগলেন তিনি। 'বুঝতে পারছি না সরাল কিভাবে! কে সরাল!'

'শেষ কখন দেখেছেন মোহরগুলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'কাল বিকেলে। রাতে বেরোনোর আগেও দেখেছি। তারপর তালা লাগিয়েছি। মনে হচ্ছে অভিশাপ ফলতে আরম্ভ করেছে!'

'আপনি যাওয়ার পর আর কারও কি ঘরে ঢোকা সম্ভব ছিল? মানে, আপনি বেরিয়ে গেলে কি ঢোকে?'

'না, চাবি শুধু আমার কাছেই থাকে। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার অ্যাসিসট্যান্ট জন মেজর মিনিটখানেকের জন্যে ভেতরে ঢুকেছিল ওর চমশা আনার জন্যে। খালি হাতেই বেরিয়েছে ও। শক্ত একটা প্লেক্সিগ্লাসের ঢাকনা লাগানো ছিল বাক্সটার ওপর, যাতে দর্শকরা দেখতে পারে, কিন্তু ভেঙে ভেতর থেকে মোহর তুলতে না পারে। তাছাড়া,' জোর দিয়ে শেষ কথাটা বললেন রেঞ্জার, 'জনকে আমি বিশ্বাস করি।'

'বেরোনোর পর দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়েছিল? ঠিক মনে আছে আপনার?'

'দুই-তিনবার করে চেক করি আমি। একটু আগে তোমার সামনেই তো খুললাম। তালা তো ছিলই।'

ঘরের ভেতরে চোখ বোলাল কিশোর। কেবল মোহরগুলোই নেই। আর কোন কিছুতে হাত দেয়া হয়েছে, কিংবা নড়ানো হয়েছে বলে মনে হলো না তার।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রেঞ্জার। 'হেডকোয়ার্টারে খবর তো যাবেই। ওরা আমার ওপর খুশি হবে না।'

'আপনার কি দোষ,' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল কিশোর। 'মোহরগুলো নিরাপদে রাখার সব ব্যবস্থাই আপনি করেছিলেন।'

কোস্ট গার্ড আর শেরিফকে খবর দিতে গেলেন ডিকসন। কিশোর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। খুলিটার কাছে কিংবা ঘরের ভেতরে কোথাও কোন সূত্র পেল না। বাইরে বেরিয়ে এল সে।

স্টেশনের পরেই যে ডকটা রয়েছে তার ধার ধরে এগোল। পানির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে, হঠাৎ ধাক্কা লাগল একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে। টলে উঠল সে। আরেকটু হলেই উল্টে পড়ত পানিতে, কোনমতে টাল সামলাল। লোকটাও পড়ে যাচ্ছিল। নিজে সোজা হয়ে লোকটাকেও ধরে ফেলল।

'সরি,' বলল কিশোর, 'দেখিনি।'

'দোষ আমারও আছে,' খাঁটি ব্রিটিশ টানে কথা বললেন ভদ্রলোক, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটলে বিপদে তো পড়বই। তোমাকেই বরং ধন্যবাদ দেয়া দরকার, আমাকে পড়তে দাওনি বলে।'

নিজের পরিচয় দিল কিশোর।

'আমি রবার্ট মরিস,' বললেন সাদা-চুল ভদ্রলোক। 'ইংল্যাণ্ড থেকে মাত্র এলাম।'

'পেলিক্যান আইল্যাণ্ডে কি মনে করে? বেড়াতে?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই এলাকায় লড়াই করেছি আমি,' মরিস বললেন। 'একটা ট্রলারে ছিলাম।'

'এই অঞ্চলে? এখানেও লড়াই হয়েছিল নাকি? এত ভেতরে চলে এসেছিল শত্রুরা?'

'এসেছিল। জাপানী সাবমেরিন। আমেরিকানরা টের পাওয়ার আগেই চট করে ঢুকে গিয়ে বেশ কিছু সদাগরী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। খবরটা পেয়েই আমরা, মানে ব্রিটিশরা ছুটে এসেছিলাম সাহায্য করতে। কারণ সাবমেরিনের সঙ্গে লড়াইটা তখনও তেমন করতে শেখেনি আমেরিকানরা।'

'তার মানে খুব জটিল কাজ?'

'তা তো বটেই, কৌশলীও হতে হয় খুব।' গম্ভীর হয়ে গেলেন মরিস। 'আমার জাহাজের নাম ছিল ল্যাংকাস্টার, ডুবিয়ে দিল জাপানীরা। মারা পড়ল আমার সঙ্গী অনেক নাবিক। এখানকার ইংরেজদের গোরস্থানে দাফন করা হলো ওদের।'

'ও, এই জন্যেই,' মাথা দোলাল কিশোর, 'এখন বুঝলাম। একটা গোরস্থানে

ব্রিটিশ পতাকা উড়তে দেখে অবাক হয়েছিলাম।'

'যুদ্ধে নিহত নাবিকদের লাশ দেখে দয়া হয়েছিল এখানকার মানুষের। গোরস্থানের জন্যে জায়গাটা দান করে দিল। সেই যে গেলাম আর আসতে পারিনি। এবার সময় করতে পেরেই চলে এলাম গোরস্থানটা দেখতে। ল্যাংকাস্টারের কতটা বাকি আছে তা-ও দেখার ইচ্ছে আছে,' কথাগুলো বলার সময় বিষণ্ন হয়ে গেলেন মরিস।

'সরি,' সহানুভূতি জানাল কিশোর। একটু চুপ থেকে বলল, 'আপনার পুরানো দিনের গল্প শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। জানি, আমার বন্ধুরাও শুনতে চাইবে। এক কাজ করুন না, আজ রাতে চলে আসুন আমাদের কটেজে। ডিনারটা আমাদের সঙ্গেই করবেন। আসবেন?'

উজ্জ্বল হলো মরিসের মুখ। 'আসব।'

'তাড়াতাড়িই চলে আসুন। এই সন্ধে সাতটা নাগাদ?'

'ঠিক আছে।'

এই সময় মিস্টার ডিকসনকে আসতে দেখল কিশোর। মোহর চুরির কথা জানাল মরিসকে। তারপর, 'সন্ধ্যায় দেখা হবে' বলে রওনা হয়ে গেল রেঞ্জারের সঙ্গে।

আবার অফিসে ঢুকল দু'জনে।

মনমরা হয়ে গেছেন ডিকসন। 'কি করে ঢুকল কিছুই বুঝতে পারছি না। কাণ্ড দেখে ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ভূত বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করছে এখন। বন্দরের সমস্ত বোট খুঁজে দেখছে কোস্ট গার্ড। আপাতত এর বেশি আর কিছু করা যাচ্ছে না।'

'হয়তো ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর।

'পেলে ভাল। তবে আমার সন্দেহ আছে। গোয়েন্দা হিসেবে ভালই তো নাম করেছ তোমরা, খবর নিয়েছি। এক কাজ করো না। খোঁজো না মোহরগুলো।'

কিশোর তো এটাই চায়। রেঞ্জার অনুরোধ করার আগেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছিল সে। এখন ব্যাপারটা আরও পাকাপোক্ত হলো। আরেকবার ভালমত খোঁজা শুরু করল ঘরের ভেতরে। কাঠের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল খুলিটা। মাড়ির ভেতরের দিকের একটা দাঁতে কালো দাগ চোখে পড়ল। ফিলিং করা হয়েছিল।

কথাটা ডিকসনকে জানাল না। ফিরে এল নিজের কটেজে।

দুই

চোখ বড় বড় করে মোহর চুরির গল্প শুনল রবিন আর মুসা।

'মনে হচ্ছে,' রবিন বলল, 'আরেকটা রহস্য পেয়ে গেলাম আমরা।'

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'আমি বাপু ওসব খুলিফুলির মধ্যে নেই। হাজার হোক জলদস্যুর খুলি, তার ওপর ব্ল্যাকবিয়ার্ডের, তার ওপর আবার অভিশপ্ত। কাজ নেই আমার ভূতের তাড়া খেয়ে।'

'তোমার এই কুসংস্কারটা যে কবে যাবে,' নাক কুঁচকাল রবিন।

'একটা সূত্র আমি পেয়েছি, শুনলে ভূতের ভয় কিছু কমবে তোমার,' মুসাকে বলল কিশোর। 'খুলিটার একটা দাঁত ফিলিং করা।'

'তাতে কি?' হাত ওল্টাল মুসা। 'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের দাঁতে কি গর্ত হতে পারে না?'

'পারে,' হাসল কিশোর। 'কিন্তু ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পেরেছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'তার মানে,' রবিন বলল, 'তুমি বলতে চাইছ পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পাবাজি?'

'হ্যাঁ। তবে স্টেশনে ঢুকল কি করে চোর সেটাই বুঝতে পারছি না। দেখে তো ভূতের কাণ্ডই মনে হয়।'

'তাহলে আর কি। যাও, ভূতের সঙ্গে হাতাহাতি করো গিয়ে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'মোহরগুলো কেড়ে আনার চেষ্টা করো। তো, আজ বিকেলে কি সৈকতে যাবে সাঁতার কাটতে? যেটা প্ল্যান করা ছিল?'

'তা তো যাবই,' হেসে বলল কিশোর। 'পেলিক্যান আইল্যাণ্ডের সৈকত, যে ভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকে, না গিয়ে কি উপায় আছে? ভাবছি, বিকেল নয়, দুপুরে খেয়েই চলে যাব। অনেকক্ষণ সময় পাব তাহলে সাঁতার কাটার।'

সাঁতার কেটে আর সৈকতে ঘোরাফেরা করে সময়টা যেন ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল।

ভেজা শরীরে তীরের বালিতে বসে কিশোর বলল, 'ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাদের সাহায্য দরকার।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন। 'মনে হচ্ছে দাওয়াত করেছ কাউকে?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

ফেরার পথে রেঞ্জারের স্টেশনে ঢুকল কিশোর, রবিন আর মুসা চলে গেল ডিনারের ব্যবস্থা করতে। নতুন কোন খবর নেই ডিকসনের কাছে। একজন লোক বসে আছে। বয়েস পঁচিশ মত হবে, হালকা-পাতলা গড়ন, চোখে চশমা।

পরিচয় করিয়ে দিলেন রেঞ্জার, 'কিশোর, ও আমার অ্যাসিসট্যান্ট, জন মেজর। জন, ও কিশোর পাশা, গোয়েন্দা। মোহর চুরির তদন্ত করছে। খুঁজে বের করতে অনুরোধ করেছি আমি ওকে।'

'তুমি এতে জড়ালে কি করে?' নিরস গলায় কিশোরকে জিজ্ঞেস করল জন।

'সকালে আমার সাথেই এসেছিল এখানে, মোহর দেখতে,' জবাবটা দিলেন রেঞ্জার। 'দরজা খুলে দেখি ওগুলো নেই। কাজেই আর কি। গোয়েন্দার চোখে রহস্য পড়েছে, চুপ করে কি বসে থাকবে?' হাসলেন তিনি।

'ভাল,' উৎসাহ পেল না জন। 'তবে সমস্যাটা আমাদের, আমরাই সমাধান করতে পারতাম।'

'পারতাম,' সহকারীর ব্যবহারে মনে মনে কিছুটা আহতই হলেন ডিকসন, 'এখনও কেউ পারতে মানা করেনি। করো না সমাধান। বাইরে থেকেও যদি

কিছুটা সাহায্য পাওয়া যায় ক্ষতি কি?'

চুপ হয়ে গেল জন।

কিশোরকে নিয়ে অফিসের বাইরে বেরোলেন রেঞ্জার। বললেন, 'মোহর চুরির খবর পাওয়ার পর থেকেই ওরকম আচরণ করছে জন। চিন্তায় পড়ে গেছে। মানসিক চাপ সইতে পারে না একেবারেই।'

কিন্তু এই কৈফিয়তেও খুশি হতে পারল না কিশোর। জনের আচরণ রহস্যজনক মনে হয়েছে ওর কাছে। তবে সেকথা বলল না রেঞ্জারকে।

জন মেজরের কথা ভাবতে ভাবতেই চিন্তিত ভঙ্গিতে বন্দরের ধার দিয়ে কটেজে ফিরে চলল সে। ঘরে ঢুকে দূর করে দিল সমস্ত ভাবনা। ডিনার তৈরিতে সাহায্য করতে লাগল দুই বন্ধুকে।

খাবার তৈরি হয়ে গেলে বারান্দায় এসে বসল তিনজনে, মিস্টার রবার্ট মরিসের আসার অপেক্ষায়।

গোধূলির আকাশের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'দেখো, কি রঙ! সব লাল করে দিয়েছে। নৌকার পালগুলোর অবস্থা দেখো! ইস্, কি সুন্দর!'

কিশোরের চোখে স্বপ্ন। সুন্দর চোখদুটো গোধূলির লাল আলোয় আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'পেলিক্যান আইল্যাণ্ডের সূর্য ডোবা সুন্দর শুনেছি। কিন্তু এত সুন্দর কল্পনাই করিনি!'

চুপচাপ সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। পশ্চিম দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টাচ্ছে আকাশ। সূর্যটা যেন অর্ধেক তলিয়ে গেছে পানির তলায়। ডুবছে ক্রমেই। একেবারে হারিয়ে যাওয়ার পরেও মিস্টার মরিস এলেন না।

'এত দেরি করছেন কেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'যাই, গিয়ে দেখে আসি।'

'আমরা আসব?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'না, তোমরা থাকো। যদি চলে আসেন। আমিই যাই।'

তিন

বন্দরের ধার দিয়ে চলল কিশোর। দ্রুত কমে আসছে আলো। ওদের কটেজে গেলে এই পথেই তাঁর যাওয়ার কথা। এদিকে কোথাও তাঁকে না দেখে কিশোর ভাবল, নিশ্চয় গোরস্থানে চলে গেছেন। কাজেই সেখানেই চলল সে।

রাস্তায় আলো নেই। অন্ধকারও হয়ে এসেছে। পথ চলতে অসুবিধেই হতে লাগল তার। তাই বলে থামল না। এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। খানিক পরেই একটা ল্যাম্প পোস্ট চোখে পড়ল, ম্লান আলো জ্বলছে। পাশেই একটা ব্রিটিশ পতাকা পতপত করে উড়ছে বাতাসে। নিচু করে বেড়া দেয়া গোরস্থানের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ওখানেও দেখতে পেল না মিস্টার মরিসকে। ল্যাম্প পোস্টের নিচেই রয়েছে একটা চারকোণা পাথরের ফলক। খোদাই করে তাতে লেখা রয়েছে যুদ্ধে নিহত নাবিকদের নাম। একটা নামে দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। টমাস

মরিস।

আর কোথায় খুঁজবে? বন্দরের ধারের অন্ধকার পথ দিয়েই আবার কটেজে ফিরে চলল কিশোর। একটা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ব্যাঞ্জোর বাজনা কানে এল ওর, সেই সঙ্গে ভারি গলায় গান। 'ব্রিটিশ বয়েজ' শব্দ দুটো বুঝতে পারল। বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল সে। রোদ-বাতাসে পোড়খাওয়া একজন বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখল একটা দোকানের বারান্দায়।

'এই যে, শুনছেন?' ডাকল কিশোর।

এতই মগ্ন হয়ে ছিল মানুষটা, কিশোরকে আসতে দেখতেই পায়নি, ডাক শুনে চমকে উঠল। বুকে ফুঁ দিতে দিতে বলল, 'এমন করে কেউ ডাকে? জান উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

'সরি,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আপনি নিশ্চয় রড বেনি। রেঞ্জার ডিকসন আপনার গানের খুব তারিফ করেছেন।'

'রেঞ্জার তো আমাকে ইতিহাসের একটা খুঁটিই মনে করেন,' কিশোর যে তার নাম শুনেছে এটা জেনে খুশি হলো বুড়ো। 'একটু আগে যে গাইছিলাম গানটা, সেটা আমি নিজে বানিয়েছি। ওই ইংরেজ ছেলেগুলোর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। বেয়াল্লিশ সালে মারা গিয়েছিল ওরা।'

মরিসের কথা বুড়োকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। ভদ্রলোককে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না গায়ক। বলল, 'ডিনারের দাওয়াতের কথা ভুলে গেছে হয়তো।'

মেনে নিতে পারল না কিশোর। এ হতে পারে না। সেটা জানাল না বেনিকে। ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আরেক দিন এসে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে নিয়ে লেখা গানটা শুনে যাবে।

বুড়োর বাড়ি থেকে বেরিয়েই কোস্ট গার্ড স্টেশনের দিকে রওনা দিল সে। ডেস্কে বসে আছে একজন তরুণ। মিস্টার মরিসের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারল না সে। কিশোর দরজার দিকে পা বাড়াতেই ডেকে ফেরাল। বলল, 'আরগিস রাইডারের সাথে কথা বলেছ? স্কুবা ডাইভার। ডুবে যাওয়া জাহাজের আশেপাশে ডুব দেয়। জেটিতে নোঙর করা একটা অনেক বড় ক্যাটাম্যারান জাহাজ দেখেছ নিশ্চয়, ওটা তার। রাতে অবশ্য জাহাজে থাকে না। একটা কটেজ ভাড়া করেছে।'

রাইডারের কটেজটা কোথায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। জানল, ওদের কটেজের কাছেই, বেশি দূরে না।

বড় একটা টর্চ নিতে বলল কিশোরকে তরুণ। 'রাতে ভীষণ অন্ধকার এখানে,' বলল সে। 'ভয়ই লাগে, এত বেশি। নিয়ে যাও, কাল দিয়ে যেও, তাহলেই হবে।'

টর্চ হলে ভালই হয়। নিয়ে নিল কিশোর। লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল কটেজের দিকে।

ঘরের কাছে পৌঁছতেই মুসা ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কিশোর? মিস্টার মরিসকে পেয়েছ?'

'না,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল কিশোর, 'তবে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার মত আরেকটা সূত্র পেয়েছি।'

'মনে হয় দাওয়াতের কথা ভুলে গেছেন মিস্টার মরিস,' রবিন বলল। 'ঘুমিয়েই পড়েছেন বোধহয়।'

'আমার তা মনে হয় না। আসার জন্যে এতটাই আগ্রহী ছিলেন,' বলল কিশোর, 'ভোলার কথা নয়।' ভাবল, কোন বিপদে পড়লেন না তো তিনি?

মুসা বলল, 'কোথায় উঠেছেন তিনি জানা থাকলে ভাল হত।'

'দেখা যাক,' কিশোর বলল, 'আশা করি বের করে ফেলতে পরব।' আরগিস রাইডারের কথা দু'জনকে শোনাল সে। 'তার কাছে জানতে না পারলে সকালে গিয়ে হোটেল আর কটেজগুলোতে খোঁজ করব।'

'এখনই যেতে চাও রাইডারের ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি। রবিন থাক, ঘর একেবারে খালি ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। বলা যায় না, এসে হাজির হতে পারেন মিস্টার মরিস।'

বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। বালিতে ঢাকা কাঁচা রাস্তা। অন্ধকারের ব্যাপারে আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল কোস্ট গার্ডের লোকটা, তারপরেও অন্ধকারের বহর দেখে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর। হাতের টর্চটা ছাড়া ত্রিসীমানায় আর কোন আলো চোখে পড়ল না। কটেজটার কাছে পৌঁছে তার ওপর টর্চের আলো ফেলে বোঝার চেষ্টা করল ঠিকটাতেই এসেছে কিনা। এগিয়ে গেল মুসাকে নিয়ে। পেছনের বারান্দার দিকে আলো দেখা যাচ্ছে।

ডাক দিল কিশোর, 'কেউ আছেন?'

'এত রাতে কে?' জবাব এল কর্কশ কণ্ঠে।

'আমরা,' নাম বলল কিশোর। কেন এসেছে সে কথাও জানাল।

'দাঁড়াও, আসছি।'

ছিটকানি খোলার শব্দ হলো। স্ক্রীন ডোর খুলে বেরিয়ে এলেন সোনালি চুল, শক্তসমর্থ পেশীবহুল শরীরের একজন মানুষ। বয়েস আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে। কিশোর আর মুসার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সরি। আমি ভেবেছিলাম···ট্যুরিস্টরা বিরক্ত করে তো···যাকগে। আমি আরগিস রাইডার।'

বারান্দায় উঠল কিশোর। 'বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। দেখতে এসেছিলাম, মিস্টার মরিস আছেন কিনা।'

মাথা নাড়লেন স্কুবা ডাইভার। 'না। ওই নামের কাউকে চিনিই না।'

'ও। কি জানি, ল্যাংকাস্টারেই চলে গেল কিনা।'

মনে হলো চমকে গেলেন রাইডার। দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন, 'তাহলে নিশ্চয় দেখতাম তাঁকে। রোজই ল্যাংকাস্টারের পাশ দিয়ে যাই-আসি। আর আজ তো প্রায় সরাদিনই ছিলাম ওটার কাছাকাছি। মিস্টার মরিস যাননি ওখানে···তোমরা খুঁজছ কেন?'

'তিনি আমাদের বন্ধু,' জবাব দিল মুসা। 'আজ সন্ধ্যায় আমাদের কটেজে

ডিনারে আসার কথা ছিল।'

'কেমন বন্ধু?' তীক্ষ্ণ হলো রাইডারের দৃষ্টি, 'বেশি ঘনিষ্ঠ?'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা যেন কেমন, ভাল লাগল না কিশোরের। জবাব দিল, 'দুশ্চিন্তা করার মত ঘনিষ্ঠ তো বটেই।'

'ও। তবে আমি হলে দুশ্চিন্তা করতাম না,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন রাইডার। 'তিনি তো আর কচি খোকা নন। তাছাড়া বেড়াতে এসেছেন এখানে। বেড়াতে এলে লোকে ঘরে বসে থাকে না, ঘুরেই বেড়ায়। খোঁজ নিয়ে দেখোগে, হয়তো অন্য কোন দ্বীপে চলে গেছেন। সময়মত এসে ফেরি ধরতে পারেননি, আটকে গেছেন। কাল সকালে উঠেই চলে আসবেন।'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন,' সন্তুষ্ট হতে পারছে না কিশোর। চট করে আরেক প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আচ্ছা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী হলেন কেন আপনি?'

জাহাজীদের নানা রকম যন্ত্রপাতিতে বারান্দাটা বোঝাই হয়ে আছে। বেশির ভাগই পুরানো, বাতিল, মরচে পড়া জিনিস। তারই ফাঁকে এক জায়গায় গোটা চারেক বেতের চেয়ার বসানো, দুই গোয়েন্দাকে বসতে বললেন রাইডার। নিজেও বসলেন একটাতে।

'হবি,' কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বললেন। 'ব্যাপারটা এসে গেছে স্বাভাবিক ভাবেই। আমি একজন স্কুবা ডাইভার। আর এই এলাকায় বিশ্বযুদ্ধের নানা রকম জিনিসে ভরা। সাগরের তলায় ওসব জিনিসের কাছে ডুব দিতে দিতে কখন যে আগ্রহটা বেড়ে গেল, বলতেই পারব না।'

'বন্দরে আপনার ক্যাটাম্যারানটা দেখেছি,' কিশোর বলল। 'খুব সুন্দর। ঘুমানোর জায়গা আছে নাকি? বাস করা যায়?'

'আছে। তবে বেশি ছোট, গাদাগাদি মনে হয় আমার কাছে। আরেকটু খোলামেলা না হলে বাস করা যায় না। সে জন্যেই কটেজে থাকি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, কটেজে থাকাটা বেশি আরাম। তবে জাহাজে থাকার আলাদা মজা, নিশ্চয় স্বীকার করবেন। ভাবছি, যদি অনুমতি দেন, আপনার জাহাজটা গিয়ে একবার দেখব।'

কোনরকম উৎসাহ দেখালেন না রাইডার, 'ও দেখার মত কিছু নয়। তবে যেতে চাইলে যাবে। হাতে কাজকর্ম যখন থাকবে না আমার, নিয়ে যাব। উঠেছ কোথায়?'

'বন্দরের কাছে ওয়ারনার কটেজে।'

'দু'জনেই?' মুসার ওপর চোখ বোলালেন রাইডার।

'হ্যাঁ। আমাদের আরও এক বন্ধু আছে,' মুসা জবাব দিল।

কিশোর বলল, 'ঝামেলা করব না আমরা। যদি মনে করেন বেশি মানুষ উঠলে অসুবিধে হবে, আমি একাই যেতে পারি। ক্যাটাম্যারান দেখার আমার খুব শখ। আরও একটা জিনিসে আগ্রহ আছে, ডুবে যাওয়া জাহাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ে ডুবে থাকলে তো কথাই নেই।' কথাটা বলল কিশোর তার কারণ, তার মনে হয়েছে অনেক কিছু জানেন রাইডার। সেগুলো বের করতে চায়।

তাকে হতাশ করলেন রাইডার। ওই সম্পর্কে কিছুই বললেন না। বললেন, 'সময় করতে পারলে নিয়ে যাব তোমাদের। তো, এখন যে আমাকে মাপ করতে হয়, কাজ আছে।'

'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' উঠল কিশোর। বিড়বিড় করে কি বললেন রাইডার, বোঝা গেল না।

চার

সে রাতে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখল কিশোর। ভাল ঘুম হলো না। কাকভোরে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। রবিন আর মুসা তখনও ঘুমিয়ে। ডাকল না ওদেরকে। একটা নোট লিখে রেখে বেরিয়ে পড়ল। কটেজের সঙ্গে একটা মোটরবোটও ভাড়া নিয়েছে ওরা। স্কুবা ডাইভিঙের সরঞ্জাম নিয়েছে সঙ্গে, আর একটা ম্যাপ। ম্যাপটা ওকে দিয়েছেন রেঞ্জার ডিকসন। ডুবন্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে দেখানো আছে তাতে। বোট নিয়ে চলল ল্যাংকাস্টারের দিকে।

তার আগেই ডুবো জাহাজের কাছে এসে বসে আছেন রাইডার, দেখে অবাক হলো কিশোর। পরনে ডুবুরির পোশাক। ওকে দেখে যে খুশি হননি বোঝা গেল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার খাতিরে একবার হাত নেড়েই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর পিছু পিছু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

নোঙর ফেলে বোটটাকে আটকাল কিশোর। ডুবুরির পোশাক পরে নোঙরের দড়িটার কাছাকাছি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার ধার ঘেঁষে নেমে চলল নিচে। ল্যাংকাস্টার জাহাজটা ওখানেই ডুবেছে।

ওপরে আলো তখনও তেমন বাড়েনি। নিচে তাই কালচে ধূসর হয়ে আছে পানির রঙ। সেই আলোয় কেমন যেন কাঁপা কাঁপা ভূতুড়ে দেখাল জাহাজটার অবয়ব। ভয় লাগে। মনে হয় ঘাপটি মেরে রয়েছে ভয়ংকর কোন জলদানব। মিস্টার মরিস একটুও বাড়িয়ে বলেননি। তিনি বলেই দিয়েছেন, আসল জাহাজ বলতে যা বোঝায় তা নয় ল্যাংকাস্টার। তৈরি করা হয়েছিল এক জিনিস, পরে বদলে আরেক জিনিস বানানো হয়েছে। এই ধরনের যান নিয়ে ডুবোজাহাজের পেছনে তেড়ে এসেছিল যেসব নাবিক তাদের দুঃসাহসের কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

জাহাজটার পাশ দিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে খোলের গায়ে এক জায়গায় মস্ত একটা কালো ফোকর দেখতে পেল কিশোর। নিশ্চয় এখানেই আঘাত হেনেছিল সাবমেরিনের টর্পেডো। দ্বিধা করল একবার, তারপর সাবধানে ঢুকতে শুরু করল ভেতরে।

হঠাৎ, কোনরকম জানান না দিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ল কি যেন। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। হাঙর না তো! ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল একটা কঙ্কাল। মাথা নেই।

তাড়াতাড়ি পানির ওপরে উঠে এল কিশোর। কঙ্কালের ভয়ে অবশ্যই নয়।

দেখার জন্যে। বোটে ফেরেননি রাইডার। কঙ্কালটা তিনিই ফেলেছেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। কেন? কঙ্কাল নিয়ে কিছু করছিলেন? নাকি তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে? আর তাড়াতেই যদি চান, তাহলে কেন চান?

পায়ের ফ্লিপার খুলে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নৌকায় উঠে এল কিশোর। কাঁধ থেকে ভারি এয়ার ট্যাঙ্কটা খুলে রেখে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে জেটিতে রওনা হলো। সকালের বাতাসে ঢেউ বেড়েছে সাগরের। দোল খাচ্ছে বোট। খোলের গায়ে ছলাৎ-ছল বাড়ি মারছে পানি।

কটেজের বারান্দায় অধীর আগ্রহে মুসা আর রবিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর।

'এসেছ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'আমি তো ভাবলাম ডুবো জাহাজের ভূতেই বুঝি ধরল!'

'ধরেছিল,' জবাব দিল কিশোর। 'একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। তারও আবার মুণ্ড নেই।' কঙ্কালটার কথা ওদেরকে জানাল সে।

চোখ বড় বড় করে শুনল মুসা। রেগে গিয়ে রবিন বলল, 'শুনে রাইডার লোকটাকে ভাল মনে হচ্ছে না আমার। কঙ্কাল সে-ই ফেলেছে।'

কিশোরও একমত হলো। মুসার পাশের একটা চেয়ারে বসল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল দু'বার। উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।

'কি হলো? কিছু পেলে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাসল কিশোর। 'পেয়েছি। একটা কাজ করতে যাচ্ছি। তবে সেটা করার আগে হোটেল আর কটেজগুলোতে মিস্টার মরিসের খোঁজ নেব।'

'সে তো অনেক খোঁজাখুঁজির ব্যাপার। সময় লাগবে।'

'শুরু করে দিই, তারপর দেখা যাক।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা, 'বুঝতে পারছি, এযাত্রা আর রক্ষা নেই, ভূত হয়ে ডুবো জাহাজ পাহারা দিতেই হবে। শেষবারের মত নাস্তাটা খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন। স্বীকার করল, খুবই ভাল হয়। মুসার কথায় ওদের শূন্য পেটও মোচড় দিয়ে উঠেছে। রবিনকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল মুসা। কিশোর গেল গোসল করতে। বেরিয়ে সুইমস্যুট পরে খাবার টেবিলে এসে দেখল ডিম ভাজা, মাংস ভাজা আর চমৎকার সুস্বাদু কর্নব্রেড সাজানো হয়ে গেছে। নাক কুঁচকে বাতাসে ঘ্রাণ টানল সে, বলল, 'দারুণ গন্ধ!'

খাওয়া শেষে মুসা বলল, 'কাপপ্লেটগুলো ধুয়ে রেখে যাব?'

'পরে এসে ধুলেও চলবে,' কিশোর বলল। 'এখন আর সময় নষ্ট করতে চাই না। মিস্টার মরিসকে খুঁজে বের করা জরুরী।'

ভাগাভাগি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে হোটেল আর কটেজগুলোতে খুঁজবে, ঠিক হলো। 'বন্দরের উল্টোদিকেরগুলোতে যাব আমি,' কিশোর বলল। 'রবিন, তুমি রাইডারের ওখানে চলে যাও। তোমাকে চেনে না তো, হয়তো কথা কিছু বেরও করে ফেলতে পারবে।'

'ব্যাটার নাকে একটা ঘুসি মেরে দেয়া দরকার,' মুসা বলল। 'লোকের গায়ে কঙ্কাল ফেলে! এত্তোবড় শয়তান!'

'মেরে আর কাজ নেই,' কিশোর বলল। 'ওদিকে যাওয়ারই দরকার নেই তোমার। তুমি চলে যাও ওদিকটাতে,' হাত তুলে তৃতীয় আরেক দিক দেখাল সে।

দিনের বেশির ভাগটাই কাটাল ওরা মিস্টার মরিসের খোঁজে। পেল না।

বিকেলে তিনদিক থেকে এসে কটেজে মিলিত হলো তিনজনে। রবিন বলল, 'কিচ্ছু পেলাম না। মনে হয় যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে জলজ্যান্ত একজন মানুষ।'

গোরস্থানের নামের তালিকাটার কথা ভাবল কিশোর। ভাবল টমাস মরিস নামটার কথা। ওখানে কোন সূত্র লুকিয়ে নেই তো?

মুসা জানাল, 'ঘড়িটা ফেলে গিয়েছিল, সেটা নিতে এসেছিল কটেজে। এই সময় এলেন রাইডার। কিশোর, সে বলে তুমি নাকি তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছ। আমার মনে হলো সে-ও তোমার ব্যাপারে কম আগ্রহী নয়। হাজারটা প্রশ্ন করল। জবাব দিইনি। কেবল হ্যাঁ-হুঁ করে সেরে দিয়েছি।' হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই যেন চমকে উঠল, 'হায় হায়, এত্তো দেরি হয়ে গেছে! এই জন্যেই তো বলি, পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকে কেন?'

'রান্নাঘরে কিছু আছেটাছে?' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

'এখন কোনমতে চলবে,' রবিন জানাল। 'তবে রাতের জন্যে খাবার আনা লাগবে। ডিনারে কি করা যায়, বলো তো?'

'বুড়ো রড বেনির দোকান থেকে গিয়ে কিছু তাজা মাছ কিনে আনতে পারি,' মুসা প্রস্তাব দিল। 'রান্নার বই ঘেঁটে দেখলাম এখানকার লোকেরা মাছের কয়েকটা দারুণ প্রিপারেশন করে, খুব নাকি টেস্ট। আমরাও করে দেখতে পারি।'

'ভাল বলেছ,' একমত হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। ভাবল কি যেন। 'এক কাজ করো। রান্নাঘরে যা আছে রেডি করে ফেলো তোমরা। আমি গিয়ে চট করে মাছ নিয়ে আসি।'

সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল মুসা। 'মাছ আনতেই যাচ্ছ, না আর কিছু?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই রবিন হেসে বলল, 'শুধু মাছের জন্যে কি আর যায়। নিশ্চয় অন্য মতলব আছে।'

কটেজের স্টোররুমে সাইকেল আছে। সামনে হ্যাণ্ডেলের নিচে তারের ঝুড়ি লাগানো। জিনিসপত্র রাখার সুবিধের জন্যে। নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। বন্দরের ধার দিয়ে এগিয়ে চলল ধীরগতিতে। জোরে চালানোর প্রয়োজন নেই। মোহর আর মিস্টার মরিসের রহস্যজনক নিরুদ্দেশের কথা ভাবতে ভাবতে চলেছে। মাঝে সাঝে অলস ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে জেটিতে বাঁধা বোটগুলোর দিকে। ঢেউয়ে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে ওগুলো।

আচমকা পেছন থেকে ধেয়ে এল একটা ট্রাক। কাছে এসে এমনভাবে চেপে এল, রাস্তার কিনারের নরম বালিতে সাইকেল নামিয়ে আনতে বাধ্য হলো কিশোর। ঢাল বেয়ে খাদে গড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচার জন্যে হ্যাণ্ডেল নিয়ে কসরত শুরু করল

কিশোর। এর মাঝে একপলকের জন্যে নজর দিতে পারল ট্রাকটার দিকে। ছুটে চলে যাচ্ছে ওটা। ড্রাইভারকে দেখতে পেল না, তবে পার্ক সার্ভিসের হালকা সবুজ রঙের গাড়ি ঠিকই চিনতে পারল।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে জোরে জোরে প্যাডাল করে রেঞ্জারের বাড়িতে চলল সে। বারান্দাতেই একটা রকিং চেয়ারে বসে আছেন ডিকসন। কিশোরের কথা শুনলেন গম্ভীর হয়ে। তারপর বললেন, ব্যাপারটা অবশ্যই দেখবেন তিনি। কে ওভাবে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়েছে বের করবেন। কিশোর কোথাও ব্যথাট্যথা পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। মাথা নাড়ল কিশোর। রেঞ্জার বললেন, 'আমার অফিসের কেউ তো ওরকম করার কথা না। সবাই খুব সাবধান হয়ে গাড়ি চালায়।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মোহরগুলো চুরি করল, তারপর এরকম একটা কাণ্ড···নাহ্, বুঝতে পারছি না!'

মোহর চুরির কথায় আরেকটা কথা মনে পড়ল কিশোরের। বলল, 'আপনার অফিসের চাবিটা একটু দেবেন? আজ রাতে একবার ঢুকতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। আমিও যাব তোমার সাথে।'

'না, আপনি না গেলেই ভাল হয়। আমি একা যেতে চাই। আর, চাবিটা যে আমাকে দিয়েছেন একথা কাউকে বলবেন না।'

'বলব না,' কথা দিলেন রেঞ্জার। 'কিন্তু আমার কৌতূহল তো বাড়িয়ে দিচ্ছ।'

'কাল সকালে চাবিটা দিয়ে যাওয়ার সময় আপনাকে সব খুলে বলব। এখন আমার তাড়া আছে। মাছ কিনে নিয়ে যেতে হবে। রবিন আর মুসা বসে আছে। ওদেরকে খাবার বাড়তে বলে বেরিয়ে পড়েছি।'

চাবিটা পকেটে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল কিশোর। দ্রুত চলল রড বেনির দোকানে।

কিশোরকে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল বুড়ো, 'বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। তোমার বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছ?'

পায়নি, জানাল কিশোর।

'অত চিন্তা করো না,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল বুড়ো। 'দেখো, চলে আসবে। তো, কি চাই?'

'মাছ। ভাল কিছু থাকলে দিন।'

'তাজা ব্লু-ফিশ আছে। চলবে? খুব টেস্ট।'

মাথা কাত করল কিশোর।

খবরের কাগজে মাছ জড়িয়ে দিল বেনি। দাম নিল না কিছুতেই। বলল, 'দামটা অন্যভাবে আদায় করে নেব তোমার কাছে। নিরালায় বসে একদিন আমার গান শুনবে। তাহলেই আমি খুশি।'

কিন্তু কিশোর ভাবল অন্য কথা। একটা কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবে বুড়োর বাড়িতে, গানও শুনে আসবে, জিনিসটাও দিয়ে আসবে। দাম দেয়ার জন্যে আর চাপাচাপি করল না। সাইকেলের ঝুড়িতে তুলে নিল প্যাকেটটা।

বুড়ো হেসে রসিকতা করল. 'দেখো, যাওয়ার সময় বেড়ালের দল কিভাবে

পিছু নেয়। ওরাও আমার মাছ ভীষণ পছন্দ করে।'

রান্নাটা তিনজনে মিলেই করল। বই পড়ে পড়ে বলে দিতে লাগল রবিন কোনটার পর কোন মশলা দিতে হবে, কিভাবে মাখাতে হবে, কিভাবে ভাজতে হবে। গলদঘর্ম হয়ে রান্নাটা শেষ করার পর গন্ধ শুঁকে মুসা বলল, 'দারুণ হয়েছে, বুঝলে। আমি আর থাকতে পারছি না, বসলাম।'

তিনজনেই বসল খাবার টেবিলে। আসলেই ভাল রান্না হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর বাসনপেয়ালা ধুতে ধুতে মিস্টার মরিসের আলোচনা শুরু করল কিশোর। জানাল তার পরিকল্পনার কথা। রাতে যাবে রেঞ্জারের অফিসে। মুসা আর রবিন সঙ্গে যেতে চাইলে বলল, বেশি লোক গেলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। সে জন্যে একা একাই যাওয়া ভাল। এগারোটার পরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। তখন নির্জন হয়ে যাবে এলাকাটা।

মুসা বলল, 'এখনও ভেবে দেখো। বিপদে পড়ে যেতে পারো।'

কিশোর জবাব দিল, 'সেজন্যেই তো তোমাদের রেখে যেতে চাইছি। সবাই একসাথে বিপদে পড়লে উদ্ধার করবে কে?'

কথাটা ঠিক। চুপ হয়ে গেল মুসা।

কয়েক ঘণ্টা পর যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো কিশোর। বারবার সাবধান করে দিল মুসা আর রবিন, যাতে সতর্ক থাকে, যদিও কিশোরকে এটা মনে করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ঘর থেকে বেরোল সে। হালকা মেঘে ঢেকে গেছে তখন আকাশ। এমনিতেই অন্ধকার এখানে বেশি। তার ওপর আকাশে তারা, চাঁদ কিংবা রাস্তার আলো না থাকায় মনে হলো যেন কালি গুলে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে টর্চ রয়েছে, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে জ্বালতে সাহস করল না। বন্দরের ধার দিয়ে হাঁটার সময় কানে এল বোটে বোটে ঘষা লাগার আওয়াজ, কেমন যেন একটা তাল একটা ছন্দ রয়েছে, বাজনার মত মনে হয়। ভাল লাগে কিশোরের। কেমন যেন নেশা ধরায় এই শব্দ। আশপাশের একটা কটেজেও বাতি দেখা গেল না। সবাইই ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়।

হঠাৎ ওর মনে হলো কে যেন আসছে পেছনে। পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে। থেমে ভালমত শোনার জন্যে কান পাতল। জেটির গায়ে একটা বোটের ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে বেশ জোরেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন পদশব্দ আর শুনতে পেল না, ধরে নিল, বোটের শব্দই শুনেছে। তবু খুঁতখুঁত করতে থাকল মনটা। সন্তুষ্ট হতে পারল না।

অন্ধকারে রেঞ্জার স্টেশনের আবছা অবয়বটা কেমন ভূতুড়ে লাগল। বাড়িটাতে জানালা নেই বলে খুশিই হলো সে। ভেতরে আলো জ্বালতে পারবে নিশ্চিন্তে, বাইরে থেকে দেখে ফেলার ভয় নেই।

চাবি দিয়ে তালা খুলে নিঃশব্দে ভারি দরজাটা খুলে ফেলল সে। ভেতরে ঢুকে কোন রকম শব্দ না করে আবার লাগিয়ে দিল পাল্লাটা। টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল প্রথমে মেঝেতে। সিন্দুকটা যেখানে ছিল সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে কাঠের মেঝে পরীক্ষা করতে লাগল। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। সমস্ত মেঝেটা খুঁজেও

পেল না কিছু।

এরপর জন মেজরের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল সে। নিচে উঁকি দিল। কিছুই না দেখে সোজা হতে যাবে এই সময় চোখে পড়ল ওটা। খুব কায়দা করে কাঠের গায়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে হুড়কোটা। ওটা ধরে টানাটানি করতেই সড়াৎ করে খুলে গেল একটা চোরাদরজা, নিচে পানি দেখা গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে বাড়ি লাগল মাথায়। এক ধাক্কায় পানিতে গিয়ে পড়ল কিশোর।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরলে দেখল হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। মাথার যেখানটায় বাড়ি লেগেছে সেখানে দপদপে ব্যথা। চারপাশে একপলক তাকিয়ে বুঝতে পারল একটা জাহাজের কেবিনে ভরে রাখা হয়েছে তাকে। মনে হচ্ছে, আরগিস রাইডারের ক্যাটাম্যারানেই।

উল্টোপাশের দেয়ালে আরেকটা বাংক। তাতে পড়ে আছেন মিস্টার মরিস। একই ভাবে হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। চোখে চোখ পড়তেই চোখ টিপল কিশোর। মলিন হাসি হাসলেন ভদ্রলোক। মুখের কাপড়ের জন্যে স্পষ্ট হলো না হাসিটা। খেতেটেতে দেয়নি নাকি?

চলতে শুরু করল জাহাজ। খানিক পরেই দুলতে লাগল। তার মানে খোলা সাগরে বেরিয়ে এসেছে। দরজা লাগানো। ছোট্ট কেবিনটা বড়ই গুমোট, অস্বস্তিকর পরিবেশ। দম আটকে আসে। এভাবে বেশিক্ষণ থাকতে হলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

ছোট খোলা পোর্টহোল দিয়ে দু'জন লোকের গলা শোনা গেল। একমাত্র ওই পথেই বাতাস আসে। আরগিস রাইডার আর জন মেজরের গলা চিনতে পারল সে।

'ছেলেটা ভীষণ পাজী!' হিসহিস করে বলল জন। 'এক বুড়োর ভয়েই বাঁচি না, তার ওপর যোগ হয়েছে আরেক বিচ্ছু! এত কষ্ট সব ভণ্ডুলই হয়ে যায় বুঝি...'

'কিছুই হবে না,' খসখসে গলায় বলল রাইডার। 'ছেলেটা যে অফিসে গিয়েছিল কেউ জানে না একথা। আর দরজা না ভেঙে ঘরেও ঢুকতে পারবে না। চাবি তো এখন সাগরের তলায়।'

'ওর বন্ধুরা ঘাবড়ে গিয়ে কোস্ট গার্ডকে খবর দিয়ে বসতে পারে।'

'সকালের আগে জানবেই না নিখোঁজ হয়েছে। ততক্ষণে বহুদূরে চলে যাবে বুড়ো আর ছোঁড়া। সকালে তুমি অফিসে যাবে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে। সোনাগুলো আমি লুকিয়ে ফেলব। খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। অবস্থা যদি বেশি ঘোরাল হয়ে ওঠে, কেটে পড়ব। তোমাকেও পালাতে হবে।'

'সারা এলাকায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হবে আমাকে,' গুঙিয়ে উঠল জন। 'পালিয়ে বাঁচতে পারব না।'

'আহ্, চুপ করো তো!' ধমকে উঠল রাইডার। 'পোলাপানের মত অত পুতুপুতু করলে কে ঢুকতে বলেছিল। তুমি ইচ্ছে করেই করেছ, খারাপ কিছু ঘটতে পারে

জেনেশুনেই । তাই বলছি, খারাপ কিছু যাতে না ঘটে সেই চেষ্টা করো। সাহায্য করো আমাকে।'

চুপ হয়ে গেল দু'জনে। ভেসে চলেছে জাহাজ। আবার ওদের কথা শুনতে পেল কিশোর।

'অ্যাই,' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল জন, 'ভোর হচ্ছে।'

নোঙর ফেলার শব্দ কানে এল কিশোরের।

'যে ভাবে যা করতে বলেছি মনে আছে তো?' রাইডার বলল। 'এখানে সোনাগুলো লুকাব। মিনিট পনেরো লাগবে। তারপর বুড়ো আর ছেলেটার ব্যবস্থা করব। আমি না আসা পর্যন্ত ওদেরকে পাহারা দেবে তুমি। এই সহজ কাজটা পারবে আশা করি?'

পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ হলো। নিশ্চয় নেমে গেছে রাইডার।

বিড়বিড় করে আনমনে রাইডারকে গাল দিল জন, 'মাথামোটা শুয়োর কোথাকার।' মুচকি হাসল কিশোর। সামনে থাকতে বিশালদেহী ডাইভারকে গাল দেয়ার সাহস করতে পারেনি খুদে অফিস সহকারী।

এটাই উপযুক্ত সময়। আর দেরি করা যায় না। কেবিনের ভেতরে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। কিছু একটা করতে হবে।

ছয়

কটেজে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে মুসা আর রবিন। কিশোর না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

'চিন্তা লাগছে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ হলো গেছে। নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আমাদের সঙ্গে নেয়নি। এখন তো মনে হচ্ছে না নিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারেনি। আমার ভয় লাগছে, বুঝলে। কিছু হয়েছে।'

'আমারও লাগছে। চলো, যাই। অফিসে ওকে না পেলে কোস্ট গার্ডকে জানাতে হবে। এভাবে বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

ড্রয়ার টান দিয়ে একটা টর্চ বের করল মুসা। সুইচ টিপে দেখল ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। 'খাইছে!'

'অন্ধকারের ভয় করছ?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না। করেও লাভ নেই। ভূতপ্রেতকে এখন পাত্তা দিলে চলবে না। আগে কিশোরকে বের করতে হবে, তারপর কথা...'

কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। অন্ধকার মানে কি! প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এরই মাঝে আন্দাজে পথ চলল ওরা।

রাস্তার পাশে বিচিত্র একটা ক্রোঁক ক্রোঁক শব্দ হতেই চমকে উঠল মুসা। টের পেল সেটা রবিন। মুসার হাত ধরে বলল, 'ভয় পেয়েছ? কিছু না ওটা, ব্যাঙ।'

'না, পাইনি,' জবাব দিল মুসা।

রেঞ্জারের অফিসের সামনে পৌঁছে কান পাতল দু'জনে শব্দের আশায়। কিছুই

শোনা গেল না। আলো দেখা গেল না কোথাও। শেষে দরজার কাছে গিয়ে থাবা দিয়ে ডাকল কিশোরের নাম ধরে। সাড়া এল না। ডাকাডাকি করে, থাবা দিয়েও জবাব না পেয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা করল। পারল না। সাংঘাতিক শক্ত পাল্লা। সত্যিই কিছু ঘটেছে কিশোরের এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই ওদের। দৌড় দিল কোস্ট গার্ড স্টেশনে।

'আল্লাহই জানে কি হয়েছে ওর!' মুসা বলল। 'ব্ল্যাকবিয়ার্ডটা তো ছিল একটা আস্ত শয়তান, ওর ভূতটা নিশ্চয় আরও হারামী।'

জবাব দিল না রবিন। ওর অন্য ভয়। মেরেটেরে কিশোরকে সাগরে ফেলে দিল না তো মোহর চোরেরা?

আগের রাতে কোস্ট গার্ডের যে লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিশোরের, যাকে মিস্টার মরিসের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, তার সঙ্গেই দেখা হলো ওদেরও। কিশোরকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে চিন্তিত হলো সে।

'নাইট পেট্রোল এখনও বাইরে, ফেরেনি,' ওদেরকে জানাল সে। 'দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি। রেডিওতে জানিয়ে দিচ্ছি। ডাঙায় যারা আছে তারা রেঞ্জার স্টেশন আর বন্দরের কাছে খুঁজবে। ক্যাপ্টেন ওয়াটসনকেও জানানো দরকার। হলোটা কি? হঠাৎ করেই মানুষ হারিয়ে যেতে শুরু করল পেলিক্যান আইল্যাণ্ড থেকে! এরকম তো কখনও হয়নি!'

পাশের টেবিলে রাখা বিরাট রেডিওটার দিকে ঝুঁকল সে।

সাত

হাঁসের মত গলা লম্বা করে ঘুরিয়ে পেছনে একটা বোট হর্ন দেখতে পেল কিশোর। একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না। শরীর মুচড়ে মুচড়ে সরতে আরম্ভ করল ওটার দিকে। মিস্টার মরিসের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল ওটার কাছে। নিতম্ব ঠেকল হর্নের গায়ে। চাপ দিল সে। বিকট শব্দ, কানে তালা লাগিয়ে দেয়। কেয়ারই করল না কিশোর। চাপ দিয়ে দিয়ে এস ও এস পাঠাতে লাগল।

'এই, কি করছ?' প্রথমবার হর্ন বাজতেই ছুট লাগিয়েছে জন। কেবিনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোরের দিকে তাকিয়ে। 'থামো! নইলে সোজা নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দেব।'

থেমে গেল কিশোর। দূরে শোনা গেল কোস্ট গার্ডের সাইরেন। ভীষণ চমকে গেল জন। নড়তেও পারছে না যেন আর। পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। কিশোরকে একটা গাল দিয়ে ছুটে গিয়ে নিয়ে এল বোটের রেডিওটা। জোরে চালিয়ে দিল। রক মিউজিক বাজছে একটা স্টেশনে।

দাঁত বের করে হেসে কিশোরকে বলল জন, 'ব্যস, হয়েছে। যত খুশি চেঁচাও। ওই বাজনার জন্যে তোমার চিৎকার আর শুনতে পাবে না কোস্টগার্ড।' ডেকে ফিরে গেল সে।

কয়েক মিনিট পরে লাউড স্পীকারে একটা ভারি কণ্ঠ শুনতে পেল কিশোর,

'আহয়! আমি কোস্ট গার্ডের ক্যাপ্টেন ওয়াটসন। তোমাদের এস ও এস পেলাম।'

'সরি, ক্যাপ্টেন,' মসৃণ কণ্ঠে জন বলল, 'আসলে, দেখতে চেয়েছিলাম হর্নটা ঠিকমত কাজ করে কিনা। ভেবেছি, কাছাকাছি কেউ নেই, শুনতে পাবে না।'

'তুমি পার্ক রেঞ্জারের লোক, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। সত্যিই গাধামী করে ফেলেছি। ভুল করে যে এস ও এস পাঠিয়ে বসছি খেয়ালই করিনি।'

'রাইডারের জাহাজে কি করছ?'

'রাইডার বলল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মূল্যবান কিছু খুঁজে পেয়েছে। আমরা স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্যুরিস্টদের দেখাতে পারব। তাই দেখতে এলাম কি পেল।'

'কোঁকড়া চুল একটা বিদেশী ছেলেকে দেখেছ? কিশোর পাশা নাম।'

'না তো? হারিয়ে গেছে নাকি?'

'রেডিওতে জানানো হয়েছে আমাদেরকে, ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে বের করতে হবে।'

বলা যায় না, জন মেজরের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতে পারেন ক্যাপ্টেন, ভয় পাচ্ছে কিশোর। তুমুল গতিতে ভাবনা চলেছে তার মাথায়। হর্নটা ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে গেছে জন। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতেই বুদ্ধিটা এসে গেল। কাঁধের ওপর শরীরের ভর রেখে দেয়াল ঘেঁষে শরীরটা তুলে দিতে পারে পোর্টহোলের দিকে। পিছমোড়া করে এমন করে বাঁধা হয়েছে হাত-পা, শরীর পুরোপুরি সোজা করতে পারে না, তবে একটা পা সম্ভবত পোর্টহোলের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

তা-ই করল সে। পোর্টহোলের কাছে পা-টা নিয়ে গিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়তে লাগল।

সেটা চোখে পড়ল একজন নাবিকের। ক্যাপ্টেনের কাছে এসে কানে কানে বলল সেকথা।

জনকে বললেন ক্যাপ্টেন, 'তোমাকে বোটে আসতে হবে। কিছু রুটিন পেপার সই করতে হবে। নিয়ম, বুঝলে। তোমাকে তো আর খুলে বলতে হবে না, ওসব নিয়ম-কানুন তোমার ভালই জানা আছে। কি যে দরকার এসবের, বুঝি না। যত্তসব!'

কিছুই সন্দেহ করল না জন। বোটে নামতে তৈরি হলো। দু'দিক থেকে দু'জন কোস্ট গার্ড হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে, যেন নামতে সাহায্য করার জন্যে। চেপে ধরল হাত। বোটে নামার পরও ছাড়ল না। শক্ত করে ধরে রাখল।

ছাড়ানোর চেষ্টা করল জন। না পেরে রেগে গিয়ে বলল, 'এসবের মানে কি? হাত ছাড়ছ না কেন?'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন বললেন, 'একটা আজব জিনিস দেখেছে একজন নাবিক। সেটাই দেখতে যাব আমরা। অবশ্য যদি তুমি বলে দাও, তাহলে আর কষ্ট করার দরকার নেই। বলে ফেলো। ঝামেলা করো না।'

মিথ্যে বলে আর লাভ নেই, বুঝতে পারল জন। গুঙিয়ে উঠল, 'আমার কোন দোষ নেই। সব রাইডারের শয়তানী।'

'তা তো বটেই,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কে আর নিজের দোষ স্বীকার করতে চায়?'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুক্ত করা হলো কিশোরকে। তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'বুদ্ধি ভালই করেছিলে।'

মৃদু হাসল শুধু কিশোর। কিছু বলল না।

'তুমি চালাকিগুলো না করলে,' আবার বললেন ক্যাপ্টেন, 'খুঁজেই বের করতে পারতাম না তোমাদেরকে। অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে এই এলাকায়। ওগুলোর কোনটাতে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ফেলে দিয়ে এলে জীবনেও খুঁজে পাওয়া যেত না আর।'

'হুঁ,' মিস্টার মরিস বললেন, 'কিশোর আসাতে বেঁচে গেলাম।' জোরে জোরে হাত পা ডলে বাঁধনের জায়গাগুলোতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করছেন। 'কল্পনাই করিনি আমার মত একজন বুড়ো নাবিকও জাহাজে থেকে অসুস্থ হয়ে যাবে। এটা শয়তানের জাহাজ। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

'কিছু খেতে দেয়নি ওরা আপনাকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'না। ওদের বোধহয় ভয় ছিল মুখের কাপড় খুললেই চেঁচাতে শুরু করব। আসলেও তাই করতাম।'

'রাইডার কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'ডুব দিয়েছে,' সাগরের দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর। 'ডুবো জাহাজে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসবে পার্ক রেঞ্জারের অফিস থেকে চুরি করে আনা মোহরগুলো।'

'জন আর রাইডার চুরি করেছে ওগুলো?' বিশ্বাস করতে পারছে না ওয়াটসন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'জনকে চেপে ধরুন, সব কথা স্বীকার করবে। বড়ই দুর্বল চরিত্র।'

কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন ক্যাপ্টেন। সাহায্য লাগল না। ক্যাটাম্যারান থেকে কোস্ট গার্ডের বোটে লাফিয়ে নেমে এল কিশোর।

দু'জন নাবিকের মাঝখানে মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছে জন। ওদের তুলনায় তার শরীর এতই ছোট, মনে হচ্ছে গুরুজনদের মাঝে গাল ফুলিয়ে বসে আছে দুষ্টু ছেলে।

ক্যাপ্টেন আর মিস্টার মরিসও বোটে নেমে আসার পর শুরু করল কিশোর, 'জন আর রাইডার ছিল পার্টনার। দু'জনে মিলেই মোহর চুরির প্ল্যান করেছে। ওখানে চাকরি করে জন, তাই রাতে অফিসে থাকতে তার কোন অসুবিধে হত না। তখনই মেঝেটা একটু একটু করে কেটেছে। নিচে থেকে ছিদ্র করে একটা শিকটিক বোধহয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল রাইডার, জনকে বুঝিয়েছে কোন্ জায়গায় কাটতে হবে। তার ওপরই নিজের ডেস্ক রেখেছিল, ফলে ফোকরটা দেখা যেত না। ফোকরটা করে ট্র্যাপডোর বানিয়ে ঢেকে দিয়েছিল সে। একটা হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিল। সেটা এমনই কৌশলে, ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না।'

জনের দিকে তাকাল কিশোর। আরেক দিকে চোখ ফেরাল সহকারী রেঞ্জার। 'পথ তো তৈরি হলো,' আবার বলল কিশোর, 'এখন মোহরগুলো নেয়ার পালা। রাতের বেলা মিস্টার ডিকসন অফিসের দরজায় তালা লাগালে জন বলল সে চশমা ফেলে এসেছে। চশমা আনার ছুতোয় আবার অফিসে ঢুকে মোহরের থলেটা ফোকর দিয়ে নিচে ফেলে দিয়ে ট্র্যাপডোর লাগিয়ে চশমা নিয়ে বেরিয়ে এল। নিচেই ডুবুরির পোশাক পরে পানিতে অপেক্ষা করছিল রাইডার। মোহরগুলো তুলে নিয়ে ক্যাটাম্যারানে চলে গেল সে। বেরোনোর আগে সিন্দুকের ওপর একটা মড়ার খুলি বসিয়ে দিয়ে এল জন, বোঝানোর জন্যে, ব্ল্যাকবিয়ার্ডের অভিশাপের ফলেই উধাও হয়েছে মোহরগুলো, খুলিটা জলদস্যুর। ভূতুড়ে কারবার বোঝাতে চেয়েছে। মানুষকে যেন ছাগল পেয়েছে, যা বোঝাবে তাই বিশ্বাস করবে।'

'খুলিটা কোথায় পেলে?' জনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন ক্যাপ্টেন।

'কোত্থেকে আর?' জবাবটা কিশোরই দিল, 'ল্যাংকাস্টার জাহাজ থেকে। রাইডার এনে দিয়েছিল। কঙ্কালটা সেদিন পানিতে আমার ওপর ফেলে দিয়েছিল সে। আবারও সেই ভূতুড়ে কাণ্ড বোঝানোর চেষ্টা।'

'ওটা একটা ইডিয়ট!' রাইডারকে গাল দিল জন। 'এসব বুদ্ধি তার।'

বলতে থাকল কিশোর, 'রাতে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলেছিল রাইডার মোহরগুলো। ভোরের আগেই আবার বের করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিল ডুবন্ত জাহাজে। তাই সকালে গিয়ে তার ক্যাটাম্যারানে খুঁজে কিছুই পায়নি কোস্ট গার্ড।'

মুখ খুললেন মিস্টার মরিস, 'কিশোর, সেদিন সকালে তোমার সাথে কথা বলে যাওয়ার সময় রাইডারের সাথে দেখা হয়ে গেল। ল্যাংকাস্টারের ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথাটা সে আড়িপেতে শুনে ফেলেছিল। আমাকে পরদিন সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল।'

'আপনি নিশ্চয় মোহরগুলো দেখে ফেলেছিলেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ নাবিক, 'ল্যাংকাস্টারকে যতটা চিনি, আমার নিজেকেও হয়তো অতটা চিনি না আমি। মোহরগুলো যে দেখে ফেলেছি এটা বুঝে ফেলল রাইডার। তখন আর আমাকে ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে নিয়ে গেল ক্যাটাম্যারানে।'

'আমাকেও ঠেকাতে চেয়েছিল রাইডার,' কিশোর বলল। 'ল্যাংকাস্টার জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে ফেলে সে। যেতে দিতে চাইছিল না। গেলে যদি মোহরগুলো দেখে ফেলি, এই ভয়ে। ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে ফেরাতে চাইল। ওপর থেকে কঙ্কাল ফেলে দিল গায়ের ওপর। ওটার খুলি ছিল না। দেখেই আন্দাজ করতে পারলাম কোত্থেকে এসেছে রেঞ্জারের অফিসের খুলিটা। ট্র্যাপডোরের কথাটা ভাবলাম। রাতে সেটাই দেখার জন্যে গিয়ে ঢুকলাম অফিসে। রাইডার বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিল আগেই। হামলা করে বসল আমার ওপর।'

'ডেঁপো ছোকরা!' গাল দিল জন, 'সব ভণ্ডুল করেছ তুমি!'

কানই দিল না কিশোর। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'রাইডারের ভেসে ওঠার সময় হয়েছে।'

'উঠুক। উঠলেই ধরব,' ওয়াটসন বললেন।

আট

সেদিন বিকেলে ডিকসনের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াতে এল তিন গোয়েন্দা আর মিস্টার মরিস। চমৎকার খাবার তৈরি করেছেন মিসেস ডিকসন।

খাওয়ার পর রেঞ্জার বললেন, 'তোমাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'আমাদের জন্যে?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'হ্যাঁ,' মিটিমিটি হাসছেন ডিকসন। 'চলো, বেরোই। সারপ্রাইজটা অন্য জায়গায়।'

ওদেরকে রড বেনির দোকানে নিয়ে এলেন তিনি। বারান্দায় বসে আছে বুড়ো, মুখে হাসি, হাতে ব্যাঞ্জো। ওদেরকে দেখেই কোন কথা না বলে ব্যাঞ্জো বাজাতে শুরু করল, তারপর ধরল গান। অবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পেলিক্যান আইল্যাণ্ডে ওদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প নিয়েই তৈরি করেছে তার নতুন গান। মুগ্ধ হয়ে শুনল ওরা। গান শেষ হলেও অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তারপর আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দারুণ! দারুণ গেয়েছেন!'

'পছন্দ হয়েছে?' খুশি হলো বুড়ো। 'এটা ব্ল্যাক-বিয়ার্ডেরটার চেয়ে ভাল।'

'সেটা না শুনলে বুঝব কি করে?' কিশোর বলল, 'আপনি আমাকে শোনাবেন কথা দিয়েছিলেন।'

আবার শুরু হলো গান। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ভয়ংকর মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। শিউরে উঠল নিজের অজান্তে।

গান শেষ হলে হাসল কিশোর। বেনিকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুরোধ করল, 'আরেকটা গান গাইবেন, প্লীজ? সেদিন যে গেয়েছিলেন, মিস্টার মরিস আর তাঁর ইংরেজ নাবিকদের গানটা।'

'মিস্টার মরিস কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন।

সবাই তাকাল। কই? নেই তিনি। নিঃশব্দে কখন উঠে চলে গেছেন কেউ টের পায়নি। কিশোর বলল, তিনি কোথায় গেছেন অনুমান করতে পারছে সে। কোথায়, জানতে চাইল সবাই। সে জানাল, গোরস্থানে। নামের তালিকায় যে আরেকজন মরিসের নাম রয়েছে, সেকথা বলল।

'তাঁর বাবা নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে।'

ভয়াল বন

বনের ভেতরে ঢুকে দু'দিকে ভাগ হয়ে চলে গেছে কাঁচা সড়কটা। 'উলাগ লেকে গেছে কোনটা?' সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

পুরানো ম্যাপটা আরেকবার দেখল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'সাইনবোর্ড তো থাকার কথা।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ওই যে, ওটা কি?'

এগোল ওরা। একটা গাছের গায়ে পেরেক গেঁথে লাগানো রয়েছে ছোট্ট সাইনবোর্ড, তাতে মড়ার খুলির নিচে হাড়ের ক্রস আঁকা।

'এই চিহ্ন কেন এখানে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান, চিন্তিত। 'বিপজ্জনক বোঝানোর কারণ কি? এ-তো ট্যুরিস্ট স্পট। নাকি লেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কোন কারণে?'

'তাহলে তো রাস্তাও বন্ধ করে দেয়া হত,' রবিন বলল। 'তা-তো করেনি।'

'চলো, এগিয়ে দেখি,' বলল কিশোর।

যে রাস্তার পাশে গাছে সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে সেটা ধরে এগোল তিন গোয়েন্দা। ধূলি ধূসরিত পথ। গাছের মাথায় সোনালি রোদ, সূর্য ডুবছে।

কয়েক মিনিট পর আরেকটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে লেখাঃ বিপদ। ফিরে যাও।

উসখুস করতে লাগল মুসা। 'চলো, ফিরেই যাই। গাছপালাগুলো দেখেছ? কেমন যেন মরা মরা। কিছু একটা গোলমাল আছে।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে,' একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু কি গোলমাল, না দেখেই ফিরে যাব?'

ছুটি কাটাতে এসেছে ওরা লেক উলাগে। সাইকেল নিয়ে এসেছে বাসে তুলে। বাস স্টপেজ কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছে।

সামনে পাতলা হয়ে আসছে বন। বসন্তের মাঝামাঝি, বনে বনে সবুজ পাতা, ফুলের সমারোহ। এখানেও তা-ই থাকার কথা, কিন্তু নেই। বন নয়, যেন বনের শুকনো কঙ্কাল। ছায়া-ঢাকা পথ। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নামতে শুরু করবে অন্ধকার।

'আমার গা ছমছম করছে,' কেঁপে উঠল মুসা। 'চল ফিরে যাই।'

'এই তো, এসে পড়েছি,' মোটেই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কিশোরের, রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। 'আর মাত্র কয়েক মাইল।'

প্যাডাল ঘুরিয়ে চলল ওরা। দূরে একটা কুঁড়ে চোখে পড়ল, পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। কিম্ভূত চেহারা। চারপাশে মরা গাছের প্রাকৃতিক-বেড়া। জায়গার সঙ্গে মানিয়ে গেছে কুঁড়েটা।

'হ্রদটা ওখানেই,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল কিশোর।

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করল রবিন।

ভ্রূকুটি করল মুসা। 'অদ্ভুত নয়, মরে ভূত। আল্লাই জানে কি হবে?'

হ্রদটা দেখা গেল। পানির কিনারে এসে সাইকেল থেকে নামল ওরা। বনের মতই হ্রদটাও যেন মরে গেছে। কিনারে বিছিয়ে রয়েছে মাছের কঙ্কাল।

'ব্যাপারটা কি?' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'কি হয়েছিল এখানে?'

চারপাশে তাকিয়ে দেখছে কিশোর. নীরব। বারো একর মত হবে হ্রদটা,

জঙ্গলে ঘেরা। সব মরা গাছ।

'বুঝতে পারছি না,' আনমনে বলল সে।

'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তো! কি করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'খিদেও পেয়েছে,' মুসা বলল।

তার দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। যত বিপদে, যে অবস্থায়ই থাকুক, খিদে ভোলে না সহজে গোয়েন্দা-সহকারী। 'কোথাও রাতটা কাটাতে পারলে, সকালে উঠে যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

তিনটে সাইকেলেই বোঝা, ক্যাম্প করার সরঞ্জাম এনেছে। শেষ হয়ে আসছে দিনের আলো। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মালপত্র খুলতে শুরু করল ওরা।

'কিশোর, দেখো দেখো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, চেহারা ফ্যাকাসে। 'ওই যে, গাছগুলোর মাথায়।'

অন্য দু'জনও তাকাল। পানির ক্যান্টিনটা রবিনের হাত থেকে খসে পড়ে গেল, ঝনঝন করে উঠল পাথরে লেগে। গাছের মাথায় অলস ভঙ্গিতে উড়ছে চারটে...না, পাঁচটা; আরেকটা বেরিয়ে এসেছে মরা ডালপাতার আড়াল থেকে—উজ্জ্বল, গোলাকার কি যেন, অনেকটা বেলুনের মত। জ্বলছে।

হলুদ রঙের জিনিসগুলো গাছের ডালে বাড়ি লেগে বলের মতো ড্রপ খেয়ে উঠে যাচ্ছে, আবার আস্তে করে নেমে আসছে, ভাসছে বাতাসে। মরা বনে জীবন্ত মনে হচ্ছে জিনিসগুলোকে।

'কি ওগুলো?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'ভূ-ভূত!' মুসার গলা শুকনো। বিড়বিড় করে বোধহয় দোয়াদরূদ পড়ছে।

'ভূত না,' কিশোর বলল।

'তাহলে কি? দেখো, কেমন নাচছে...উড়ছে...যেন মহাখুশি! যদি নেমে আসে?'

'তাহলে ভাল বোঝা যাবে ওগুলো কি।'

গাছের মাথায় কয়েক মিনিট ভাসল জিনিসগুলো, তারপর একসঙ্গে উঠতে শুরু করল ওপরে। প্রথমে ধীরে, তারপর গতি বাড়তে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল শূন্যে, মিলিয়ে গেল অন্ধকার আকাশে।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মুসা, জোরে জোরে দম নিচ্ছে। 'আ-আমার জীবনে এত ভয় পাইনি!'

'আমিও না,' স্বীকার করল রবিন।

'চলো, ভাগি এখান থেকে।' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'মালপত্রগুলো?' দ্বিধা করছে কিশোর। 'খুললাম, আবার বাঁধব? সময় লাগবে।'

'থাক না এখানেই,' মুসা বলল। 'এই ভূতুড়ে বনে কে নিতে আসবে? সকালে এসে নিয়ে যাবো। চলো, কোন মোটেল পাই কিনা দেখি। এদিকে আছে বললে না?'

জিনিসগুলো ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। আসলে এখান থেকে

যাওয়ারই ইচ্ছে নেই তার। কিন্তু মুসা আর রবিনের অবস্থা দেখে জোরও করতে পারছে না থাকার জন্যে।

অগত্যা যেতেই হলো।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল রবিন। 'এই কিশোর? রাস্তা ঠিক আছে তো? এই মোড়টা ছিল তখন?'

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে!' সাইকেলের লাইট ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

'খাইছে! ও কিসের শব্দ?' আঁতকে উঠল মুসা।

জোরাল গুঞ্জন কানে আসছে। মুহূর্ত পরেই মোড়ের মাথায় দেখা গেল দুটো তীব্র আলোকরশ্মি।

ট্রাক,' বলল রবিন।

হেডলাইটের আকার দেখেই বোঝা গেল, অনেক বড় ট্রাক।

'হাইওয়ে না কিছু না,' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, 'এতবড় ট্রাক এখানে কি করছে?'

উঁচুনিচু পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল বিশাল গাড়িটা। একটা অয়েল ট্যাংকার। ধবধবে সাদা গায়ে বড় বড় হরফে লাল রঙে লেখা রয়েছেঃ হ্যারিমুর এন্টারপ্রাইজেস। ড্রাইভারকে ভালমত দেখা গেল না, তবে ছেলেদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বার দুই হর্ন বাজাল যেন রসিকতা করে।

'পিছিয়ে গিয়ে ঠিক পথ খুঁজে নেব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চলো না দেখি, মোড়ের ওপাশে কি আছে,' কিশোর বলল। ট্রাকটা যখন এসেছে, নিশ্চয় আছে কিছু।'

মোড় ঘুরতেই গাছপালার ভেতর দিয়ে দূরে আলো চোখে পড়ল। কাছে এসে দেখা গেল, বড়সড় এক কারখানা। কাঁটাতারের বেড়া। মস্ত বড় সাইনবোর্ডঃ হ্যারিমুর এন্টারপ্রাইজেস।

গেটের কাছে সাইকেল থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।

একজন সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে এল। 'কি চাই?' রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'পথ হারিয়েছি,' কিশোর বলল।

'ছুঁচো নাচছে পেটের ভেতর,' জানাল মুসা।

'কাছাকাছি কোন মোটেল আছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

শুকনো হেসে বলল লোকটা, 'হ্যাঁ, ভুল পথেই এসেছ।' মাথা নাড়ল হতাশ ভাবে। 'প্রায়ই ঘটে এখানে এরকম। যে-পথে এসেছ সে পথেই ফিরে যাও। খানিক দূর গিয়ে বাঁয়ে আরেকটা পথ...'

'দেখেছি,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, ওটা ধরে মাইল পাঁচেক গেলেই লুদারভিল, ওখানে মোটেল পাবে।'

'আজব জায়গায় কারখানা বসানো হয়েছে,' কিশোর মন্তব্য করল।

শ্রাগ করল লোকটা। 'মালিকের ইচ্ছে। পুরানো কারখানা ছিল ক্রেভিল্যাণ্ডে। ওখানে ভাল্লাগলো না মিস্টার হ্যারিমুরের। লোকে নাকি খালি জ্বালায়। তাই

নিরাপদে কাজ করার জন্যে বনের মধ্যে বসিয়েছেন এই আল্ট্রা-মডার্ন ফ্যাকটরি।'
'কিসের কারখানা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'ভূতের?'
'খেলনা,' হেসে বলল লোকটা। 'প্লাস্টিকের খেলনা।'
এই সময় পেছনে এসে থামল একটা ভারি ডেলিভারি ট্রাক, জোরে হর্ন বাজাল।
ঠেলে গেটের পাল্লা খুলে দিল গার্ড। ভেতরে ঢুকে গেল ট্রাক।
লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সাইকেলে চড়ল তিন গোয়েন্দা।
বুনোপথ ধরে অবশেষে পৌঁছাল লুদারভিলে। একটাই মোটেল। রাত অনেক হয়েছে, তবু খোলা রয়েছে, আলো দেখেই বোঝা গেল। স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে ম্যানেজারের অফিসে এসে ঢুকল ওরা।
শূন্য অফিস। কেউ আছে কিনা ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
উল্টো দিকের একটা দরজা খুলে ঢুকলো ছোটখাটো এক মহিলা, চুলে পাক ধরেছে। লালচে চুল এখন ধূসর। বিস্ময় চাপা দিতে পারল না। 'এত রাতে মেহমান!' মিষ্টি করে হাসল। 'আমি মিসেস ম্যারিটোবা। তোমরা?'
পরিচয় দিল কিশোর।
'এখানে তো দিনের বেলায়ই আসতে চায় না কেউ, আমার মোটেলই তুলে দেবো ভাবছি। বোর্ডার পাই না। তোমরা এত রাতে কোত্থেকে এলে?'
'লেক উলাগের অনেক নাম শুনেছি, বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু এসে যা দেখলাম...'
'আর বলো না।' ভয় ফুটল মহিলার চোখে। 'ওই ভূতুড়ে হ্রদটার জন্যে এই লুদারভিল শহরটাও শেষ।'
'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
চারপাশে তাকাল মহিলা, যেন ভয়ানক কিছু দেখতে পাবে। প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'এক ঘরে দুটো বড় বিছানা হলে চলবে তিনজনের? নাকি ঘর আরও বেশি লাগবে?'
মাথা নোয়াল কিশোর। 'একটা ঘর হলেই চলবে।'
দেয়ালে ঝোলানো চাবি খুলে নিয়ে ডাকল মহিলা, 'এসো।'
মহিলার পিছু পিছু এক লাইনে বেরিয়ে এল তিনজনে। সারি সারি ছোট কটেজ। বেশির ভাগ দরজার আঙটায়ই তালা লাগানো। নয় নম্বর লেখা ঘরটার সামনে এসে থামল মহিলা। দরজা খুলে বলল, 'সেরা ঘর। দেখো পছন্দ হয় কিনা।'
ঘর যে পেয়েছে এতেই খুশি তিন গোয়েন্দা। তবে বাড়িয়ে বলেনি মহিলা। ঘরটা সুন্দর, আসবাবপত্রও ভাল, সাজানো-গোছানো।
ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'লেকটার ব্যাপারে কি জানেন? ভূত আছে সত্যি?'
'খাবার তো নিশ্চয় লাগবে, না?' এবারও এড়িয়ে গেল মহিলা। 'ডাল পনির আছে, আর মুরগীর মাংসের পুর দেয়া হ্যামবারগার...'

'আহ্,' ঢোক গিলল মুসা। 'দেড় ডজন্ নিয়ে আসুন,' জিভে পানি এসে গেছে তার। 'বেশি থাকলে আরও বেশি।'

'আচ্ছা, হ্রদের ব্যাপারে কিছু বলতে আপত্তি আছে?' আবার বলল কিশোর।

দ্বিধা করছে মহিলা। বাইরের অন্ধকারের দিকে একবার চেয়ে মুখ ফেরাল। 'ইয়ে···বছর দুই আগে এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান এসেছে ওখানে,' বিষণ্ণ শোনাল কণ্ঠস্বর। 'নাম হাব শান্দিয়ান। এসেই সবাইকে বলে বেড়াতে শুরু করল, লেকের চারপাশে নাকি ডেলাওয়্যার ইনডিয়ানদের গোরস্থান। বিরক্ত করলে রেগে অভিশাপ দেবে ওদের প্রেতাত্মা, সবার সর্বনাশ করবে। গোরস্থানের ধারে একটা কুঁড়ে বানাল সে, রাতে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

'দেখেছি কুঁড়েটা,' বিছানায় বসে হাঁ করে কথা গিলছে মুসা।

'শুনে হেসেছিলাম,' বলে চলল মহিলা। 'কয়েকবার তাড়ানোও হয়েছে লোকটাকে, কিন্তু বার বার ফিরে এসেছে। একটা লোকের পেছনে কত আর লেগে থাকা যায়? সবারই তো কাজকর্ম আছে। তারপরই একদিন ভূত দেখা গেল।' আলোর কাছাকাছি সরে গেল মিসেস ম্যারিটোবা। 'হ্রদ আর আশপাশের গাছপালা সব মরতে শুরু করল। এককালের জমজমাট হ্রদ নির্জন হয়ে গেল। অপঘাতে মরতে কে আসবে? আমার ব্যবসাও লাটে উঠল, আরও অনেকেরই উঠেছে, চলেও গেছে তারা। কিন্তু আমার যাওয়ার জায়গা নেই।'

'সরকারী জায়গা না লেকটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ম্যাপে তো দেখলাম, ন্যাশনাল পার্ক।'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'সরকারী লোক এসে তদন্ত করে গেছে। ওরাও ভূত দেখেছে। অফিশিয়াল রিপোর্টে তো আর সেকথা লেখা যায় না, চাকরি চলে যাবে। বিপজ্জনক চিহ্ন আঁকা একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পথটা খোলা রেখেছে···'

'হুঁ। বিপদ হতে পারে জেনেও যার ইচ্ছে হয় আসবে।'

'হ্যাঁ,' বলল মহিলা। 'তা সকালেই চলে যাচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

'না।' মাথা নাড়ল কিশোর, 'কাল তো থাকবই, আরও দু'চারদিন থাকার ইচ্ছে আছে।'

পরদিন ভোরে আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের, রবিন আর মুসাকে ডেকে তুলল। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে চলল মিসেস ম্যারিটোবার অফিসে, জরুরী টেলিফোন করল একটা।

নাস্তার পর মুসা বলল, 'কি করব আর থেকে? ঘোরার তো কোন জায়গাই নেই।'

'কেন, লেকের পাড়?' কিশোর বলল।

'ওখানে কি কাজ?' বুঝতে পারছে মুসা, তবুও জিজ্ঞেস করল।

'এমন একটা রহস্যের সমাধান না করেই চলে যাব?'

খুব সরল যুক্তি গোয়েন্দাপ্রধানের, এরপর আর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না দুই সহকারীর। দীর্ঘ দিন থেকে চেনে ওরা কিশোরকে। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কোনভাবেই আর টলানো যাবে না তাকে। অযথা আর মুখ খরচ করল না ওরা।

ফিরে আসবে ওরা, মিসেস ম্যারিটোবাকে জানিয়ে মোটেল থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। সাইকেল নিয়ে ফিরে চলল লেক উলাগে।

'দিনের বেলায়ও একই রকম ভূতুড়ে লাগছে,' রিক্ত, পাতাশূন্য কালো গাছগুলোর দিকে চেয়ে বলল রবিন।

তার দিকে খেয়াল নেই কিশোরের। সামনের আকাশে সাদা এক টুকরো মেঘের দিকে নজর। অদ্ভুত মেঘ, ধোঁয়ার মত, উজ্জ্বলতাও সাধারণ মেঘের চেয়ে বেশি।

আগের রাতে যেখানে মালপত্রগুলো ফেলে গিয়েছিল, সেখানে পৌঁছল ছেলেরা। নেই। কিচ্ছু নেই। সব কে জানি তুলে নিয়ে গেছে।

'হায় হায়! গেল কই?' আশপাশে খুঁজছে মুসার চোখ। 'আমার নতুন কোলম্যান লাইটটাও নিয়ে গেছে। ভূতেরও ল্যাম্প দরকার হয়?'

'ভেব না,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'আমি জানি, কোথায় আছে ওগুলো। চলো, নিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'কোথায় যাবো? ভূতের বাসায়? ধরে খেয়ে ফেলবে যে,' রসিকতা করছে না মুসা।

'খেলে আগে তোমাকে খাবে,' হেসে বলল কিশোর। 'মোটা খাসিটাকেই তো লোকে আগে জবাই করে।'

অন্য সময় পাল্টা জবাব দিত মুসা, এখন কিছুই বলল না, গোমড়া করে রেখেছে মুখ।

কিশোরের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে রবিনের যাও বা কিছুটা আছে, মুসার একেবারেই নেই। তবু যেতে হলো। মৃত প্রকৃতি, অদ্ভুত কুঁড়ে, আকাশে সাদা উজ্জ্বল মেঘ। যতই এগোচ্ছে, কিশোরেরও অস্বস্তি লাগছে। এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। কেন এমন লাগছে?—অবাক হয়ে ভাবল সে।

দূর থেকে তো ভালই, কাছে এসে আরও অদ্ভুত লাগল কুঁড়েটা। পাথরগুলো বেঢপ আকৃতির, কাঠগুলোও যেন কেমন, বাঁকাত্যাড়া, নানারকম বিচিত্র দাগে ভরা। বিকৃত রুচির মানুষ ছাড়া থাকতে পারবে না এখানে।

'ওই যে, আমাদের মাল,' কুঁড়ের দরজা দেখাল কিশোর, দরজার ঠিক পাশেই পড়ে আছে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র।

ঠিক এই সময়, কুঁড়ে থেকে বেরোল বিশাল একজন মানুষ। গায়ে বিচিত্র ছাপের ফ্লানেলের ঢোলা শার্ট। প্যান্টটাও বেমানান। লম্বা কালো চুল ঘাড়ের কাছে ফিতে দিয়ে ঝুঁটি বেঁধেছে, মেয়েদের মত করে। বাঁকা ছুরির মত বিরাট এক নাক,

চোখা চেহারা, মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, গভীর রেখা। 'কি চাই?' মেঘ ডাকল যেন।

'আপনিই হাব শান্দিয়ান?' গলা স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হলো কিশোরের।

'কি চাই?' আগের চেয়েও গম্ভীর হলো লোকটার কণ্ঠ।

'ওই যে, আমাদের জিনিস। গতরাতে ফেলে গিয়েছিলাম।'

'কেন ফেলে গেছ?' খসখসে হলো মেঘ-গর্জন।

'ভূত দেখে ভয়ে পালিয়েছিলাম,' মুসা জবাব দিল। 'প্লীজ, আমাদের জিনিসগুলো দিয়ে দিন। নইলে বাবা বকবে।'

'এটা ইনডিয়ানদের এলাকা,' বলল শান্দিয়ান। 'সাদা মানুষের আসা মানা।'

'আমি তো সাদা নই, প্লীজ, দিন না...'

'শুনলাম, এটা ডেলাওয়্যার ইনডিয়ানদের গোরস্থান,' মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'কোন্ গোত্র?'

স্থির চোখে এক মুহূর্ত কিশোরকে দেখল শান্দিয়ান। 'ভাগো।'

'আমাদের জিনিস?'

'নিয়ে যাও।'

'মেঘটা এমন কেন, বলতে পারবেন?' সাদা মেঘের দিকে আঙুল তুলল কিশোর।

ওপর দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না শান্দিয়ান। 'ওটা ম্যানিটো, ইনডিয়ানদের মহাগুরু। মহাপ্রেত। এই এলাকা রক্ষার ভার তাঁর ওপর।'

'কোন্ গোত্রের গোরস্থান, বলেননি কিন্তু?' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'ক্রী ইনডিয়ান,' বলল লোকটা। 'ভাগো।'

কুঁড়ের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কোনমতে মালপত্রগুলো টেনে আনল ছেলেরা, যত তাড়াতাড়ি পারল। সাইকেলে বেঁধে নিয়ে সরে এল কুঁড়ের কাছ থেকে, বনে ঢুকল।

'কিশোর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, 'ওই লোকটাই ভূত খাটায়।'

'হতে পারে,' মুসাকে অবাক করে দিয়ে হাসল কিশোর। 'রবিন, মাটিতে পড়ে চেঁচানো শুরু করো তো। যেন পা ভেঙেছে। একবার তো ভেঙেছিল, জানো কেমন ব্যথা, চেঁচিয়েওছিলে। পারবে ভালই।'

হাঁ হয়ে গেল দুই সহকারী-গোয়েন্দা।

'কেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রবিন।

'চিৎকার শুনলে শান্দিয়ান ছুটে আসবে,' বলল কিশোর। 'এই সুযোগে গিয়ে কুঁড়ের ভেতরটা দেখে আসব।'

'কি আছে দেখার?' প্রশ্ন করল মুসা।

'কি আছে, জানি না। তবে কিছু নিশ্চয় আছে। নাও, শুরু করো। পাঁচ-দশ মিনিট ওকে এখানে আটকে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। শুরু,' বলেই গাছপালার আড়ালে চলে গেল সে।

এমন আর্ত-চিৎকার করল রবিন, কিশোরই চমকে উঠল। সত্যই যেন হাড্ডি

কয়েক টুকরো হয়ে গেছে নথির। মুচকি হেসে গাছের আড়ালে আড়ালে কুঁড়ের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

কুঁড়ের দরজায় দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে শান্দিয়ান। দ্বিধা করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পায়ে পায়ে এগোল চিৎকার যেদিকে শোনা যাচ্ছে, সেদিকে।

দরজা খোলা। দৌড় দিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর।

বাইরে যেমন হতশ্রী চেহারা ঘরটার, ভেতরে আরও বেশি। ছোট টেবিলে একটা লণ্ঠন, মাটিতে পড়ে আছে পুরানো মলিন একটা স্লীপিং ব্যাগ। লণ্ঠনটার পাশে ব্যাংকের একটা পাস বই। বইটা খুলল কিশোর। হাব শান্দিয়ানের নামে পঁচিশ হাজার ডলার জমা আছে।

বইটা রেখে দিয়ে কোণের দিকে এগোল সে। ছোট একটা ফাইলিং কেবিনেটের মত জিনিস, কাঠের তৈরি, কাঁচা হাতে বানানো হয়েছে। একটা ড্রয়ার টান দিল।

ওপরের ড্রয়ারটা টিনে ভর্তি খাবারে বোঝাই। মাঝেরটায় কাপড়-চোপড়, বেশির ভাগই ফ্লানেলের শার্ট আর রঙচটা জিনসের প্যান্ট। নিচেরটায় রয়েছে শ'খানেক প্লাসটিকের ট্র্যাশব্যাগ, আর অনেকগুলো মোমবাতি। প্রতিটি ব্যাগের গায়ে লাল রঙে লেখা রয়েছে বড় হাতের এইচ. ই.।

রবিনের চিৎকার থেমে গেল।

শান্দিয়ানদের বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'কিভাবে যাবে, আমি কি জানি? যাও, ভাগো। আরেকটা গেল কোথায়?'

একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল কিশোর। বাইরে কাশির শব্দ হতে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা রেখে দিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করল। উঁকি দিয়ে দেখল, শান্দিয়ানকে দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে বেরোতে গেলে এখন চোখে পড়ে যাবে।

আর কোন পথ আছে বেরোনোর? পাগলের মত এদিক-ওদিক খুঁজল। ওই দানবটার হাতে 'চোর হিসেবে' ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছে।

ছোট একটা জানালা কাটা আছে একপাশের দেয়ালে। কিন্তু পাল্লা এমনভাবে বন্ধ, ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। গিয়ে ঠেলা মারল পাল্লায়। নড়ে উঠল কাঠ, আরও জোরে ঠেলতেই ওপর দিকে উঠে গেল। মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর।

সে-ও বেরিয়ে পাল্লা নামাল, শান্দিয়ানও উঠল দরজায়।

জানালার বাইরেই একটা গিরিখাত। ওটাতে নেমে দৌড় দিল কিশোর। যাক, নিরাপদেই অবশেষে এসে বনে ঢুকল। অনেক দূর ঘুরে এসে মিলিত হলো বন্ধুদের সঙ্গে।

'এসেছ,' হাঁপ ছাড়ল রবিন। 'আমরা তো ভাবছিলাম ধরে ফেলেছে। এত দেরি করলে।'

'আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারলে না?'

'কি করে?' দু'হাত নাড়ল মুসা। 'আরেকটু চাপাচাপি করলেই সন্দেহ করে বসত। তিনজনেরই ঘাড় মটকাত তখন। তা কি দেখলে?'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর।

'মানে?'

'খুব সাধারণ জিনিস। তবে ব্যাংকে অনেক টাকা আছে শান্দিয়ানের।'

সব শুনে রবিন মাথা দোলাল, 'সন্দেহজনক।'

'নট নেসেসারিলি,' কিশোর বলল। 'অনেক ইনডিয়ানই এর চেয়ে অনেক বেশি টাকার মালিক। কেউ কেউ তো কোটিপতি। টাকাটা ব্যাপার না। আমার অবাক লাগছে, এত ব্যাগ আর মোম দিয়ে লোকটা কি করে?'

'এ-তো সহজ ব্যাপার,' মুসা বলল। 'ট্র্যাশব্যাগে ময়লা ভরে জ্বালিয়ে দেয়। সে-জন্যেই তো ব্যাগগুলো তৈরি হয়, নাকি? জঞ্জাল নষ্ট করার জন্যে।'

'কিন্তু এই জঙ্গলের মাঝে ময়লা ফেলার জায়গার অভাব?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কি জানি কেন রেখেছে,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'জাহান্নামে যাক। মরুকগে ব্যাটা। চলো, মোটেলে যাই। খিদে পেয়েছে।'

চলতে চলতে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'এই, শোনো। এইচ. ই.। গতরাতে ট্রাকের গায়েও লেখা দেখেছি।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'ট্র্যাশব্যাগগুলো তৈরি হয়েছে হ্যারিমুরের কারখানায়!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর।

'তাতেই বা কি?'

জবাব না দিয়ে সাইকেল ঘোরাল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'চলো, কারখানায়।' প্যাডাল ঘোরাতে শুরু করল কিশোর। 'দিনের আলোয় একবার দেখে আসি।'

কারখানার গেট থেকে ফুট বিশেক দূরে সাইকেল থামাল তিনজনে। এগিয়ে এল গার্ড। রাতের লোকটা নয়, অন্য লোক, ডিউটি বদল হয়েছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ছেলেদের দিকে।

মাথার ওপরের সাদা মেঘ অনেক ছড়িয়ে পড়েছে, সেদিকে ইশারা করে নিচু গলায় সঙ্গীদের বলল কিশোর, 'ওটা মেঘ নয়। শান্দিয়ান বলেছে মহাপ্রেত। ঘোড়ার ডিম। ওই যে, উদ্ভট চেহারার ওই বিল্ডিংটার কাণ্ড।'

বিল্ডিংটা উদ্ভটই। মস্ত ফোলা এক বেলুনের মাঝে চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন একটা লম্বা চোঙ।

'ওটার সঙ্গে মেঘের কি সম্পর্ক?' প্রশ্ন করল মুসা।

'এখনও জানি না,' বলল কিশোর। 'তবে ধোঁয়া যে ওটা থেকে বেরিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মরা হ্রদ আর বনের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক আছে এসবের।...চলো, যাই।'

মোটেলে ফিরে এল ওরা।

অফিস থেকেই হাত নেড়ে ডাকল মিসেস ম্যারিটোবা, 'রবিন, তোমার বাবা ফোন করেছিল।'

অবাক হলো রবিন। 'বাবা! কেন?'
অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। একই সঙ্গে ফোনের দিকে এগোল রবিন আর কিশোর।
'তোমাকে চায়নি,' রবিনকে বলল মিসেস ম্যারিটোবা। 'কিশোরকে চেয়েছে।'
আরও অবাক হলো রবিন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে।
হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। 'সকালে আংকেলকেই ফোন করেছিলাম। কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।'
'কয়েকটা ব্যাপার!'
জবাব না দিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করল কিশোর। মিস্টার মিলফোর্ড ধরলেন বাড়ি থেকে। নীরবে শুনল কিছুক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর ডেলাওয়্যার ইনডিয়ানদের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করল। জানল, ওই জাতের ইনডিয়ান, বিশেষ করে ক্রী ইনডিয়ানরা যাযাবর, শিকারী জাত, আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে আর ক্যানাডার দক্ষিণে বাস।
'লুদারভিলে, এত দূরেও আসে ওরা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'অসম্ভব নয়,' জবাব দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কখনও এখানে যায়, কখনও ওখানে। কোন কোন সময় চব্বিশ ঘণ্টায় কয়েকবার জায়গা বদল করে।'
'ঠিক একথাটাই জানতে চেয়েছিলাম,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'আংকেল এইচ. ই. সম্পর্কে আর কি জেনেছেন?'
'এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেনসিতে খোঁজ নিয়েছিলাম। শহর এলাকা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে হ্যারিমুরকে, তার ফ্যাকটরি সরিয়ে দেয়া হয়েছে পরিবেশ দূষণের অপরাধে।'
'পরিবেশ দূষণ?'
'হ্যাঁ। প্লাসটিকের কিছু কিছু জিনিস তৈরির পর যে আবর্জনা জমে, ওগুলো স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। শহরের মাঝখানে এ-রকম একটা কারখানা, তার ওপর ওসব আবর্জনা নিয়ে গিয়ে শহরের ধারের নদীতে ফেলা হচ্ছিল, কাজটা হ্যারিমুর করছিল বেআইনীভাবে। তারপর ধরা পড়ল। অনেক রকমে ঠেকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শহর থেকে কারখানা সরাতেই হলো তাকে,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে দম নিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'বাধ্য হয়ে লুদারভিলের কাছে বনের ভেতরে বড় একটা জায়গা কিনতে হলো তাকে, কারখানা বসাল। ইপিএ গিয়ে দেখেশুনে ছাড়পত্র দিয়ে এল কারখানা চালানোর। তবে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এল, আবর্জনা নিয়ে ফেলতে হবে অনেক দূরে কোথাও, যেখানে মানুষ থাকে না। এখন নাকি ভালই চালাচ্ছে হ্যারিমুর, বেআইনী কিছু করছে না।'
ছেলেদের কুশল জিজ্ঞেস করে, সাবধানে থাকতে বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি।
'বেআইনী কিছু করছে না?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'তাহলে কারখানা বসানোর পর থেকেই আজব ঘটনাগুলো ঘটছে কেন? কেন মরতে শুরু করল বন, হ্রদ…'

'এই কিশোর, বিড়বিড় করে কি বলছ?' বলল মুসা।

'অ্যাঁ? না, কিছু না,' ফোনের কাছ থেকে সরে এল। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। চলো, ঘরে চলো, খুলে বলছি।'

চাঁদ নেই, অন্ধকার রাত। বনের ভেতরে গাছের গায়ে সাইকেল ঠেশ দিয়ে রাখল তিন গোয়েন্দা।

'এবার অপেক্ষার পালা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'আসছে,' মিনিট দশেক পর বলল রবিন।

পথের মোড়ে হেডলাইট দেখা গেল, ট্রাক। ওদের সামনে দিয়ে হ্রদের দিকে চলে গেল গাড়িটা। সাদা রঙ, গায়ে লাল হরফে বড় বড় করে এইচ. ই. লেখা রয়েছে।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'চলো,' বলে পা বাড়াল কিশোর।

পথ খুব খারাপ, ধীরে ধীরে চলছে ট্রাক। বনের আড়ালে আড়ালে ওটাকে অনুসরণ করে চলল তিন গোয়েন্দা।

শান্দিয়ানের কুঁড়ের কাছে এসে কিশোর বলল, 'তোমরা যাও। যা বলেছি, ঠিক ঠিক মত করবে। শান্দিয়ান নেই এখন কুঁড়েতে।'

কুঁড়ের দিকে চলে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিশোর চলল ট্রাকের পেছনে।

হ্রদের কিনারে থামল ট্রাক। ঘুরিয়ে পেছন করা হলো পানির দিকে, একেবারে পানির কিনারে পিছিয়ে গেল। হেডলাইট জ্বালানোই রইল। সাদা বিশেষ পোশাক পরা একটা লোক নামল ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে। ড্রাইভারের সীট থেকে নামল শান্দিয়ান। তার পরনেও সাদা বিশেষ পোশাক। ট্রাকের গায়ের একটা বিশেষ চাকা ঘোরাল। খুলে গেল পেছনের একটা ভালব, হুড়মুড় করে পানি বেরিয়ে এল পাইপের মুখ থেকে। মিশে যাচ্ছে হ্রদের পানিতে।

এগিয়ে গেল কিশোর।

'এই ছেলে, এখানে কি?' ধমকে উঠল শান্দিয়ান, চিনতে পেরেছে।

'আপনারা কি করছেন এখানে?' উল্টো প্রশ্ন করল কিশোর।

'দেখছ না? পানি ফেলছি।'

'তা-তো দেখছিই। তা এতদূরে পানি ফেলতে আসার কি দরকার পড়ল? রেডিওঅ্যাকটিভ বলে?'

'কী?' চমকে উঠল সাদা লোকটা।

'ভাগো!' কিশোরের কাঁধ চেপে ধরে ঝটকা দিয়ে ঘুরিয়ে দিল শান্দিয়ান।

দুই কদম সরে এসে ঘুরল আবার কিশোর। 'কি করছেন, জানি আমি। মিস্টার শান্দিয়ান, ডেলাওয়্যার ইনডিয়ানদের কি কোন স্থায়ী গোরস্থান আছে? থাকা সম্ভব? অনেক সময় চব্বিশ ঘণ্টায় কয়েকবার জায়গা বদলায় ওরা, যে যেখানে মারা যায়, সেখানেই কবর দেয়। তাহলে গোরস্থান থাকে কি করে? ইপিএ-র

সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। আপনাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই, তবে আমার আছে। সকালে যে সাদা মেঘ দেখেছিলাম, সেটা মেঘ নয়, আণবিক চুলার ধোঁয়া। কারখানার ওই যে একটা অদ্ভুত বিল্ডিং আছে, ওটা থেকে বেরোয়।'

'তাতে কি?' দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল শান্দিয়ান।

'কি আর। ছোট্ট একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর বসিয়ে নিয়েছেন মিস্টার হ্যারিমুর। প্রোডাকশন অনেক বেশি বাড়ানোর জন্যে। শহর থেকে সরে আসতে খরচ হয়েছিল, সেটা উশুল করার জন্যে বুঝি?' হাসল কিশোর। 'ঘুষখোর কর্মচারী তো সব দেশে সব জায়গায়ই আছে। তাই ইপিএ-র কাছ থেকে ছাড়পত্র পেতে কোন অসুবিধে হয়নি হ্যারিমুরের। হুঁহ্! চমৎকার বুদ্ধি! রিঅ্যাকটর আর কেমিক্যালের সাহায্যে মারাত্মক রেডিওঅ্যাকটিভ আবর্জনাগুলোকে পানি করে, ঢেলে ফেলা হয় হ্রদের পানিতে। কে ধরতে পারবে?'

'দেখো ছেলে,' গর্জন করল শান্দিয়ান, 'বড় বেশি বাজে বকছ। যাও, নইলে পস্তাবে।'

'এই, দেখো দেখো,' ওপর দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল সাদা পোশাক পরা দ্বিতীয় লোকটা।

গাছের মাথায় ভূতুড়ে গোলক উড়ছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য।

'কি, হচ্ছে কি?' চেঁচাল শান্দিয়ান।

'ভূত,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'আপনি সবই তো জানেন।' বনের দিকে ফিরে ডাকল কিশোর, 'আসুন আপনারা।'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নীল স্যুট পরা দু'জন পুলিশ অফিসার। হাতে রিভলভার। 'খবরদার নড়বে না,' বলল একজন। 'তোমরা আণ্ডার অ্যারেস্ট। বর্জ্য পদার্থ ফেলে বন আর হ্রদ নষ্ট করার অপরাধে।'

'আমি কিছু জানি না,' দু'হাত তুলে প্রায় নেচে উঠল শান্দিয়ান, গলার জোর কমে গেছে।

'খুব ভালই জানেন,' বলল কিশোর। রবিন আর মুসা বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, দু'জনের হাতেই ট্র্যাশব্যাগ আর মোমবাতি। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে আবার শান্দিয়ানের দিকে ফিরল কিশোর। 'ওই জিনিসগুলো আপনার ঘরে পাওয়া গেছে। ভূতুড়ে গোলক উড়িয়ে লোককে ভয় দেখাতেন আপনি। যাতে এদিকে কেউ না আসে, আর নিরাপদে আবর্জনা ফেলতে পারেন লেকে।'

'কি বকছ!' প্রতিবাদ করল ইনডিয়ান।

'বকছি না?' মুসার দিকে হাত বাড়াল কিশোর। একটা ট্র্যাশব্যাগ আর একটা মোমবাতি নিয়ে বাতিটা ধরাল। ফুঁ দিয়ে ব্যাগটা ফুলিয়ে মুখের কাছে খাড়া করে বেঁধে দিল জ্বলন্ত মোমবাতিটা, শিখার কাছ থেকে মোমের দুই-তৃতীয়াংশ ঢুকে রয়েছে ব্যাগের ভেতরে। কিছুক্ষণ সময় দিয়ে হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিল সে। গ্যাস বেলুনের মত আকাশে উড়াল দিল ব্যাগ, মোমের আলোয় উজ্জ্বল। 'এবার কি বলবেন?'

আর কি বলার থাকতে পারে? তবু প্রতিবাদ করল শান্দিয়ান। 'আমি কেন

একাজ করতে যাব?'

'টাকার জন্যে। আপনার টেবিলে একটা চেকবইয়ে পঁচিশ হাজার ডলার জমা দেখেছি। হ্যারিমুর দিয়েছে, না?'

'আমি কোথায় টাকা পেয়েছি, সেটা আমার ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, আদালতে গিয়ে বলো সেকথা,' হাতকড়া পরিয়ে দিল একজন পুলিশ অফিসার।

অন্য লোকটার হাতেও পরানো হলো হাতকড়া।

ওয়্যারলেসে পুলিশ স্টেশনে খবর পাঠাল একজন অফিসার। ছেলেদের দিকে ফিরে হাসল, 'থ্যাংকিউ, বয়েজ। তোমরা মোটেলে যাও। আমরা আছি। হেলিকপ্টার আসছে।'

ভূতের খেলা

এক

'ইস্, কি জ্যাম যে লাগল!' প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকা গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে কোনমতে সাইকেল চালাতে চালাতে বলল কিশোর পাশা।

'জিন্দেগিতে দেখিনি এমন,' বলল মুসা আমান। 'গোলমালটা কিসের?'

'শপিং মল-এ কাস্টোমার বেশি বোধহয় আজকে,' আন্দাজ করল রবিন মিলফোর্ড।

আর চালানো সম্ভব নয়। সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা। মাথা নেড়ে কিশোর বলল রবিনের কথার জবাবে, 'মনে হয় না। মেয়ারস মলে তো কয়েক মাস ধরেই ব্যবসা খারাপ। নতুন শহরের নতুন মার্কেট, মুভি থিয়েটার আর পার্কটা মেরে দিয়েছে মলকে। সব লোক এখন ওখানে বাজার করতে চলে যায়।'

কাছেই একজন পুলিশকে গাড়ির জট ছাড়াতে হিমশিম খেতে দেখা গেল। এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'কি হয়েছে?'

কিশোরকে চেনে লোকটা। হাসল। 'ও, গোয়েন্দা, চলে এসেছ। ভূত দেখছে লোকে।'

'ভূউত!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা।

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। 'ইদানীং আজব আজব কাণ্ড ঘটছে মলে।'

এই সময় গাড়ির জট খুলে সামনে ফাঁকা হয়ে গেল অনেকখানি। অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সাইকেলে চড়ল তিন গোয়েন্দা।

'এই কিশোর,' ভূতের কথা শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি, ভূতের খবরটা আরও ভালমত শুনি,' রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে কিশোর পাশা, আর কি তাকে ঠেকানো যায়?

তর্ক করল না মুসা। জানে, করে লাভ নেই।

মলের আলো ঝলমলে পার্কিং লটে ঢুকে সাইকেলগুলো স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল ওরা।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রবিন বলল, 'নতুন রঙ করেছে। মেরামতও করেছে। আলোর বহর দেখেছ, আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে!'

'দোকানের মালপত্রও তো মেলা,' বলল মুসা। 'আবার চাঙা হয়ে উঠেছে মনে হয় মল।'

বেশ ভিড়। 'চিক বটিক' নামে একটা দোকানের দিকে এগোল কিশোর। ওখান থেকেই বেশির ভাগ পোশাক কেনেন মেরিচাচী, দোকানদার ওদের পরিচিত।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু হলো। ছাতের দিকে দেখাচ্ছে কয়েকজন।

পঞ্চাশ ফুট ওপরে একটা বড় বলের মত জিনিস ভেসে যাচ্ছে, রূপ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। রঙ হলদে সবুজ, উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে।

ওপরতলার দিকে চলেছে একটা চলমান সিঁড়ি, সিঁড়ির দু'ধারে চওড়া রেলিঙে সাজানো রয়েছে নানারকম ফুলগাছের টব। শাঁ করে নেমে এল ভূতটা, ফুল গাছে ধাক্কা মারল। রসিকতা করে যেন ফুল ছিটাল দর্শকদের ওপর।

ভয় পাওয়ার বদলে জোরে হেসে উঠল লোকে। এমনকি ভূতের ভয়ে সদা-কাবু মুসা আমানও হাসছে। 'খাইছে!' বলল সে। 'কাণ্ডটা কি করছে!'

সিঁড়িতে উঠে দৌড়ে গেল একজন সিকিউরিটি গার্ড, ভূতের দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার দিকে তেড়ে এল ভূতটা। ফেলে দিল লোকটার মাথার হ্যাট। মজা পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল জনতা।

আর কি এগোয় গার্ড। ফিরেই ঝেড়ে দৌড় লাগাল। ভূতটাও পিছু নিল তার। তাড়া করে নিয়ে গেল নিচে মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে, লোকটাকে পানিতে ফেলে তারপর ছাড়ল।

মজার ভূত। হাসিয়ে মারছে জনতাকে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে ভাসল কিছুক্ষণ, রূপ বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। হঠাৎ লাল হয়ে গেল ওটা, দ্রুত উঠে গেল ছাতের দিকে। একটা মুহূর্ত যেন ঝুলে রইল ছাতের কাছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে লোকেরা। হাতে গোনা কয়েকজন বেরিয়ে গেল ভূত চলে যাওয়ার পর। অন্যেরা রইল, কেনাকাটা করতে এগোল দোকানের দিকে।

'হুঁম্!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এখন বুঝলাম আচমকা জ্যান্ত হয়ে উঠল কিভাবে মল।'

'হ্যাঁ,' তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন, 'ভূতটাই আকর্ষণ বাড়িয়েছে।'

'কিশোর,' চোখ বড় বড় হয়ে আছে এখনও মুসার, 'তোমার কি মনে হয়? ভূতটা আসল?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভূত বলে কিছু নেই। বহুবার বলেছি।'

ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। হাঁটা এখন সহজ। পোশাকের দোকানটায় ঢুকল তিন গোয়েন্দা। দোকানের মালিক বৃদ্ধ মিস্টার ডোভার আর তাঁর নাতনী এলিনা ব্যস্ত। খদ্দের আছে দোকানে। কিশোরের দিকে চোখ পড়ায় হাসলেন ডোভার। 'আরে কিশোর। এসো এসো। মিসেস পাশা পাঠিয়েছেন বুঝি?'

'আরিই, আমাদের গোয়েন্দা সাহেবরা যে!' চেঁচিয়ে বলল এলিনা, একই সঙ্গে হাত নাড়ল। এক স্কুলেই পড়ে ওরা। 'আসছি, এক মিনিট।'

হাতের কাজটা সেরে এগিয়ে এল এলিনা।

'ব্যবসা আজকাল বেশ ভালই মনে হচ্ছে তোমাদের,' কিশোর বলল। 'আগের বার এসে তো শুধু মাছি মারতে দেখেছি।'

'গাইস্টের কারণে,' বলে উঠলেন ডোভার। মুখে মৃদু হাসি।

'গাইস্ট?' বুঝতে পারল না মুসা।

'জার্মান শব্দ,' বুঝিয়ে দিল এলিনা। 'আমার দাদী জার্মান ছিল জানোই তো। দাদুকে ভালমতই রপ্ত করিয়েছে ভাষাটা। তা আছ কেমন? ছুটির মধ্যে একবার এলেও তো পারতে আমাদের বাড়িতে।'

'মা'র জ্বালায় বেরোনোর উপায় আছে নাকি,' নাকমুখ কুঁচকে বলল মুসা। 'খালি কাজ দিয়ে রাখে।'

'তাতে কি? খাবারের পরিমাণও তো বাড়িয়ে দিয়েছেন আন্টি। ভালই হয়েছে তোমার,' হেসে বলল কিশোর। 'তো, এলিনা, এই গাইস্টের ব্যাপারে একটু খুলে বলো তো।'

খরিদ্দার বিদায় করে এগিয়ে এলেন মিস্টার ডোভার। 'আমি বলছি। দু'মাস আগে শুরু হয়েছে। কেন, শোনোনি কিছু?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ছিলাম না। বেড়াতে গিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ডে।'

'ও। টিভিতেও তো দেখিয়েছে। মলের শেষ মাথায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের ওপরে উড়ছিল সেদিন গাইস্টটা। মুভি ক্যামেরা ছিল একজনের কাছে, ছবি তুলতে আরম্ভ করে। যা কাণ্ড করল না ভূতটা! হাহ্ হাহ্!'

'সতিই খুব মজা করেছে,' হেসে বলল এলিনা।

'সেই রাতেই খবরটা ছবিসহ দেখিয়েছে টিভিতে,' ডোভার বললেন। 'ব্যস, তার পরদিন থেকেই মেয়ারস মল আবার সরগরম। হারমিকে দেখতে দলে দলে চলে এল লোকে…'

'হারমি আবার কি জিনিস?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'ভূতটার নাম রেখেছে দাদা,' এলিনা জানাল। 'জার্মান নাম।'

'কেন, হারমি কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

অস্বস্তি ফুটল ছোট্ট মানুষটির চোখে। 'না না, কিছু ভেবে রাখিনি। এমনি।'

'ভূতটা কি রোজই আসে?'

'না,' জবাবটা দিল এলিনা। 'মাঝে মাঝে আসে। কখন আসবে জানা নেই। ফলে সারাক্ষণই ভিড় করে থাকে লোকে…'

'হ্যাঁ, এমন ভিড় আমার দোকানে আর দেখিনি। তবে শো যখন দেখাতাম,

এরচে বেশি ভিড় হত।'

'শো-ও দেখাতেন নাকি আপনি?'

'হ্যাঁ, বলিনি বুঝি কখনও? দেখাতাম, অনেকদিন আগে।'

'কি কি দেখাতেন?' আগ্রহী হয়ে উঠল মুসা।

'এই, ভেরাইটি শো। নাচ, গান, কমিক। মিউজিক হলেও কাজ করেছি। এসব শো'র আরেকটা নাম আছে...কি যেন বলে? হ্যাঁ, ভডাভিল।'

এলিনার চোখেও অস্বস্তি দেখতে পেল কিশোর। হঠাৎ করেই কেমন যেন বদলে গেছে পরিবেশ, টান টান হয়ে উঠেছে উত্তেজনা।

অস্বস্তিকর পরিবেশ সহজ করার জন্যেই আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল কিশোর, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, মলের ব্যবসা আবার জমিয়ে দিয়েছে ভূতটা।'

'খুউব,' এলিনা বলল। 'এতই ভাল, আরেকটা দোকান নেয়ার কথা ভাবছি আমরা।'

'তাই নাকি!' রবিন বলল। 'ভাল।'

'তা তোমরা কি কিনবে, বললে না তো?' ডোভার বললেন। 'দাঁড়াও, ভাল গেঞ্জি এসেছে। দেখাচ্ছি। পছন্দ হবে তোমাদের। মুসার সাইজ দেখছি বেড়ে গেছে,' হেসে বললেন তিনি। 'আগের সাইজে আর চলবে না মনে হয়। খাওয়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছ নাকি?'

হাসল শুধু মুসা। জবাব দিল না।

গেঞ্জিগুলো পছন্দ হলো ওদের। কিনতে এসেছিল শার্ট। তার বদলে তিনজনে তিনটে গেঞ্জি কিনে নিয়ে এলিনা আর ডোভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। মিনিট কয়েক পরে মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামটার পাশ কাটানোর সময় দেখল, সেই গার্ডটা দাঁড়িয়ে আছে। হাসি হাসি মুখ। ভূতটা যে তাকে এরকম অপদস্ত করল তাতে যেন কিছুই মনে করেনি। ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে এসেছে।

'আশ্চর্য!' বলল কিশোর। 'এই ভূতের ব্যাপারটা সত্যি অবাক করেছে আমাকে।'

'সত্যি,' মুসা বলল। 'এরকম রসিক ভূত আর দেখিনি।'

'হারমি আর নিজের অতীতের কথা বলতে গিয়ে মিস্টার ডোভার কি-রকম অদ্ভুত আচরণ করলেন লক্ষ করেছ?... হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, চিক বটিকে ঢোকার সময় একটা লোককে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, বেরোনোর সময়ও দেখেছি একই জায়গায়। এখনও আছে। বোধহয় চোখ রাখছে দোকানটার ওপর।'

ঝট করে ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা। কাঁচের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক, নোংরা, গোসল করে না ক'দিন কে জানে। ওদেরকে ফিরে তাকাতে দেখে চমকাল মনে হলো। তাড়াতাড়ি সরে গেল ওখান থেকে।

দুই

সেদিন রাতে নিজের ঘরে বসে ভূতের ওপর লেখা নানারকম প্রতিবেদন পড়ছে কিশোর। কত রকমের ভূত আছে, কি কি আচরণ করে ওগুলো, এসব কথা এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা হয়েছে, পড়ে মনে হয় লেখক ভূত বিশ্বাস করেন। কিছু ভূত আছে, খুব গোলমাল করে, ওগুলোর নাম পোলটারগাইস্ট। জার্মান গাইস্ট শব্দটা থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

নিচে থেকে ডাকলেন মেরিচাচী, 'কিশোর, খেতে আয়। খাবার দিয়েছি। তোর চাচা বসে আছে।'

'বাহ্, কিশোর,' মস্ত গোঁফে তা দেয়া থামিয়ে ভাতিজার দিকে তাকিয়ে বললেন রাশেদ পাশা, 'গেঞ্জিটা খুব সুন্দর তো। কোত্থেকে কিনলি?'

'মেয়ারস মল থেকে। তোমার জন্যে কাল নিয়ে আসব নাকি এরকম একটা?' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল কিশোর।

'নাআহ্। আমি বুড়ো মানুষ, সারাক্ষণ ইয়ার্ডের জঞ্জাল ঘাঁটি, আমার এই খাকি কোর্তায়ই চলবে।'

নীরবে খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।

'কি রে কিশোর, এত কি ভাবছিস?' মেরিচাচী বললেন। 'অমন চুপ করে আছিস যে? কোন কেস-টেস পেলি নাকি আবার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। কি বোঝাল, 'হ্যাঁ' বা 'না', কিছুই বোঝা গেল না। 'আচ্ছা, চাচা, কোন লোক অপঘাতে মারা গেলে তার আত্মা-ই তো ভূত হয় বলে লোকের বিশ্বাস। যে জায়গায় সে মারা যায় সেখানেই উৎপাত করে বেশি। তাই না?'

হাসলেন চাচা। 'হঠাৎ ভূতে ধরল কেন তোকে?'

'চাচা, তুমি তো অনেকদিন আগে এসেছ এখানে। এখন যেখানে মেয়ারস মল রয়েছে, সেখানে আগে কি ছিল?'

'কিছুই না। মানে, বাড়ি-টাড়ি কিছু না।'

'খোলা?'

'হ্যাঁ। ভেড়ার খোঁয়াড় ছিল কিছুদিন। তারপর এসে আস্তানা নিল একটা ছোট কার্নিভল পার্টি। খুব বেশি খেলা দেখাত না ওরা, তবে ভাল লাগত। কতদিন গিয়ে বসে থেকেছি ওখানে! ওরা চলে যাওয়ার পর খুব খারাপ লেগেছে। তারপরই মলটা গড়ে উঠল।'

'মলের ভূতটার কথা তো শুনেছ। কি মনে হয় তোমার?'

'হয়তো কোন মরা ভেড়ার ভূত,' রসিকতা করলেন চাচা।

'হয়তো!' আনমনে বলল কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আবার।

খাওয়া শেষ করেই এসে ফোনের কাছে বসল সে। এলিনা ডোভারকে ফোন করল। ওপাশ থেকে সাড়া এলে বলল, 'এলিনা, তোমার দাদা আছেন?'

'না। কেন?'
'তোমার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই। আসব?'
'সেকথা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? কিশোর পাশার সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে তো বর্তে যাব। চলে এসো। দাদার ফিরতে দেরি হবে। দোকান থেকে আজকাল অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে।'
ট্যাক্সি নিল কিশোর। দশ মিনিট পরই এসে বসল এলিনাদের লিভিংরুমের সোফায়।
'আমার সঙ্গে খামোকা খোশগল্প করতে তুমি আসনি,' এলিনা বলল, 'খুব ভাল করেই জানি আমি। কি বলবে বলে ফেল। ভূতটার কথা জিজ্ঞেস করবে তো?'
'হ্যাঁ,' সারা ঘরে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। 'নতুন অনেক জিনিস কিনেছ। আগেরবার এসব দেখিনি।'
'সব হারমির দৌলতে।' আরেক দিকে চোখ ফেরাল এলিনা। 'ফকিরই তো হয়ে গিয়েছিলাম। ইস্কুলের খরচ জোগানোই দায় হয়ে গিয়েছিল।'
'আচ্ছা, তোমার বাবা-মা তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন, না?'
মাথা ঝাঁকাল এলিনা। 'হ্যাঁ। কেন, তুমি জানো না?'
'না, কি করে জানব? জিজ্ঞেস তো করিনি কোনদিন।'
'অ, আমি ভেবেছি তুমি জানো। বলেছিলাম তো একদিন।'
'না, বলোনি। বললে মনে থাকত। আমি শুধু জানি তোমার বাবা-মা নেই। দাদীও তোমার দাদাকে ছেড়ে চলে গেছেন।'
'হ্যাঁ, খুব ছোটবেলায় মারা গেছে আমার আব্বা-আম্মা। চেহারাও মনে নেই আমার।'
'আমার মতই অবস্থা,' বিষণ্ন হয়ে গেল কিশোর। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না। শো ব্যবসার কথা আলোচনা করার সময় তোমার দাদার চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, লক্ষ করেছিলে ব্যাপারটা?'
'করেছি।'
'কি কি জানো তুমি?'
'দাদার অতীত সম্পর্কে খুব একটা জানি না আমি। বলতে চায় না। তবে যা গলা, ভেরাইটি শো-তে গান নিশ্চয় গাইত না,' হাসল এলিনা।
কিশোরও হাসল। 'ডায়েরী-টায়রি রাখেন নাকি?'
'ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও রাখে, কখনও রাখে না।'
'ওই সময়কার ডায়েরী আছে?'
'কি জানি। থাকতে পারে। চিলেকোঠায় দুটো ট্রাংক আছে, অনেক পুরানো। আমার সামনে কক্ষনো খোলে না। ভেতরে কি আছে জানি না। দেখতে চাও?'
'তোমার দাদা আবার কিছু মনে করবেন না তো?'
'খুলতে নিষেধ করেনি তো কখনও।'
'চল তাহলে?'
বন্ধ ঘরটায় ঢুকে প্রথমেই বাতিটার দিকে তাকাল কিশোর। 'আলো জ্বলছে

কেন? তোমার দাদা ঢুকেছিলেন...'

'আমিও তো সেকথাই ভাবছি!' বিস্ময় ফুটেছে এলিনার চোখে। 'কে জ্বালল? ওই সিঁড়ি বেয়ে এখানে ওঠার ক্ষমতা এখন আর নেই দাদার।'

'তাহলে অন্য কেউ ঢুকেছিল। আলো নিভিয়ে যেতে ভুলে গেছে।'

'কিশোওর!' চিৎকার করে উঠল এলিনা, কোণের দিকে হাত তুলে বলল, ট্রাংকগুলো নেই!'

এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল কিশোর। যেখানে ট্রাংকদুটো ছিল, সেখানকার ধুলোঢাকা মেঝেতে দুটো আয়তক্ষেত্রের মত দাগ হয়ে আছে। টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দরজা পর্যন্ত, ধুলোতে সেই দাগও স্পষ্ট।

চরকির মত বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে যেন কিশোরের মস্তিষ্ক। বলল, 'মলের একজন সিকিউরিটি গার্ডকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামে ফেলেছিল ভূতটা। লোকটাকে বিদেশী মনে হলো আমার কাছে। জার্মান-টার্মান। চেনো নিশ্চয়?'

'ঠিকই অনুমান করেছ, জার্মানই। আমার দাদীর আত্মীয়। আমেরিকায় আসার পর দাদাই তাকে মলের চাকরিটা জুটিয়ে দেয়।'

'সেটা কতদিন আগে?'

ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ভাবল এলিনা। 'তা চার-পাঁচ মাস তো হবেই।'

ঠিক এই সময় একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা।

'থিয়েটারের পুরানো প্রোগ্রাম মনে হচ্ছে?' এলিনা বলল। 'নিশ্চয় ট্রাংক থেকে পড়েছে।'

পাতলা পুস্তিকাটা খুলল কিশোর। জার্মান ভাষায় লেখা। পয়লা পৃষ্ঠায় একটা ছবি, মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে। এক যুবকের ছবি, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। মাথায় পাগড়ি। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।

'দাদার ছবি!' প্রায় চেঁচিয়ে বলল এলিনা।

'দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'নিচে ক্যাপশনও রয়েছে। ডোভার ডা গ্রসি, আণ্ড সেইন ট্যানজেণ্ডার গাইস্ট। মানে কি?'

শ্রাগ করল এলিনা। 'জার্মান জানি না আমি।'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর বলল, 'এটা আমি নিয়ে যাই। আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল এলিনা। 'না না, আপত্তি কিসের? নিয়ে যাও।'

অনেক রাতে বাড়ি ফিরল কিশোর। কাপড় বদলে সোজা গিয়ে উঠল বিছানায়। সেরাতে শুধু থিয়েটার আর ভূতের স্বপ্নই দেখল সে।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে নিচে নেমে দেখে মেরিচাচী ঘর ঝাড়ছেন। তার নাস্তা টেবিলে ঢাকা। চেয়ার টেনে বসে পড়ল কিশোর। বলল, 'চাচী, তোমার না একজন বান্ধবী আছেন, জার্মান?'

'হ্যাঁ। নোরা হফম্যান। কেন?'

'একটা বই পেয়েছি সেটার অনুবাদ করাতে হবে।'

'ঠিক আছে, ফোন করে দেব। চলে যাস।' ছেলের মত মানুষ করেছেন, কিশোরের মা বলতে গেলে এখন তিনিই। তার খেয়ালী স্বভাবের কথা ভালমতই জানেন। কাজেই কোন প্রশ্ন করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন যাবি?'

'দেখ ফোন করে, কখন তিনি সময় করতে পারেন।'

ফোনেই মিস হফম্যানের সঙ্গে কথা বলল কিশোর। তিরিশ মিনিট পর এসে ঢুকল আবার মেয়ারস মলে। হাতে সেই প্রোগ্রামটা।

কিশোরকে দোকানে ঢুকতে দেখেই এগিয়ে এলেন মিস্টার ডোভার, 'জানতাম তুমি আসবে। কাল রাতে সব বলেছে আমাকে এলিনা।'

'ও কোথায়?'

'আসেনি। আজ ওর ছুটি।'

প্রোগ্রামটা কাউন্টারের ওপর বিছিয়ে, ছবির নিচের ক্যাপশনটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'ডোভার ডা গ্রসি, আণ্ড সেইন ট্যানজেণ্ডার গাইস্ট। অর্থাৎ, ডোভার দি গ্রেট, এবং তার নাচুনে ভূত।'

বিষণ্ন হাসি হাসলেন ডোভার।

'তরুণ বয়েসে ইউরোপে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন আপনি,' বলতে থাকল কিশোর। 'লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নানারকম উদ্ভট জিনিস দেখানোর ক্ষমতা ছিল আপনার অসাধারণ।'

মাথা ঝাঁকালেন ডোভার।

'আমেরিকায় ফিরে আসার পর আর ওসব নিয়ে প্র্যাকটিস করেননি। তবে আপনার ম্যাজিক দেখানোর সমস্ত সরঞ্জাম ছিল চিলেকোঠার ট্রাংকে । দোকান যতদিন ভাল চলেছে, আরামেই কেটেছে আপনার আর আপনার নাতনীর দিন। তারপর ব্যবসা খারাপ হতে লাগল, এত খারাপ, নাতনীর ইস্কুলের খরচ জোগানও কঠিন হয়ে গেল আপনার জন্যে। এই বয়েসে নতুন আর কিছু করারও উপায় নেই আপনার! যখন পুরো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, এই সময় এল বোরিস ডফনার। এই লোকও ছিল একসময় শো ব্যবসায়ে। আপনার মতই ম্যাজিশিয়ান!'

ধূসর চুলে অস্বস্তিভরে আঙুল চালালেন ডোভার। 'না, ও ছিল সার্কাসের দড়াবাজিকর।'

'চমৎকার,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'তাকে চাকরি দিয়ে দিলেন এখানে। তারপর শুরু করলেন আপনার বিখ্যাত "নাচুনে ভূতের" খেলা, মস্ত বিজ্ঞাপন হয়ে গেল মেয়ারস মলের। চিলেকোঠা থেকে ট্রাংকগুলো বের করে আনিয়েছেন, এখানে। মাঝে মাঝে অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। কেন? দোকানে বসে ভূতের খেলা প্র্যাকটিস করার জন্যে। তাই না? খুব বড় শিল্পী আপনি। কি করে করেন কাজটা?'

'সুতো কিংবা তার দিয়ে। এমনভাবে সাজাই, লোকের চোখে পড়ে না সুতো। কায়দাটা আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান ব্ল্যাকস্টোন, বহু বছর আগে।'

'আপনিও সেটা রপ্ত করেছেন।'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'মিস্টার ডোভার,' কোমল গলায় বলল কিশোর, 'আপনার বা এলিনার কোন ক্ষতি আমি চাই না। কারও কোন ক্ষতি করেননি আপনি, নিছক আনন্দ দিয়েছেন, কাজেই মনে হয় না পুলিশও আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনবে। আর এখানকার দোকানদাররা তো সব্বাই একবাক্যে চলে যাবে আপনার পক্ষে। তাছাড়া নতুন ধরনের এই বিজ্ঞাপনের জন্যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন আপনি, খবরটা বেরোলেই। তবে, লোককে ঠকাচ্ছেন আপনি, এটা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি। শুরু থেকেই একটা অপরাধ বোধ রয়েছে আমার। খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কি করব? এলিনার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে ভাবলেই...'

'তবু, এভাবে কাজটা আর করা উচিত হবে না আপনার।'

তিন

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল কিশোর। কেন যেন খচখচ করছে মনের মধ্যে। ফিরে তাকাল। ও, এজন্যেই এরকম লাগছিল। সেই লোকটা, আগের দিন দরজার আড়ালে থেকে ওদের ওপর নজর রাখছিল যে। আজও দোকানের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চোখ রেখেছে তার ওপর। তবে কিশোর মল থেকে বেরোনোর পর আর তার পিছু নিল না।

বিকেলে টেলিফোন বাজল ইয়ার্ডের অফিসে। মেরিচাচী ধরে ডেকে দিলেন কিশোরকে। মিস্টার ডোভার করেছেন। কিশোর ধরতে ভাঙা গলায় বললেন, 'কিশোর, সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী?'

'বলার সময় নেই। মলের পেছনে আবর্জনা ফেলা হয়, ওখানে দেখা করো আমার সাথে। এসে আমাকে না পেলে অপেক্ষা করো। প্লীজ, এসো। তুমি ছাড়া এখন সাহায্য করার আর কেউ নেই।'

'ঠিক আছে, আসব।'

রবিন আর মুসার বাড়িতে ফোন করল কিশোর। রবিন গেছে চাকরিতে। আর মুসা কাজে ব্যস্ত, বাড়ির গ্যারেজ পরিষ্কার করছে, বেরোতে পারবে না। কাজেই একাই রওনা হলো কিশোর।

জায়গামত পৌছে ডোভারকে না দেখে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট পর তাঁর দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে বেরোলেন ডোভার, হাতে একটা বড় ব্যাগ। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছেন এদিক ওদিক। তারপর দ্রুত এসে ব্যাগটা রাখলেন জঞ্জালের কাছে। এমন ভাব করছেন যেন ময়লা ফেলতে এসেছেন।

আড়াল থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

'তুমি এসেছ,' ফিসফিসিয়ে বললেন ডোভার। 'এত্তো ভয় পেয়েছি, কিছু

ভাবতেই পারছি না!'

'হয়েছে কি?'

'তুমি যাওয়ার পর একটা লোক এসে ঢুকল দোকানে। আড়িপেতে আমাদের সব কথা শুনেছে।'

'বেরোনোর সময় আমি দেখেছি লোকটাকে।'

'ব্যাটা আস্ত শয়তান। দলবল আছে...সব ক'টা চোর-ডাকাত। ভিড়ের মধ্যে পকেট মারে। আজ রাতে স্পেশাল শো দেখানোর জন্যে চাপ দিচ্ছে আমাকে। যাতে লোকের চোখ থাকে ভূতের ওপর, এই সুযোগে ব্যাংকটা লুট করবে ওরা।'

'পুলিশকে জানান।'

'না না!' আঁতকে উঠলেন ডোভার। 'তাহলে এলিনাকে মেরে ফেলবে ওরা! তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে!'

'কি বললেন?'

'হ্যাঁ, সে-জন্যেই তো পুলিশকে জানাতে পারিনি। কিশোর, এলিনার মুখে অনেক প্রশংসা শুনেছি তোমার, অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ তুমি। বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছ। আমার এই উপকারটা করো, কিশোর,' তার হাত ধরলেন ডোভার। 'এলিনাকে বাঁচাও।'

'ব্যস্ত হবেন না। কি ঘটেছে, খুলে বলুন সব।'

'জমজমাট একটা ভূতের খেলা দেখাতে বলেছে আমাকে। আজ রাত আটটায়। যাতে প্রচুর শোরগোল হয়। আজ শুক্রবার, কাজেই অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে ব্যাংক।'

'এলিনার কথা বলুন।'

'এলিনাকে ধরে নিয়ে গেছে। সাথে করে নিয়ে আসবে রাতে, কাল যেখানে ফুল ছিঁড়েছে ভূতটা, তার কাছাকাছিই কোথাও রাখবে বলেছে। আমি যদি ওদের কথামত কাজ করি, তাহলে ছেড়ে দেবে, নইলে...' কথা শেষ করতে পারলেন না বৃদ্ধ, গলা কেঁপে উঠেছে।

'হুম্,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'আপনি দোকানে যান। ব্যবস্থা একটা হবেই। ডফনারকেও তৈরি থাকতে বলবেন, তার সাহায্য দরকার হতে পারে আমাদের। আর বিশ্বাস করা যায় এমন কয়েকজন দোকানদারের সাহায্যও দরকার। আমি বাড়ি যাচ্ছি। ফিরে এসে আমার প্ল্যান বলব।'

'আচ্ছা। থ্যাংক ইউ, কিশোর,' ধরা গলায় বললেন বৃদ্ধ। 'তুমি না থাকলে কি যে হত...'

'ভাববেন না, এলিনা আমাদেরও বন্ধু। যান।'

চার

অন্ধকার একটা অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর, দোতলায়। এখান থেকে মলের অনেকখানি চোখে পড়ে। জানালার কাঁচ খুলে নেয়া হয়েছে, ওখান দিয়েই চালানো

হয় খেলা দেখানোর তারগুলো। বিল্ডিঙের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে একটা প্যানেলে মিলিত হয়েছে সবগুলো তার, এখান থেকে তার টেনে টেনে ডোভারের ভূত নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

'কিশোর,' ওয়াকি-টকিতে ভেসে এল মুসার কণ্ঠ, 'শুনছ?'

যন্ত্রের একটা বোতাম টিপল কিশোর। 'বলো।'

'ব্যাংকের কাছে পজিশন নিয়েছি আমি। কেউ দেখতে পাচ্ছে না আমাকে।'

'ভাল। যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে। রবিন, শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা?'

'হ্যাঁ,' ওয়াকি-টকিতেই জবাব দিল রবিন। 'খেলনার দোকানটার কাছে রয়েছি আমি। সব স্বাভাবিক এখানে।'

'আমার সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করো। কাটলাম।'

অফিসে এসে ঢুকলেন ডোভার। 'রেডি?'

'হ্যাঁ,' বলে জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। ঠিক তার নিচে, একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি জায়গায় কতগুলো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ঝুলছে।

'শুরু করা যায়…' কথা শেষ হলো না কিশোরের, খড়খড় করে উঠল রেডিওর স্পীকার।

'কিশোওর!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'শুনছ?'

জবাব দিতে যাবে কিশোর, এই সময় দেখল, দোতলা আর একতলার মধ্যবর্তী অংশে সিঁড়ির পাশের একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। একজন এলিনা, অন্যজন সেই লোকটা, যে ওদের ওপর চোখ রেখেছিল। এলিনাকে এক হাতে ধরে রেখেছে, আরেক হাত পকেটে। স্পষ্টই বোঝা গেল পকেটে কি আছে। নিশ্চয় পিস্তল।

ডোভারও দেখতে পেয়েছেন ওদের।

মুসার কথার জবাব দিল কিশোর, 'মুসা, বলো, কি বলছিলে?'

'ওরা এসে গেছে! ঘড়ি দেখছে!'

'চোখ রাখো!' মুসাকে বলল কিশোর। 'মিস্টার ডোভার, আপনার কাজ শুরু করতে পারেন।'

প্যানেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডোভার। একটা লিভারে চাপ দিতেই চালু হয়ে গেল যন্ত্র, শুরু হলো ভয়াবহ শব্দ। তীক্ষ্ণ, জোরালো একটা ভীতিকর গোঙানি ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মল জুড়ে। চারটে অদ্ভুত আকৃতির জিনিস ছুটে নেমে গেল স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে। ওটা প্ল্যাস্টিকের বিশেষ ব্যাগ ওগুলো, ভেতরে কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে মোটর। ভেতরের কিছু যন্ত্রপাতিকে নেড়েচেড়ে ব্যাগের আকৃতি নানারকম করে ফেলে সেই মোটর। ব্যাটারির সাহায্যে ব্যাগের ভেতরে নানা রঙের ছোট ছোট বাল্ব জ্বালানরও ব্যবস্থা রয়েছে। শুনলে মনে হয় সহজ, কিন্তু ভূত চালানোর কাজটা করতে হয় অত্যন্ত দক্ষ হাতে। ডোভারের মত ওস্তাদদের পক্ষেই শুধু সেটা সম্ভব। কারণ রাতের বেলা হলেও অনেক আলো থাকে মলের ভেতর, অসংখ্য চোখ তাকিয়ে থাকে, একটু ভুলভাল হলেই কারও না কারও চোখে ধরা পড়ে যাবেই ব্যাপারটা। তারগুলোও বসানো হয়েছে বেশ কায়দা করে,

আলোআঁধারির মাঝে, যাতে লোকের চোখে না পড়ে। ব্যাপারটা অনেকটা সুতো টেনে পুতুল নাচানোর মতই।

'আমি জায়গামত যাচ্ছি,' ডোভারকে বলে দ্রুত বেরিয়ে এল কিশোর।

একতলায় থেকে লোকের মাথার ওপর ভূতটাকে ছোটাছুটি করতে দেখে হাসি চাপতে পারল না রবিন।

শাঁ করে নিচের দিকে ভূতটাকে নামতে দেখে মাথা নুইয়ে ফেলল অনেকে।

মুসা লুকিয়ে রয়েছে ব্যাংকের একটা ডেস্কের তলায়। ডাকাতদের ওপর চোখ। ওদের হাতে পিস্তল। ব্যাংকের অল্প কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া বাইরের একজন লোকও নেই এখানে, সবাই ভূত দেখতে চলে গেছে। কর্মচারীদেরকে পিস্তলের মুখে আটকে রেখে দ্রুত টাকার বাণ্ডিল ব্যাগে ভরছে ডাকাতেরা।

'টাকা ভরছে এখন!' রেডিওতে ফিসফিস করে জানাল কিশোরকে মুসা।

খেলনার দোকান থেকে খবরটা শুনল রবিন। সময় হয়েছে, বুঝতে পারল। দোকানের তিনজন সেলসম্যানকে আগেই সব কথা জানিয়ে রেখেছেন ডোভার। তাদের বলল রবিন, 'রেডি হোন।' একবাক্স মার্বেল তুলে নিল সে। অন্য তিনজনও তুলে নিল এক বাক্স করে।

মাথার ওপর খেলা জুড়েছে এখন চার-চারটে ভূত। নাচছে, কুঁদছে, ঘুরছে, ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক, তাড়া করছে লোককে। ব্যাংকের কাছ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এল দর্শকদের। এতে ওখানটায় ভিড়ের মাঝে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হলো।

এই সময় বেরিয়ে এল চোরেরা। দেখল, কেউ নেই ওখানে, শুধু ওরা বাদে। ভেবেছিল ভিড়ে মিশে যাবে, এরকম ফাঁকা জায়গায় একা হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। সাদা কাগজে কালির ফোঁটার মতই স্পষ্ট এখন ওরা। তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টা করল।

'এইবার!' খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়ানো রবিন চেঁচিয়ে উঠল। বলেই চোরদের সামনে ঢেলে দিল মার্বেলগুলো। ঢেলে দিল অন্য তিনজনেও।

দৌড় দিয়েছে চোরেরা। জুতোর নিচে মার্বেল পড়ে পিছলে গেল, ধুড়ুম ধুড়ুম করে আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। আবার উঠে দাঁড়ানোর আগেই ঘিরে ফেলল ওদেরকে সিকিউরিটি গার্ডেরা। জোরে হেসে উঠল দর্শকরা। তারা ভাবল ভূতুড়ে তামাশার এটাও আরেকটা অংশ।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকটা এসব দেখে রেগে গেছে। হ্যাঁচকা টান মারল এলিনার হাত ধরে। পকেটের ভেতর নড়ে উঠল তার হাতটা।

একটা তার ধরে টান দিলেন ডোভার। বিড়বিড় করে বললেন, 'যা, হারমি, যা! ডোবাসনে আমাকে, দোহাই লাগে তোর!'

চোখের পলকে ছুটে গেল হারমি।

শব্দটা কানে গেল লোকটার। ঝট করে মাথা তুলল। ছুটে আসা ভূতটাকে দেখে সরার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু দেরি করে ফেলল।

ধ্যাপ করে এসে তার গায়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল হারমি। তাল সামলাতে না পেরে চলমান সিঁড়িতে পড়ে গেল ডাকাতটা। লুকানো জায়গা থেকে ছুটে বেরোল

কিশোর, এলিনার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল তাকে।
উঠে দাঁড়িয়েছে ডাকাতটা। পিস্তল বের করে ছুটতে শুরু করল সিঁড়ির ওপরে। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার, থামো! নইলে গুলি করলাম!'
থমকে দাঁড়াল কিশোর। ফিরে তাকাল। এলিনাও থেমে গেছে।
'এসো এদিকে,' ধমক দিয়ে বলল ডাকাতটা, 'জলদি!'
দ্বিধা করল একমুহূর্ত কিশোর। ছাতের দিকে তাকাল একবার। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল এলিনাকে নিয়ে।
মাথার ওপরের আবছা অন্ধকার একটা প্ল্যাটফর্মে একটা ছায়া নড়ে উঠল ওই মুহূর্তে। লম্বা দড়ি ধরে বানরের মত দোল খেয়ে শাঁ করে নেমে এল একজন লোক, যেন টারজান, ডাকাতটার পাশ দিয়ে যাবার সময় লাথি মেরে ফেলে দিল তার হাতের পিস্তল।
হতভম্ব হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডাকাতটা। দোল খেয়ে আবার ফিরে এল ডফনার। দড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে লাফিয়ে নামল সিঁড়িতে, লোকটার পাশে। জাপটে ধরল তাকে।
ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা। ডফনারের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল সিঁড়ির নিচের দিকে। নেমে এল একতলায়। পিছে পিছে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে ডফনার। হৈ হৈ করে চেঁচাচ্ছে দর্শকেরা, ওরা ভাবছে এটাও আরেক খেলা। অভিনয়। ভূতের সঙ্গে এরও সম্পর্ক রয়েছে। কেউ ধরার চেষ্টা করছে না ডাকাতটাকে।
মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে চলে এসেছে ডাকাতটা, ঠিক এই সময় ধেয়ে এল আবার হারমি। প্রচণ্ড জোরে লোকটার ঘাড়ে এসে লাগল ইঁট ভর্তি ব্যাগ। ছোটার গতি সামনের দিকে; তার ওপর পেছন থেকে ভারি ব্যাগের ধাক্কা সামলাতে পারল না লোকটা, হুমড়ি খেয়ে যেন ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল পানিতে।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে আবার যখন উঠল, দেখে সিকিউরিটি গার্ড আর দোকানদাররা ঘিরে ফেলেছে তাকে। টপটপ করে পানি ঝরছে তার গা থেকে। হতাশ চোখে তাকাল ওদের দিকে। ধরা না দিয়ে আর উপায় রইল না।
এই সময় দূরে শোনা গেল পুলিশের সাইরেন।
সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর এলিনা। তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ডোভার। জিজ্ঞেস করলেন, 'এলি, ঠিক আছিস তুই?'
মাথা ঝাঁকাল এলিনা।
'যাক, ভালয় ভালয়ই শেষ হলো সব,' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু হারমিকে মিস করব আমি! ক'টা মাস বড় ভাল কাটল। আবার ওকে ফিরে যেতে হবে ট্রাংকে।'
'দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি,' মিটিমিটি হাসছে কিশোর। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেছে তার অভিনয়। হাত নেড়ে ডেকে বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, চুপ করুন। থামুন আপনারা। শুনুন।' ওপর দিকে তাকাল জনতা। আবার বলল কিশোর, 'আশা করি এতক্ষণে বুঝে গেছেন এই ভূত আসল ভূত

নয়। মানুষের তৈরি। এর স্রষ্টা এখানে হাজির আছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এই যে ইনি, ডোভার দি গ্রেট, ওই নাচুনে ভূত হারমির স্রষ্টা।

জোর গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। প্রশংসা শুরু হলো একসঙ্গে।

এত প্রশংসায় চোখে পানি এসে গেল ডোভারের। তাদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালেন তিনি।

'এইই সুযোগ,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'বলে দিন সব। স্বীকার করুন। কেউ অভিযোগ না করলে পুলিশ আপনাকে কিচ্ছু বলবে না।'

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান,' ভাঙা গলায় বললেন ডোভার, 'আমি আপনাদের ঠকিয়েছি...'

'না না, ঠকাননি! ঠকাননি! আমরা ওই খেলা আরও দেখতে চাই! রোজ দেখতে চাই!' চিৎকার করে বলল জনতা।

হাসি ফুটল ডোভারের মুখে। 'বেশ, তাই দেখবেন। তবে রোজ নয়, প্রতি হপ্তায় একদিন করে। কোন্ দিন সেটা বলব না। যে কোনদিন হতে পারে খেলা। শুধু হারমিই নয়, আরও নানারকম নতুন নতুন ভূত হাজির হবে এখন থেকে আপনাদের সামনে।'

স্পেনের জাদুকর

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৩

'বাহ্, খুব মউজে আছে চাচা,' পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের একটা ঝরঝরে পিকআপের বাম্পারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোর। 'এক বিকেলেই এত জিনিস। আর জিনিসও বটে। দাগ লাগা কাচের জানালা, মার্বেলের ম্যানটেলপিস, অ্যানটিক বাথটাব, মেহগনি কাঠের দরজা…চাচাকে আর পায় কে।'

গুঙিয়ে উঠে মাটিতেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মুসা, 'বারোটা তো বাজছে আমাদের! ট্রাকে তোলা কি চাট্টিখানি কথা?' চাপড় মারল কপালে, 'আল্লারে, কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম ভেঙেছিল! ওই বাথটাবটাই হবে এক টন! গিয়ে আবার নামাতে হবে!'

মুচকি হাসল রবিন। 'কাজ অনেক বেশি, সন্দেহ নেই। তবে রাশেদ আঙ্কেলের অবস্থাটা দেখ, কি কাণ্ড করছেন। পয়সা দিয়ে এই মজা দেখতে পারবে? সোনার খনি পেলেও মানুষ ওরকম করে না।'

ভুরুর কাছটায় জোরে জোরে ডলল কিশোর। লাঞ্চের পর পরই চাচার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। হলিউডের এক পাহাড়ে একটা পুরানো বাড়ি ভাঙা হবে খবর পেয়েছিলেন রাশেদ পাশা, শোনার পর পরই অস্থির, কখন গিয়ে পুরানো মাল কিনবেন। এখন বাজে চারটে, আর পাহাড়ের ওপর আগুন ঢালছে আগস্টের সূর্য। নিচে প্রচণ্ড তাপে যেন কাঁপছে শহরটা, বাতাসে এক ধরনের ঝিলিমিলি, গরমের সময় হয়।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'আঙ্কেল ওখানে এতক্ষণ কি করছেন?'

'রত্ন খুঁজছে, আর কি? হীরা-মানিক কোনটা চোখ এড়িয়ে যায় ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

অবশেষে বেরোতে দেখা গেল রাশেদ পাশাকে। হাসল কিশোর। ভিকটোরিয়ান আমলের বিশাল প্রাসাদগুলোর ঢঙে তৈরি ক্রেস্টভিউ ড্রাইভের চূড়ার এই বাড়িটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তিনি। শ্রমিকদের সর্দার ওই লোকটা, বাড়ি ভাঙার দায়িত্ব নিয়েছে। পুরানোটা ভেঙে ফেলে নতুন আরেকটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে ওই জায়গায়। কথা শেষ করে লোকটার সঙ্গে হাত মেলালেন রাশেদ পাশা, বারান্দা থেকে নেমে গাড়িপথ ধরে এগিয়ে আসতে লাগলেন ট্রাকের দিকে।

'আর কিচ্ছু নেই, সব নিয়ে নিয়েছে,' কাছে এসে ছেলেদের জানালেন তিনি। 'খারাপই লাগে, বুঝলি কিশোর। এরকম বাড়ি আর বানায় না কেউ। নতুন থাকতে নিশ্চয় দেখার মত বাড়ি ছিল। এখন ভেতরে কেবল উঁই পোকার বাসা,

পচে, ভেঙে সব শেষ।' দীর্ঘশ্বাসটা চাপা দিতে পারলেন না রাশেদ পাশা। বিশাল গোঁফে মোচড় দিলেন একবার। উঠলেন গিয়ে ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন, 'আয়, ওঠ।'

মেহগনি কাঠের দরজা আর দাগ লাগা কাচের জানালার ফাঁকে বসার সামান্যই জায়গা আছে। সেখানেই কোনমতে গাদাগাদি করে বসল ছেলেরা। ধীরে ধীরে সাবধানে ভীষণ ঢালু পথ বেয়ে নামতে শুরু করল ট্রাক। গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে কিশোর আশপাশের বাড়িগুলো, ভালই রয়েছে, যেটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে সেটার মত অত পুরানো নয়। যত্নটত্নও করা হয়। তবে বড় বড় ওই বাড়িগুলোও যথেষ্ট পুরানো। কিছু তৈরি হয়েছে ইংরেজদের গ্রামের বাড়ির মত করে, কিছু ফরাসীদের দুর্গ, আর কিছু বা তৈরি হয়েছে স্প্যানিশ স্টাইলে—লাল রঙের প্ল্যাস্টার করা দেয়াল, লাল রঙের ভারি টালির ছাত।

'এই দেখ!' কিশোরের কাঁধে টোকা দিয়ে রাস্তার ডান পাশের একটা স্প্যানিশ বাড়ির দিকে হাত তুলল রবিন। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি, একটা বিশেষ গাড়ি। কালো রোলস রয়েস, সোনালি রঙের অলঙ্করণ।

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'আমাদের গাড়িটাই! তার মানে কাছাকাছিই আছে হ্যানসন।'

একটা ধাঁধা প্রতিযোগিতায় জিতে যে গাড়িটাকে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল কিশোর, এটা সেই গাড়ি। প্রয়োজনে এখনও ওটা ব্যবহার করতে পারে ওরা।

গাড়িটার কাছেই বাঁক নিয়েছে পথ। সেখানে এসে গতি কমালেন রাশেদ পাশা। গড়িয়ে চলেছে ট্রাক। মালপত্রে বোঝাই, তার ওপর ঢালু রাস্তা, গতি বাড়াতে সাহস করছেন না। হঠাৎ খুলে গেল স্প্যানিশ বাড়িটার সামনের দরজা। বেরিয়ে এল ছোটখাট, রোগাটে, গাঢ় রঙের স্যুট পরা একজন মানুষ। বেরিয়েই দিল দৌড়।

'এই থাম! থাম বলছি! শয়তান কোথাকার!'

পেছনে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল হ্যানসন।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলেন রাশেদ পাশা।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। লাফিয়ে নেমেই দৌড় দিল লোকটাকে ধরার জন্যে।

'ধর, ধর, চোর!' চিৎকার করে বলল হ্যানসন।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা, লোকটার কোমর সই করে। মিস করল। লাফিয়ে উঠেই তিন লাফে কাছে গিয়ে জাপটে ধরার চেষ্টা করল। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল ছোট্ট মানুষটার ডান হাত, যেন সাপের ছোবল, লাগল এসে মুসার ডান চোখের নিচে। তীক্ষ্ণ, তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। গুঙিয়ে উঠল। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে আসছে হাঁটু। কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পড়ে গেল।

কানে আসছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। দড়াম করে বন্ধ হলো একটা গাড়ির দরজা।

'এহ্‌হে, গেল ব্যাটা!' আবার হ্যানসনের চিৎকার শোনা গেল।

চোখ মেলল মুসা। ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল।

দেখল, তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে হ্যানসন।

'বেশি লেগেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইংরেজ শোফার।

'না, তেমন না। তবে মারতে পারে বটে। একেবারে জায়গা বুঝে মারে, চিত করে দেয়ার জন্যে।'

দৌড়ে এল কিশোর আর রবিন।

'পালিয়েছে ব্যাটা,' রবিন জানাল। 'রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল।'

'সোজা হয়ে দাঁড়াল পুরো ছয় ফুট লম্বা হ্যানসন। রাগে, ক্ষোভে লাল হয়ে গেছে ওর সদা হাসিখুশি মুখটা। 'আমি একটা ছাগল! নইলে হাত ফসকে পালায় কিভাবে?' পরক্ষণেই চলে গেল রাগ, হাসি ফিরল চেহারায়, 'তবে, জন্মের ভয় পাইয়ে দিয়েছি। বুকের কাঁপুনি থামাতে সময় লাগবে।'

দুই

'হ্যানসন, লোকটা পালিয়েছে? পুলিশকে খবর দিয়েছি আমি।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে মুখ ডলল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'খাইছে!' আর রবিন হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্প্যানিশ ম্যানশনের দরজায় বেরিয়ে আসা ভদ্রমহিলাটির দিকে।

'পালিয়েছে,' লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দিল হ্যানসন।

গাড়িপথ ধরে এগিয়ে আসতে লাগলেন মহিলা। মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেলল কিশোর। কিশোর পাশাকে চমকে দেয়া অত সহজ নয়, কিন্তু ওই মহিলা সবাইকেই চমকে দিতে পারবেন। অবাকটা হয়েছে ওরা আসলে মহিলার পোশাকের বহর দেখে। যেমন পোশাক তেমনি চুল আঁচড়ানোর ঢঙ।

'মিসেস মরিয়াটি,' পরিচয় করিয়ে দিল হ্যানসন, 'এরা আমার বন্ধু, তিন গোয়েন্দা।'

'অ্যাঁ?' ক্ষণিকের জন্যে অবাক মনে হলো মহিলাকে। হাসলেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি তোমাদের কথা। তিনজন ইয়াং ডিটেকটিভ। হ্যানসন বলেছে। দাঁড়াও, আমিই বলি কার কি নাম।' কিশোরের দিকে মাথা নোয়ালেন তিনি, 'তুমি কিশোর পাশা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসার দিকে হাত তুললেন, 'তুমি মুসা। ভূতের ভয়ে কাবু।' হাসলেন তিনি। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আর তুমি রবিন, বইয়ের পোকা। চলমান জ্ঞানকোষ।'

সবাই হাসল। মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নেয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে মিসেস মরিয়াটির।

আবার তাকালেন মুসার দিকে, 'বেশি লাগেনি তো?'

'না না,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। আর লজ্জা পেতে চায় না। উঠে দাঁড়াল।

পেছনে হাসি শুনতে পেল মুসা। ফিরে তাকিয়ে দেখল রাশেদ পাশা এসে দাঁড়িয়েছেন। মুসা তাকাতেই আবার হাসলেন, 'ওই একটা লিলিপুটই তোমাকে চিত করে দিল?'

'আসলে দেখে পাত্তাই দিইনি ব্যাটাকে। ভেবেছি ও আর কি করবে?' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল মুসা।

হ্যানসন পরিচয় করিয়ে দিল, 'মিসেস মরিয়াটি, ইনি মিস্টার রাশেদ পাশা।'

হাসি চওড়া হলো মহিলার। 'ও, রাশেদ পাশা। আপনার নাম অনেক শুনেছি আমি। আপনার বিখ্যাত স্যালভিজ ইয়ার্ডের কথা শুনেছি। যেতাম দুয়েক দিনের মধ্যেই। পুরানো আয়না খুঁজতে।'

'আয়না?'

'হ্যাঁ। আয়না সংগ্রহ করি আমি। দেখবেন? আসুন না।'

ঘুরে রওনা হয়ে গেলেন মিসেস মরিয়াটি। বাতাসে উড়ছে তাঁর ফোলানো স্কার্টের বিশাল চওড়া ঝুল।

'ওরকম পোশাকই পরেন নাকি সব সময়?' প্রশ্ন করল মুসা।

'খুব মজার মহিলা,' হ্যানসন জবাব দিল। 'নিজে গাড়ি কেনেন না, খুব ঝামেলা মনে হয় তাঁর কাছে। তাই প্রায়ই রোলস রয়েস সহ আমার ডাক পড়ে। বাড়ির ভেতরটা তো দেখোইনি। সাংঘাতিক।'

সত্যিই 'সাংঘাতিক'। একসময় আরও সাংঘাতিক ছিল। হ্যানসনের পিছু পিছু একটা এনট্র্যান্স হল দিয়ে ঢুকল তিন গোয়েন্দা আর রাশেদ পাশা। আলো খুব সামান্য, আর অদ্ভুত ঠাণ্ডা। বাঁয়ে একটা চওড়া সিঁড়ি যেন রাজকীয় ভঙ্গিতে উঠে চলে গেছে দোতলায়। তার ওপাশে সরু একটা হলওয়ে চলে গেছে, বাড়িটা যতখানি লম্বা ঠিক ততটাই লম্বা হয়ে। ডানে কারুকাজ করা কাঠের বড় দরজা। দরজার ওপাশের ঘরটা এতটাই অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু।

মেহমানদেরকে নাক বরাবর সোজা নিয়ে যাওয়া হলো মস্ত এক লিভিং রুমে। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য ছায়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, যেন প্রাণ আছে ওগুলোর। ভারি পর্দা লাগিয়ে রোদ তো বটেই, আলো আসাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ফলে ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। খানিক পরেই বুঝতে পারল ছেলেরা, ছায়াগুলো আর কিছুই নয়, ওদেরই প্রতিবিম্ব। আয়নার ছড়াছড়ি। নানা আকারের নানা ধরনের আয়না, শত শত। তিন গোয়েন্দা নয়, যেন তিনশো গোয়েন্দা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর।

'খুব সুন্দর, তাই না?' অসংখ্য প্রতিবিম্ব নড়েচড়ে উঠল মিস মরিয়াটির, কিশোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'আমার মাথা ঘুরছে,' মুসা বলল।

'বসে পড়ো,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। নিজে গিয়ে বসলেন ফায়ার প্লেসের কাছে একটা ছোট চেয়ারে। 'আমার বেশির ভাগ আয়নাই পুরানো। কিছু কিছু আছে অনেক পুরানো। প্রতিটারই একটা করে কাহিনী আছে। সারা জীবন ধরে অনেক পরিশ্রম করে এগুলো জোগাড় করেছি আমি। ছোটবেলা থেকেই শুরু করেছিলাম। অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডের গল্প তো পড়েছই। মনে আছে নিশ্চয়, একটা লুকিং-গ্লাসের ভেতর দিয়ে এক আজব জগতে ঢুকে পড়েছিল অ্যালিস। এক বিচিত্র দুনিয়ায়। ছোটবেলায় আমিও পড়েছি সেই গল্প। মনে হয়েছে, ওরকম একটা আয়না পেলে আমিও তার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিচিত্র সেই জগৎটা দেখে

আসতে পারি।'

মুসার বয়েসী তার সমান লম্বা একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। মাথায় গাজর রঙের চুল, তিলে ছেয়ে আছে নাকটা। তার পেছনে রয়েছে একটা মেয়ে, প্রায় ছেলেটার সমানই লম্বা, তবে চুলের রঙ অন্য রকম, কালচে বাদামী। জানালার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যানসনের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। তারপর নজর ঘুরে এল একে একে রাশেদ পাশা এবং তিন গোয়েন্দার ওপর।

'এরা আমার নাতি-নাতনী,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'ডন কারনেস, টুলসা কারনেস,' দু'জনের পরিচয় দিলেন তিনি মেহমানদের কাছে। ওদেরকে বললেন, 'টুলসা, ইনি মিস্টার রাশেদ পাশা, রকি বীচের বিখ্যাত স্যালভিজ ইয়ার্ডটার মালিক। ও ওনার ভাইপো, কিশোর পাশা। এরা কিশোরের বন্ধু, মুসা আমান, আর রবিন মিলফোর্ড।'

'তিন গোয়েন্দা!' চেঁচিয়ে উঠল ডন।

'একেবারে সময়মত হাজির!' মেয়েটা বলল। 'চোরও ঢুকল, তোমরাও ঢুকলে। নিতে পারেনি কিছু।'

'কিছুই নেয়নি?' মিসেস মরিয়াটি জানতে চাইলেন।

'সবই তো ঠিক আছে দেখলাম,' ছেলেটা বলল।

সাইরেন শোনা গেল এই সময়। পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে আসছে।

'ওই যে, পুলিশ এল,' মিসেস মরিয়াটি বললেন, 'টুলসা, নিয়ে আয়গে ওদের। হ্যানসন, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো। স্বস্তি পাচ্ছ না মনে হচ্ছে?'

'না না, আমি ঠিক আছি,' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল হ্যানসন।

দু'জন তরুণ পেট্রলম্যানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল টুলসা। মিসেস মরিয়াটির অনেক পুরানো আমলের বিচিত্র সাজসজ্জা দেখে হাত থেকে ক্যাপই খসে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো একজনের। ব্যাপারটা দেখেও দেখলেন না মহিলা। কি ঘটেছে জানালেন পুলিশকে।

'ওপরে বসে চা খাচ্ছিলাম,' বললেন তিনি। 'আমার সাথে ছিল আমাদের হাউসম্যান হ্যারি কোলাস। অস্বাভাবিক কিছু শুনিনি আমরা। মনে হয় চোরটা ভেবেছিল বাড়িতে কেউ নেই। ঢুকে হয়তো কিছু খোঁজাখুঁজি করছিল, এই সময় আমার নাতি আর নাতনীকে নিয়ে বাজার থেকে ফিরে এল হ্যানসন, ওরা ঘরে ঢুকে হয়ত চমকে দিয়েছিল চোরটাকে। লাইব্রেরিতে ছিল সে। কিছু নিয়েছে কিনা জানতে পারিনি এখনও। সময় পায়নি বলেই হয়তো নিতে পারেনি।'

হ্যানসন আর তিন গোয়েন্দা তখন চোরটার বর্ণনা দিল পুলিশকে। কি করে বেরিয়ে ছুটে পালিয়েছে, সব জানাল। বলল, লোকটা খাট, রোগাটে, কালো চুল, রগ বের হওয়া কপাল, মাঝ বয়েসী। তবে যথেষ্ট শক্তিশালী আর চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র, এই কথাটা বিশেষ ভাবে বলল মুসা। যে গাড়িটাতে করে পালিয়েছে লোকটা সেটা দেখতে কেমন, কি গাড়ি, বলল কিশোর।

'এ শহরে ওরকম হাজার হাজার গাড়ি আছে,' বলল একজন পুলিশম্যান। 'লাইসেন্স নম্বরটা রাখতে পেরেছ?'

'না, পারিনি। সারা গাড়িতে কাদা লেগেছিল। নম্বর প্লেটেও লেগেছিল।'

নোটবুকে খসখস করে লিখে নিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা।

'কি করে ঢুকেছে বুঝতে পেরেছি আমরা,' টুলসা বলল, 'রান্নাঘরের দরজার তালা ভেঙে।'

মাথা ঝাঁকাল পুলিশম্যান। 'সেই পুরানো গল্প। পেছনের দরজায় কেউ ভাল তালা লাগানোর কথা ভাবে না।'

'কিন্তু আমাদের পেছনের দরজায়,' প্রতিবাদের সুরে বললেন মিসেস মরিয়াটি, 'খুব ভাল তালা ছিল। এসব ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক থাকি। সমস্ত জানালায় মোটা শিকের গ্রিল লাগানো। আছেই মাত্র দুটো দরজা, একটা সদর, আরেকটা পেছনের। রান্নাঘর দিয়ে বেরিয়ে গ্যারেজে ঢোকা যায়। দুটো দরজাতেই ডবল ডেড-বোল্ট লক লাগানো থাকে। শাবল দিয়ে চাড় মেরে দরজার পাল্লা ভেঙেছে চোরটা। ডন, ওদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাও।'

ডনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল দু'জন পুলিশ। ফিরে এল একটু পরেই। একজনের হাতে শাবল, যেটা দিয়ে দরজা ভেঙেছে চোর।

'আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে,' শাবলটা দেখিয়ে বলল লোকটা।

'পাবেন না,' মুসা বলল, 'চোরটার হাতে দস্তানা ছিল।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর। ভাল মত দেখেছি। চোখের সামনে হাত নিয়ে এসেছিল, না দেখে উপায় আছে?'

চোরটার কোন খবর পেলে জানাবে, মিসেস মরিয়াটিকে কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশ। বিদায় নিয়ে হ্যানসনও চলে গেল। অনেকক্ষণ হলো এসেছে। রোলস রয়েসটা ফেরত দিয়ে অফিসে রিপোর্ট করতে হবে।

'চোরের আর খোঁজ পাব বলে মনে হয় না,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'কোন সূত্রই নেই, ধরতে পারবে না পুলিশ। যাই হোক, নিতে পারেনি কিছু।' তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বাড়িটা দেখতে চাও? কার বাড়ি জানো? জাদুকর টেরিয়ানোর। সে-ই তৈরি করেছিল।'

'টেরিয়ানো?' সোজা হয়ে বসল কিশোর, 'তাহলে এটাই সেই টেরিয়ানোর বাড়ি! তাঁর কথা পড়েছি।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস মরিয়াটি। 'টেরিয়ানো এই বাড়িতেই মারা গেছেন। কেউ কেউ মনে করে বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব আছে। আমি অবশ্য আজ পর্যন্ত কিছু দেখিওনি, শুনিওনি। তবে পুরানো অনেক দেখার মত জিনিস আছে। ইচ্ছে করলে দেখতে পারো।'

লিভিং রুম পার হয়ে গিয়ে এক জোড়া ডাবল ডোর খুললেন তিনি। রাশেদ পাশা, তিন গোয়েন্দা, ডন আর টুলসা তাঁকে অনুসরণ করে বিরাট এক ডাইনিং রুমে ঢুকল। এঘরের জানালার পর্দা খোলা। রোদ পড়েছে দেয়ালে। লাল বুটি তোলা মোটা কাপড়ে ঢাকা দেয়াল। সাইডবোর্ডের ওপরে রাখা আঁকাবাঁকা গিলটি করা ফ্রেমওয়ালা একটা আয়না। অনেক অনেক পুরানো, জায়গায় জায়গায় ছালচামড়া উঠে যাওয়া দেখেই বোঝা যায়।

'খুব প্রিয় জিনিস এটা আমার,' মিসেস মরিয়াটি জানালেন। 'সেইন্ট

পিটার্সবুর্গের জারের বাড়ি থেকে এসেছে। বলা যায় না, হয়তো ক্যাথারিন দা গ্রেটও মুখ দেখেছেন এই আয়নায়। আয়নার এই ব্যাপারটাই নাড়া দেয় আমাকে। কত মানুষের মুখের প্রতিবিম্ব যে পড়ে। আর সব মুখেরই খুদে খুদে অদৃশ্য ছাপ রয়ে যায় ভেতরে, একথা কল্পনা করতে আমার খুব ভাল লাগে।'

ডাইনিং রুমের পরের ঘরটা বাটলার'স প্যান্ট্রি, তার পরেরটাই রান্নাঘর। ওখানে দেখা হলো হাউসম্যান হ্যারি কোলাসের সঙ্গে। ছিপছিপে গড়ন, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ, যদিও দেখেই অনুমান করা যায় প্রাচ্যের লোক ছিল তার পূর্বপুরুষেরা, ইংরেজি বলে একেবারে বোস্টনের টানে। জানাল, ছুতার আর তালার মিস্ত্রীকে খবর দেয়া হয়েছে দরজা মেরামতের জন্যে। রাতের আগেই ঠিক হয়ে যাবে।

'গুড,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। তিন গোয়েন্দাকে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ওটা হ্যারির ঘর। একটা আয়নাও ওখানে রাখতে দেয় না আমাকে।'

হাউসম্যান হাসল। 'আয়নার দিকে তাকাতে আমার ভাল লাগে না।'

'চলো, আমার আরও ধনরত্ন আছে, সেগুলো দেখাই,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। আরেকটা দরজা খুলে লম্বা, সরু করিডরে পা রাখলেন। বাড়িটাতে ঢুকে প্রথমেই এই করিডরটা চোখে পড়ে, মেহমানরাও তাই দেখেছে।

'টেরিয়ানোর সময়ে,' মিসেস মরিয়াটি বললেন, 'বাড়ির সামনের অর্ধেকটায় ছিল বলরুম। আমি কয়েকটা দেয়াল তুলে দিয়ে...কি বলা যায়? হ্যাঁ, ঘরগুলোকে ঐতিহাসিক দর্শনীয় জিনিসে পরিণত করেছি।'

কোণের একটা ঘরে এসে ঢুকল সবাই। কাদার রঙে রঙ করা দেয়াল, মনে হয় মাটি দিয়ে তৈরি, কাঁচা রয়েছে, এখনও শুকায়নি। ছোট একটা বিছানা, চামড়ার কজার লাগানো একটা ট্রাঙ্ক, একটা কাঠের চেয়ার, আর একটা কাঠের টেবিল। টেবিলে রাখা ম্যাপল কাঠের ফ্রেম লাগানো একটা আয়না।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় গোল্ড রাশ অর্থাৎ স্বর্ণ সন্ধানের যুগ যখন চলছে, সোনার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে মানুষ, ওই সময় এটা আনা হয়েছিল,' টেবিলের আয়নাটা দেখালেন মিসেস মরিয়াটি। 'নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছিল একজন আমেরিকান। এক স্প্যানিশ ডনের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে। কনের জন্যে বিয়ের উপহার।'

'বিয়ে করতে পেরেছিল?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পেরেছিল। এবং মেয়েটার জন্যে সেটা ছিল একটা অভিশাপ। জুয়া খেলে সব কিছু হারিয়েছিল লোকটা। শেষ পর্যন্ত একটা মাটির ঘরে গিয়ে উঠতে হয়েছিল মেয়েটাকে। অবিকল সেই ঘরের মত করেই তৈরি হয়েছে এই ঘরটা। শেষ বয়েসটা বড় কষ্টে কেটেছে বেচারির।'

পরের ঘরটা বসার ঘর। ছিমছাম, সাদাসিধা, কোন বাহুল্য নেই। মিসেস মরিয়াটি এটার নাম দিয়েছেন ভিকটোরিয়া রুম।

'এই ঘর তৈরি হয়েছে,' তিনি জানালেন, 'রানী ভিকটোরিয়ার একটা বসার ঘরের অনুকরণে। ছোট বেলায় ওই ঘরে মায়ের সাথে বসতেন রানী। আসবাবপত্র সব তৈরি করা হয়েছে সেরকম করেই। তবে ওই যে ওই আয়নাটা,' ম্যানটেলের

ওপরে রাখা একটা আয়না দেখালেন মিসেস মরিয়াটি, 'ওটা আসল। ওটা ছিল ভিকটোরিয়ার মায়ের। ছোট বেলায় নিশ্চয় ওই আয়নায় মুখ দেখতেন ছোট্ট ভিকটোরিয়া, এককালের মহারানী, কল্পনা করতে পারো? মাঝে মাঝে সেরকম পোশাক পরে আয়নাটার সামনে বসি আমি। কিশোরী ভিকটোরিয়া অবশ্যই হতে চাই না, কারণ আমি বুড়ো মানুষ, তবে মনে মনে নিজেকে তার মায়ের জায়গায় বসিয়ে নিই।'

আরেকটা ঘর দেখালেন তিনি, নাম রেখেছেন লিঙ্কন রুম। অন্ধকার, খড়খড়ি লাগানো একটা বন্ধ ঘর। 'এটা তৈরি হয়েছে মেরি টড লিঙ্কনের ঘরের অনুকরণে। তখন তিনি বৃদ্ধা, বিধবা, একলা মানুষ, অনেক দিন আগেই মারা গেছেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন। ওই আয়নাটা মেরির।'

কিশোরের পাশে দাঁড়ানো রাশেদ পাশা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠলেন। 'বড় বেশি বিষণ্ণ ঘর।'

'ঠিকই বলেছেন, খুব বেশি,' একমত হলেন মিসেস মরিয়াটি। 'কিন্তু অনেক বিখ্যাত লোকই আরও বিখ্যাত হয়েছেন বড় বড় দুঃখজনক ঘটনার কারণে।'

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ করেই চেহারা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বিষণ্ণতা। বললেন, 'মেরি অ্যানটয়নের রুমটা ওপরতলায়। ছোট একটা হাতআয়না আর কিছু টুকিটাকি জিনিস আছে আমার কাছে, যেগুলো একসময় রানী ব্যবহার করতেন। এই যে পোশাকটা পরেছি, এটাও রানীর অনুকরণে, তাঁর ছবি দেখে বানিয়েছি।'

'তাই,' মোলায়েম সুরে বলল কিশোর। 'ওটাও কি বিষণ্ণ ঘর?'

'না, তা বোধহয় নয়,' ঠিক নিশ্চিত নন মিসেস মরিয়াটি। 'ওটাতে বসতে পছন্দ করি আমি। তবে রানী কিভাবে মারা গেছেন ভুলে থাকার চেষ্টা করি। আহা, বেচারি, বড় হতভাগী ছিল। চলো, ঘরটা দেখাই। ভারসেইলেস প্যালেসের সেই ঘরটার মত করেই তৈরি। কোন অমিল পাবে না। আমার লেটেস্ট সংগ্রহগুলোও দেখতে পাবে ওখানে।'

'ওটা ঘর না,' ফস করে বলে বসল টুলসা, 'একটা আতঙ্ক।'

'দেখলেই বমি এসে যায়,' বোনের সঙ্গে গলা মেলাল ডন।

'কুৎসিত, এটা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করলেন মিসেস মরিয়াটি, 'কিন্তু তবু ওটা নিয়ে আমার বেশ গর্ব।' কাপড়ের খসখস তুলে প্রায় ছুটে করিডর পেরিয়ে এন্ট্র্যান্স হল পেরোলেন তিনি। রাশেদ পাশা আর তিন গোয়েন্দা তাঁর পিছু পিছু এসে ঢুকল সেই অন্ধকার ঘরটায় যেটা আগেই দেখেছিল। মিসেস মরিয়াটি পর্দাটা সরাতেই বুঝে ফেলল ওরা লাইব্রেরিতে ঢুকেছে। তিন দিকের দেয়ালের র‍্যাক বইয়ে ঠাসা। চতুর্থ পাশের দেয়ালটা, যেটা রাস্তার ধারের, সেটাতে গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেলিং করা। বড় বড় দুটো জানালা রয়েছে তাতে। আর ওদুটোর মাঝখানে বিশাল এক আয়না, একেবারে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা।

আয়নাটাতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। পরিষ্কার প্রতিবিম্ব পড়েছে রাশেদ পাশা আর তার তিন গোয়েন্দার। কোথাও কোন বিকৃতি নেই, এতটুকু নষ্ট হয়নি

ছবি। তবে ফ্রেমটা অদ্ভুত। ধাতুর তৈরি। নানা রকম বিচিত্র প্রতিকৃতি খোদাই করা রয়েছে। জড়াজড়ি করে রয়েছে গাছের শেকড়, তার ফাঁকফোকর দিয়ে মুখ বের করে আছে আজব আজব চেহারা, মানুষের মতই দেখতে অনেকটা, কিন্তু মানুষ নয়। কোন কোনটার শিং রয়েছে কপালে। কোনটার চোখের জায়গায় রয়েছে খুদে গর্ত। কোনটা হাসছে শয়তানী হাসি। ফ্রেমের ওপরের অংশে রয়েছে চোখা কানওয়ালা একটা জীব, একটা সাপকে আদর করছে।

'বাপরে···,' হাত তুলল রবিন, 'কি ওগুলো?'

'স্প্যানিশরা ওকে বলে ট্র্যাসগোস,' মিসেস মরিয়াটি বললেন, 'আমরা বলি গবলিন। ওই আয়নাটা একজন জাদুকরের, নাম শিয়াডো, দুশো বছর আগে মাদ্রিদে বাস করত। সে নাকি ওই আয়নার ভেতর তাকিয়ে ভূতপ্রেত, গবলিনদের দেখতে পেত, ওদের সাথে কথা বলে জেনে নিত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।'

'গবলিনরাও কি ভূত নাকি?' ফ্রেমের ওপরের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, পৃথিবীরই এক ধরনের কল্পিত জীব,' জবাব দিল ডন। 'মনে করা হয়, ওরা বাস করে গুহায়, পড়ে থাকা গাছের নিচের ভেজা মাটির তলায়। জঘন্য সব জায়গায় থাকতে পছন্দ করে ওরা, সে জন্যেই তো সাপ আর কেঁচোর সাথে বন্ধুত্ব।'

'ওয়াক, ওয়াক' শুরু করল টুলসা, বমি করে ফেলবে যেন।

মিসেস মরিয়াটি ওসব কিছু করলেন না, বরং আয়নাটার দিকে তাকিয়ে ভাল লাগছে তাঁর, মুখ দেখেই বোঝা গেল। বললেন, 'এটা আমার খুব প্রিয় আয়না। আমার সমস্ত আয়নারই ইতিহাস রয়েছে, কোনটা আনন্দের, কোনটা বেদনার, কিন্তু এই শিয়াডো আয়নাটার সাথে ওগুলোর কোন তুলনাই হয় না। এটার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। অবশ্য আজকাল তো আর এসব কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।'

মহিলার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। মাথাটাথা খারাপ কিনা ভাবছে বোধহয়।

পেছনে এন্ট্র্যান্স হলে দরজার ঘণ্টা বাজল।

'মনে হয় সিনর পিটাক,' টুলসা বলল। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'স্পেন থেকে এসেছে। দাদীর মতই আয়না জোগাড়ের বাতিক আছে, আয়নার ব্যাপারে উন্মাদ, বিচ্ছিরি এই গবলিন আঁকা আয়নাটা চায়। রোজই আসে, এই সময়ে।'

আবার বাজল ঘণ্টা।

আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন মিসেস মরিয়াটি। তারপর আবার ফিরলেন আয়নার দিকে। 'রোজই আসছে। প্রতিদিন, গত একহপ্তা ধরে। আজ···'

চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'আজ,' কিশোর বলল, 'এই ঘরেই একটা চোর ঢুকেছিল।'

'ঢুকলেও ওই আয়না সরানোর সাধ্য কারও নেই,' বলল ডন। 'ইস্পাতের ওই

ফ্রেমের ওজনই হবে কয়েক মন। ওটাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতে তিনজন লোক লেগেছে।'

চিবুক তুললেন মিসেস মরিয়াটি। বদলে গেছে চেহারা। থমথমে ভাব। অনুরোধের সুরে বললেন, 'মিস্টার পাশা, আপনারা থাকলে ভাল হয়। তিন গোয়েন্দার ব্যাপারে বড় বেশি ভক্তি হ্যানসনের, ওদের কথার খুব মূল্য দেয়। এই সিনর পিটাকের সম্পর্কে ওদের ধারণাটা কি হয় আমার জানা দরকার।'

আবার বাজল ঘণ্টা।

রাশেদ পাশা কিংবা তিন গোয়েন্দার জবাবের অপেক্ষা না করেই ডনকে বললেন মিসেস মরিয়াটি, 'সিনর পিটাককে নিয়ে এসো।'

তিন

সিনর পিটাককে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল ডন। ভারি শরীর লোকটার, কুচকুচে কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ। দামী কাপড়ের হালকা রঙের স্যুট পরেছে। মসৃণ মুখ, বেশ যত্নের ছাপ রয়েছে তাতে। তবে কিছুটা লাল হয়ে আছে, বোধহয় রাগে।

'সিনোরা মরিয়াটি, যদি কিছু মনে না করেন...,' রাশেদ পাশা আর তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ায় যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল তার কথা। ভ্রূকুটি করল। শক্ত হলো ঠোঁট। 'আমি ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম...' আবার থামল। বোধহয় স্প্যানিশ কোন কথার সঠিক ইংরেজি অনুবাদ করার চেষ্টা করছে মনে মনে। 'আমি আশা করেছিলাম আপনার ঘরে কোন মেহমান নেই।'

'বসুন,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'এরা আমার বন্ধু। এই গবলিন আয়নাটা কতটা প্রিয় আমার সেটাই ওদেরকে বলছিলাম এতক্ষণ।'

'মহান শিয়াভোর আয়না,' বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে চেয়ারে বসল সিনর পিটাক। পাশের ল্যাম্প রাখা টেবিলটায় রাখল সাদা কাগজের একটা প্যাকেট। 'একটা অতি চমৎকার আয়না!'

'আসলেই চমৎকার। সিনর পিটাক, আয়না জোগাড় করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কিন্তু আপনার আগ্রহ দেখে সত্যিই আমারও অবাক লাগছে।'

'শিয়াভো আয়নার মালিক হওয়ার জন্যে আগ্রহ হওয়াটা স্বাভাবিক। সিনোরা মরিয়াটি, আপনার সাথে কি আমি একটু একলা কথা বলতে পারব?'

'দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। আমাদের আলোচনার কিছু নেই।'

'আছে, জরুরী আলোচনা আছে,' জোর দিয়ে বলল সিনর পিটাক। সামনে ঝুঁকে এল। আশা করল, বেরিয়ে যাবে সবাই। কিন্তু কেউ গেল না।

'হুঁ,' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকে বেরোতে না দেখে আবার বলল সে, 'বুঝলাম। সবার সামনেই বলতে হবে। বেশ। সিনোরা, আয়নাটার জন্যে একটা দাম আমি বলেছিলাম। আজ আরও বেশি বলতে এসেছি। দশ হাজার ডলার দিতে রাজি আছি আমি। সেই সাথে আমার নিজের সংগ্রহ থেকে একটা আয়না।'

প্যাকেটটা দেখাল সে। 'এখানে একটা ছোট হাতআয়না আছে, পম্পেইয়ের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গিয়েছিল।'

হেসে উঠলেন মিসেস মরিয়াটি। 'এত টাকা আছে আমার, খরচ করায়ই পথ দেখি না। পম্পেইয়ের আয়না নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই, কারণ ওই জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু গবলিন গ্লাস এই একটাই আছে। আর নেই।'

'তা ঠিক,' একমত হলো পিটাক, 'একটাই আছে। সে জন্যেই এটা আমার দরকার।'

'হবে না,' মানা করে দিলেন মিসেস মরিয়াটি।

'দেখুন, আপনি বুঝতে পারছেন না, পাওয়াটা আমার জন্যে খুব জরুরী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পিটাক।

'সারা দুনিয়ায় যদি এই একটি আয়নাই থাকে আয়না সংগ্রাহকের কাছে সেটা তো জরুরী হবেই। আপনার মত আমার কাছেও এটা জরুরী। আমার চেয়ে আপনার সংগ্রহ উন্নত করতে দেব কেন আমি?'

'সিনোরা, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি!' গলা চড়িয়ে বলল পিটাক। হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে।

সোজা হয়ে বসলেন মিসেস মরিয়াটি। 'সাবধান করছেন?' কঠোর হলো তাঁর দৃষ্টি। 'সিনর পিটাক, আজ এঘরে একটা চোর ঢুকেছিল। জানেন সে খবর?'

রক্ত সরে গেল পিটাকের মুখ থেকে। ফ্যাকাসেই হয়ে গেল বলা চলে। আয়নার দিকে তাকাল একঝলক। 'এই ঘরে? কিন্তু···না না, আমি কি করে জানব?'

'জানার কোন উপায় নেই,' মিসেস মরিয়াটি বললেন, 'এটা অবশ্য ধরে নিচ্ছি আমরা।'

মেঝের দিকে দৃষ্টি নেমে গেল পিটাকের, তারপর উঠে এল নিজের হাতের দিকে। 'দেখা গেছে ওকে? এঘরে?' মুখ তুলে মলিন হাসি হাসল সে। 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। খবরের কাগজে পড়েছি এখানে দিনদুপুরেও নাকি চোর ঢোকে লোকের বাড়িতে, খালি কিংবা পুরানো বাড়ি পেলে তো আর কথাই নেই। যাই হোক, সিনোরা, আমি আশা করছি পুলিশ ওকে ঠাণ্ডা করে ফেলবে আর যাতে লোকের বাড়িতে কোনদিন না ঢোকে।'

'চোরটা পালিয়েছে।'

'তাই?' এমন ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল পিটাক, যেন বিরাট এক সমস্যায় পড়ে গেছে। বলল, 'সিনোরা, এই চোরটার ব্যাপারে কোন সাহায্যই আমি করতে পারছি না আপনাকে, সরি। তবে একটা কথা বলতে পারি, চোর যদি ঢুকেও থাকে আয়না নেয়ার মতলবে, ছোটখাট একজন লোকের পক্ষে শিয়াডো মিরর নিয়ে পালানোটা অসম্ভব। একা তুলতেই পারব না। আপনাকে আমি চোরের ব্যাপারে সাবধান করিনি। আমি বলছি, আয়নাটা বিপজ্জনক।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস মরিয়াটি।

'আসলে, সব কথা আমি সত্যি বলিনি আপনাকে,' গাল চুলকাল পিটাক। 'আমি সংগ্রাহক নই। এই যে পম্পেইয়ের আয়নাটা, এটা গতকাল বেভারলি হিলের

এক দোকানদারের কাছ থেকে কিনেছি।'

'দাম নিশ্চয় খুব একটা বেশি দেননি,' মিসেস মরিয়াটি অনুমান করলেন।

'বুঝতে পারছি এটা দিয়ে হবে না। আসল কথাটাই বলতে হচ্ছে এখন।'

সন্দেহ জাগল মিসেস মরিয়াটির চোখে। 'আসল কথা?'

'আগে শিয়াভো গ্লাসের গল্প বলি, তাহলেই বুঝবেন।'

'ওই গল্প আমার জানা।'

'সব কথা জানেন না,' রাগ চলে গেছে পিটাকের চেহারা থেকে। শান্ত, মোলায়েম স্বরে বলতে লাগল, 'অনেক বড় জাদুকর ছিল শিয়াভো। নিজে নকশা এঁকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছিল আয়নাটা। অনেক মন্ত্র ঢুকিয়ে ছিল এর মধ্যে। আয়নার ভেতর দিয়ে দেখতে পেত সে। মাটির নিচে যারা বাস করে, যেসব অদৃশ্য জীবেরা, যাদের আমরা দেখতে পাই না, তাদের সাথে কথা হত তার। তারা তাকে অনেক আগাম খবর জানিয়ে দিত। তারপর একদিন, হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেল শিয়াভো।'

'জানি,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'আয়নাটা ফেলে গেল মাদ্রিদের এসটানসিয়া নামে একটা পরিবারের কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল পিটাক। 'শিয়াভোর অনেক শত্রু ছিল। তারা তাকে ভয় করত। ভাবত, যে কোন সময় জাদুকর তাদের ক্ষতি করে বসতে পারে। তাই কোনদিন ভুলেও জানায়নি কাউকে এসটানসিয়া তার নিজেরই পরিবার, তার স্ত্রী, তার ছেলে। সেই ছেলের একটা ছেলে হয়েছিল, এবং তার একটা মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পরিবারের নামটাই মুছে গেল। হারিয়ে গেল এসটানসিয়া। কিন্তু আয়নাটা হারায়নি, রয়ে গেল ওদের কাছে। অর্থাৎ মেয়েটার কাছে। তারপর বছর চল্লিশেক আগে, আমার জন্মের আগে, শিয়াভোর এই মহান আয়না চুরি হয়ে গেল। অনেক টাকায় বেচে দিয়েছিল সেটা চোর। খোঁজ করতে করতে তাকে বের করে ফেলেছিল আমার বাবা...'

'আপনার বাবা?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস মরিয়াটি। 'বলতে চাইছেন, আপনি শিয়াভোর বংশধর?'

মাথা নুইয়ে বাউ করল পিটাক। 'হ্যাঁ। বেঁচে থাকা একমাত্র বংশধর। আমার বাবা মারা গেছে। কেবল আমি বেঁচে আছি। কাজেই আয়নাটা আমার চাই। আমার ছেলেকে দিয়ে যাব।'

চুপ হয়ে গেছেন মিসেস মরিয়াটি। চিন্তিত।

'চোরটার খোঁজ যদি পেয়ে গিয়ে থাকেন আপনার বাবা,' বললেন তিনি, 'তাহলে এত বছর ধরে আয়নাটা ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন না কেন?'

'কারণ চোরটা মরে গিয়েছিল, আর আয়নাটা চলে গিয়েছিল আরেক শয়তানের হাতে। বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাছেই কেবল এটা নিরাপদ। আমরা এর রহস্য জানি। কি করে এটা ব্যবহার করতে হয় জানি। এবং ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ জানতে পারব।'

'কাজের জিনিস,' বিড়বিড় করলেন মিসেস মরিয়াটি।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু যাদের শরীরে শিয়াভোর রক্ত নেই তাদের কাছে এটা থাকলে

বিপদ। যে লোকটা আমার বাবার কাছ থেকে এটা চুরি করেছিল, খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে তার বাড়িতে তাকে মরা পেয়েছে বাবা। কপালে একটা জখম ছিল, পোড়া ঘায়ের মত। আয়নাটা পাওয়া গেল না। আবার খুঁজতে লাগল বাবা। শুনল, বার্সেলোনার এক লোকের কাছে আছে। গেল তার কাছে। যেতে দেরি করে ফেলল এবারেও। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটা। বাড়ির মালিক অনেক টাকা ভাড়া পেত তার কাছে, আয়নাটা বিক্রি করে দিয়ে কিছুটা আদায় করল। আয়নাটা যে কিনল...'

'সে-ও গলায় দড়ি দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মরিয়াটি।

'না। ট্রেন দুর্ঘটনায় মরেছে। বাবা গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই শেষ। সেই লোকের ছেলে আয়নাটা দিয়ে দিল তার এক বন্ধুকে, আয়না নিয়ে মাদ্রিদে চলে গেল বন্ধু। ছেলেটা বাবাকে জানাল, মরার আগে নাকি আয়নার ভেতরে একটা ছায়া দেখেছিল তার বাবা। ছবি, কিংবা প্রতিবিম্ব, যা-ই বলেন। একজন লোক। লম্বা সাদা চুল, চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের জ্বলজ্বলে, আর সবুজ। আমরা জানি কোথায় হারিয়েছিল শিয়াভো, কেন আর ফেরেনি। ঢুকেছিল ওই আয়নার মধ্যে, অন্ধকারের জগতে, যেখানে প্রেতাত্মা আর অদ্ভুত জীবেদের বাস। এখনও ওখানেই আছে সে। তবে মাঝে মাঝে এসে আয়নার ভেতর থেকেই উঁকি মেরে দেখে যায়।'

গলার কাছে হাত উঠে গেছে মিসেস মরিয়াটির। 'শিয়াভো...ওই আয়নার ভেতরে ঢুকে গেছে?'

'অ্যালিসের মত,' ফিসফিসিয়ে বলল টুলসা।

'আমি...আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' মিসেস মরিয়াটি বললেন।

'বিশ্বাস করার কথাও নয়,' পিটাক বলল। 'পরের কাহিনী শুনুন। মাদ্রিদে নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রের কাছে আয়নাটা বিক্রি করে দিল লোকটা। ছাত্রের নাম দিয়েগো পিলভারেজ। দিন কয়েক পরেই নিজের জন্মভূমিতে ফিরে এল সে। তার বাড়ি রাফিনোর একটা ছোট্ট দ্বীপে। দেশটার নাম হয়তো শুনেছেন। বিয়ে করল যাকে, সেই মহিলা আপনার বান্ধবী। আয়নাটার কথা আপনার বান্ধবী কি বলেন?'

'ভাল বলে না। পছন্দও করে না,' মিসেস মরিয়াটি জবাব দিলেন। 'বলে কুৎসিত। আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তবে তার স্বামীর দেয়ার ইচ্ছে ছিল না কখনোই। কই, দুজনের একজনও তো বলেনি আয়নার ভেতরে কিছু দেখেছে? তিরিশ বছর ধরে আয়নাটা ছিল পিলভারেজের কাছে, অপঘাতেও মরল না, ভূতটূতও দেখল না ভেতরে।'

সামনে ঝুঁকল পিটাক। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল, এতটাই নামাল, শোনার জন্যে কান খাড়া করতে হলো কিশোরকে। 'আমি বলছি, আয়নাটা অভিশপ্ত। যাদের শরীরে শিয়াভোর রক্ত নেই তারা এর মালিক হলে বিপদে পড়বেই।

'কিন্তু দিয়েগো পিলভারেজের কোন ক্ষতি হয়নি,' মিসেস মরিয়াটি প্রতিবাদ করলেন। 'বরং একজন অত্যন্ত সফল মানুষ হিসেবেই মারা গেছেন। রাফিনোর প্রেসিডেন্টের অ্যাডভাইজার ছিলেন তিনি।'

'হয়তো অভিশাপটা পড়েছে গিয়ে তার স্ত্রীর ওপর,' পিটাকের কালো চোখ

মিসেস মরিয়াটির ওপর স্থির, পলকহীন। 'সিনর মরিয়াটি, আপনার বান্ধবীর সব খবরই তো আপনি রাখেন। তিনি কি পিলভারেজকে বিয়ে করে সুখী হয়েছেন?'

আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন মিসেস মরিয়াটি। 'না, তা অবশ্য বলা যায় না। স্বামী বেঁচে থাকতে কখনোই সুখী ছিল না ইসাবেলা। সব সময় তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে পিলভারেজ। কিন্তু এখন সে মৃত...'

'আর মরার পর-পরই তার বিধবা স্ত্রী কি করলেন? প্রথম কাজটি সারলেন, আয়নাটা বিদায় করে দিয়ে। আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচলেন।'

'না, বাঁচলেন কথাটা ঠিক নয়,' মেনে নিতে পারলেন না মিসেস মরিয়াটি। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জাগলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানত, আয়নাটার ওপর আমার লোভ আছে। স্বামী বেঁচে থাকতে দিতে পারেনি, মৃত্যুর পর দিয়েছে। সিনর পিটাক, আপনার গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আয়নার ভেতরে কোন মানুষ ঢুকে হারাতে পারে না। তবে, আপনি যদি শিয়াভোর বংশধর হয়েই থাকেন, দলিলপত্র নিশ্চয় আছে, বার্থ সার্টিফিকেট আর বিয়ের রেকর্ড আছে। আয়নাটা আপনার পরিবারের সম্পত্তি হলে আমি সেটা দখল করে রাখতে চাই না। দিয়ে দেব। তবে আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আপনি শিয়াভোর বংশধর।'

পিটাকও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে তুলে নিল প্যাকেটটা। 'আয়নাটা খুঁজে বের করতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমার বাবা খুঁজতে খুঁজতে মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা, তারপর আবার মাদ্রিদে গিয়েছিল। আমিও কম খোঁজাখুঁজি করিনি, রাফিয়ানো পর্যন্ত গিয়েছি। পিলভারেজের বাড়ি খুঁজে বের করেছি। আয়নাটা ততদিনে সরানো হয়ে গেছে। সেখান থেকে এখানে এসেছি। সামান্য দলিলপত্রের জন্যে এটা আর আমি হাতছাড়া করতে পারব না। তবে কিছুটা সময় লাগবে। স্পেনে খবর পাঠিয়ে যদি আনতে পারি, ভাল, নইলে আমার নিজেকেই যেতে হবে।'

'আমি অপেক্ষা করব,' কথা দিলেন মিসেস মরিয়াটি।

'সিনোরা, অপেক্ষাটাই না আপনার বিপদের কারণ হয়ে যায়, সেই ভয় করছি। সাবধানে থাকবেন। আয়নাটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল পিটাক। সদর দরজা খুলে আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল।

'কি এক গল্প শুনিয়ে গেল!' মুসার গলা কাঁপছে।

'চমৎকার একটা ভূতের গল্প,' বলল কিশোর।

'মিছে কথাই বলেছে,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। যেন নিজেকেই বিশ্বাস করাতে চাইছেন কথাটা। 'আয়নার ভেতরে ঢুকে মানুষ হারাতে পারে না। শিয়াভোর বংশধর কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। যদি হতই, তাহলে এক হপ্তা আগে যখন এল, এসেই কেন বলল না সেকথা?'

'হয়তো,' কিশোর বলল, 'ভেবেছিল, সহজেই নিয়ে নিতে পারবে। বেশি টাকা দিলেই আপনি বিক্রি করতে রাজি হয়ে যাবেন। তা যখন হলেন না, আসল কথাটা ফাঁস করতেই হলো তাকে।' তবে কিশোরের কণ্ঠ শুনে মনে হলো, কথাটা সে নিজেও বিশ্বাস করে না।

চার

মিসেস মরিয়াটিকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড দিয়ে কিশোর বলল, 'আমাদের নাম-ঠিকানা টেলিফোন নম্বর সবই আছে এতে। কোন প্রয়োজন হলেই একটা রিঙ করবেন। আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে খুশি হব।'

কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই কার্ডটা নিলেন মরিয়াটি। নিয়ে দু'ভাঁজ করে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'আয়নার ভেতর ঢুকে মানুষ হারিয়ে যেতে পারে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'কাগজপত্র তো আনতেই বলেছেন সিনর পিটাককে, দেখা যাক কি আনে?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস মরিয়াটি। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা আর রাশেদ পাশা। তাদেরকে এগিয়ে দিতে এসে বিশাল বিষণ্ণ বাড়িটার এন্ট্র্যান্স হলে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি আনমনা হয়ে, পাশে তাঁর নাতি-নাতনী। ক্লান্ত লাগছে তাঁকে। বিধ্বস্ত লাগছে পুরানো দিনের পোশাকে। এখন আর তেমন সাহসী মহিলা মনে হচ্ছে না তাঁকে, তিন গোয়েন্দা প্রথম যেমন দেখেছিল। মেরি অ্যানটয়নেটের সাজ ও আয়না আর পুলকিত করতে পারছে না।

'বাড়ি তো না, একটা ভূতের বাসা!' মুসা বলল, 'সারাক্ষণ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।'

ইয়ার্ডের দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক।

জবাব দিল না কিশোর। দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। হাঁটুর ওপর রাখা দুই হাত, চোখ বোজা।

'কি ভাবছ কিশোর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'উঁ?' চোখ মেলল কিশোর। 'ঠিক বুঝতে পারছি না··· পিটাকের কথা···কিছু একটা ভুল···'

'ভুল কথা অনেকই বলেছে সে,' বলল মুসা। 'গলা কেটে ফেললেও বিশ্বাস করব না আয়নার ভেতরে ঢুকে হারিয়ে যেতে পারে মানুষ। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে ভয় দেখানোর জন্যে। ইমপসিবল!'

'বিশ্বাস কি আর আমিও করছি নাকি? হতে পারে, শিয়াভোর ব্যাপারে কোন কিংবদন্তী রয়েছে। কিংবা বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলে দিয়েছে সিনর পিটাক মিসেস মরিয়াটিকে ভয় দেখানোর জন্যে।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'আমি ভাবছি ওই আয়না তিরিশ বছর ধরে খুঁজে না পাওয়ার ব্যাপারটা। কি করে হয়? প্রেসিডেন্টের একজন অ্যাডভাইজার লুকিয়ে কিংবা আত্মগোপন করে থাকে না। আয়নাটা দিয়েগো পিলভারেজের কাছে এতগুলো বছর ছিল, না জানার তো কথা নয় কারও?'

'এটা ঠিক বললে না,' কিশোর বলল। 'কারও কাছে কোন জিনিস থাকলেই যে সেটা বাইরের লোকের জানতে হবে, হোক না লোকটা পাবলিক ফিগার, এমন কোন কথা নেই। রাফিনোর কথাও খবরের কাগজে দেখা যায় না তেমন। তুমি

তো প্রচুর পড়ো, তোমার চোখে পড়েছে?'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

'ওই ধরনের দেশ সাধারণত খবরের কাগজের নিউজ হয় না। ওখান থেকে একটা আয়না খুঁজে বের করতে তিরিশ-চল্লিশ বছর লেগে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। আমি ভাবছি চোরটা দেখতে কেমন সেটা পিটাক জানল কি ভাবে? বলল না, একজন মানুষ, একজন ছোটখাট মানুষের পক্ষে শিয়াভো মিরর বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব? চোরটা দেখতে কেমন আমরা কেউ তাকে বলিনি। অথচ ঠিক ঠিক বলে দিল ছোটখাট মানুষ।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'তুমি আসলে মানুষ না, মেশিন! মাথার মধ্যে টেপরেকর্ডার পোরা আছে। মনে রাখো কি করে? সেটা কথার কথাও হতে পারে। অতবড় একটা আয়নার কাছে যে কোন মানুষই ছোট, হয়তো সেইটাই বোঝাতে চেয়েছে। ইংরেজি তেমন গুছিয়ে বলতে পারে বলে তো মনে হলো না। তোমার কি মনে হচ্ছে? চোর ঢোকার সঙ্গে পিটাকের কোন সম্পর্ক আছে?'

'চোর ঢুকেছিল শুনে অবাক হয়েছে পিটাক, এবং সেটা ভান ছিল না,' কিশোর বলল। 'চমকে গিয়েছিল। চোর ঢোকার সঙ্গে তার সম্পর্ক তো অবশ্যই আছে, সে ভয় পেয়েছে আয়নার ব্যাপারে আরও আগ্রহী লোক আছে জেনে। চোরের খবরটা জানার পরই নিজেকে শিয়াভোর বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছে। যতভাবে সম্ভব তাড়াতাড়ি আয়নাটা হাত করার জন্যে। না, আমার মনে হয় না চোরের সাথে যোগসাজস আছে পিটাকের। তবে হতে পারে, শুনেই আন্দাজ করে ফেলেছে চোরটা কে। যাই হোক, আমি স্থির নিশ্চিত, আয়নার খবর আসবেই আমাদের কাছে।'

'আমি আর শুনতে চাই না ওটার খবর,' হাত নেড়ে বলল মুসা।

কিশোর হাসল। এই হাসির অর্থ তার দুই বন্ধুরই জানা। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। সেটার সমাধান করার জন্যে উতলা হয়ে উঠছে। 'তৈরি থাকতে হবে আমাদের,' ঘোষণা করে দিল সে। 'স্পেন থেকে কাগজপত্র আনতে কমপক্ষে এক হপ্তা লাগবে পিটাকের। ততদিনে তৈরি হয়ে যেতে পারব আমরা।'

'কি নিয়ে?' মুসার প্রশ্ন।

'তথ্য,' কিশোরের গলায় খুশির সুর। 'রাফিনোর ব্যাপারে খোঁজখবর করতে হবে আমাদের। শিয়াভোর কথা জানতে হবে। মিসেস মরিয়ার্টি বলেছেন, ওই লোকটা মস্তবড় জাদুকর ছিল। এত বিখ্যাত একজন লোকের কথা আমি শুনিনি, অবাকই লাগছে। সময় নষ্ট না করে কাজে নামতে হবে আমাদের, যাতে সময় আসতে আসতে তৈরি হয়ে যেতে পারি।'

কিশোরের অনুমান ভুল হলো না। মরিয়ার্টি হাউস থেকে তিন গোয়েন্দা আসার ঠিক সাতদিন পর বাসে করে রকি বীচে এসে হাজির হলো ডন কারনেস। দুপুর পেরিয়ে গেছে তখন। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল সে। আউটডোর ওঅর্কশপে বসে পুরানো ছাপার মেশিনটার ছোটখাট কয়েকটা মেরামত করছে তখন কিশোর। ডনকে দেখেই হাতের কালি একটা ন্যাকড়ায় মুছে উঠে দাঁড়াল সে।

জিজ্ঞেস করল, 'সিনর পিটাকের খবর পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল ডন। কিশোরের সুইভেল চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'না।'

মুসা এসে ঢুকল সেখানে। ইস্তিরি করা একটা পরিষ্কার শার্ট গায়ে দিয়েছে। মাথার চুল ভেজা ভেজা। ডনকে দেখে বলল, 'আরে, ডন যে!'

'সার্ফিং কেমন করলে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ঢেউটেউ কেমন?'

'খুব ভাল,' একটা কাঠের বাক্স টেনে এনে তার ওপর বসল মুসা। 'অনেক বড় বড় ঢেউ উঠেছে আজ, পাহাড়ের মত। আমারও খুব মজা হলো। তিন তিন বার চিত করে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। ঘাড় যে ভাঙেনি এটাই বেশি।'

হেসে উঠল ডন। 'হ্যানসনের কাছে শুনেছি তোমার দুঃসাহসের কথা। কেবল ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে যাও।'

মুসাও হাসল। 'আগে সব কিছুর ভয়েই কাবু হতাম। রোগগুলো সব কিশোর ছাড়িয়েছে। কেবল এই ভূতপ্রেতগুলোকে কলা দেখানোর সাহস করতে পারছি না আজও।'

'ওটাও কাটাতে হবে তোমাকে,' কিশোর বলল। 'যা নেই সেটার ভয়ে কাবু হয়ে থাকার কোন মানে হয় না।' ডনের দিকে তাকাল সে। 'মনে হচ্ছে, জরুরী কিছু বলতে এসেছ আমাদেরকে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত শোনাল ডনের কণ্ঠ। 'সিনর পিটাকের কাহিনী তো সেদিন শুনলে, আয়নার ভেতর দিয়ে গবলিনের দেশে চলে গিয়েছে বুড়ো জাদুকর।'

'রূপকথা,' কিশোর বলল। 'তো, নতুন কি ঘটল? পিটাকের খবর নাকি আর পাওনি। তার মানে সে যে শিয়াভোর বংশধর এটা প্রমাণের জন্যে কাগজপত্র নিয়ে আসেনি।'

'না, আসেনি। প্রমাণ করতে পারলে আয়নাটা পেয়ে যাবে। আমার নানী সব সময় ঠিক কাজটাই করতে চায়। তবে সেটা করতে গিয়ে বোকা বনতে চায় না। বানিয়ে বানিয়ে একটা ভয়ের গল্প বলে দিল পিটাক, আর সেটা শুনেই ভয় পেয়ে গিয়ে আয়নাটা তাকে দিয়ে দেবে তেমন মানুষ আমার নানী নয়। যাই হোক, হ্যারির সাথে পরিচয় হয়েছে তোমাদের।'

'হ্যারি কোলাস? তোমাদের হাউসম্যান? তার কি হয়েছে?'

'খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ। বহু বছর ধরে আছে নানীর কাছে, কখনও ওকে এরকম উত্তেজিত হতে দেখিনি। তার কাজ সে করে গেছে, রান্নাবাড়া, ঘর দেখাশোনা, এসব। যখন কাজ থাকে না, বসে বসে গিটার বাজায়। হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছে কিছুদিন। ওর বাপ চেয়েছে ছেলে উকিল হোক, কিন্তু ছেলে চেয়েছে সে ক্ল্যাসিক্যাল গিটার বাদক হবে।'

'তাতে কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, তাতে কিছু না। বলছি, ওরকম একজন মানুষ, যে কোন কিছুতেই উত্তেজিত হয় না, ইদানীং হতে আরম্ভ করেছে। কি কি সব নাকি শোনে। আর ওর কথা কি বলব? আমিও শুনেছি।'

চুপ করে আছে মুসা আর কিশোর।

'কাল রাতে একটা শব্দ শুনলাম,' ডন বলল, 'মনে হলো কেউ হাসছে। বিছানা থেকে উঠে নিচতলায় নামলাম। সামনের দরজা বন্ধ, তালা দেয়া, শুতে যাওয়ার আগে যেমন করে লাগিয়ে যাই তেমনি রয়েছে। লিভিং রুমের আলো জ্বেলে দেখলাম সবই ঠিক আছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরছি, হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে কিছু দেখলাম মনে হলো। লাইব্রেরিতে কেউ যেন ঢুকল। গেলাম সেখানে। আলো জ্বাললাম। কিছুই দেখলাম না। হলে ফিরে এসে দেখি ইয়াবড় এক ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। চোখে আজব দৃষ্টি। ওই অবস্থায় ওকে ওভাবে ছুরি হাতে দেখে ভয়ই পেয়ে গেলাম।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

'বোকার মত একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এই সময় দু'জনেই শুনতে পেলাম আবার হাসি। লাইব্রেরি থেকে এসেছে, যে ঘরে আয়নাটা রয়েছে। বুলেটের মত ছুটে গেল সেখানে হ্যারি। কাউকে দেখল না। কিছুই না। কিচ্ছু না। কেবল চারটে দেয়াল, গাদা গাদা বই আর আয়নাটা।'

চোয়াল ডলল মুসা। 'তুমি বলতে চাইছ আয়নাটা ভুতুড়ে?'

'জানি না। বাড়িটা ভুতুড়ে একথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে লোকে বলে ভূত আছে। দেখলে মনে হয় কিছু আছে, কিন্তু আমরা কেউ কখনও কিছু দেখিনি। আমি, নানী, হ্যারি, টুলসা, কেউ না। প্রতি বছরই গরমের সময় শিকাগো থেকে নানীর কাছে চলে আসি আমরা দুই ভাইবোন।'

'মজার একটা বাড়ি,' কিশোর বলল। 'ওটা সম্পর্কে বেশ কিছু আর্টিক্যাল পড়েছি আমি। থিয়েটার থেকে অবসর নেয়ার পর ওই বাড়ি তৈরি করে টেরিয়ানো। ভূতপ্রেতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বন্ধুদেরকে দাওয়াত করে আনত ওই বাড়িতে, ম্যাজিক দেখাত। বারো বছর আগে মারা গেছে সে। এরপর যারা বাড়িটা কিনল, কয়েকবার নাকি টেরিয়ানোর ভূতকে ওখানে দেখেছে তারা।'

'রাতে ওরা শব্দ শুনতে পেয়েছে,' ডন যোগ করল। 'কিন্তু নানী তো দশ বছর ধরে আছে ওখানে, কিছুই শোনেনি কখনও। সে বলে, ওসব লোকের কল্পনা। কিন্তু এখন যে হ্যারি শুনল, আমিও শুনলাম। ভূত বিশ্বাস করে না হ্যারি, তবে ভীতু স্বভাবের লোক। আমাকে বলেছে, বিছানায় ওই ছুরিটা সাথে নিয়ে শোয়। নানীকে কিছু বলতে মানা করে দিয়েছে আমাকে। তাকে ঘাবড়ে দিতে চায় না। তবে আমার ধারণা, নানীও শুনতে পেয়েছে।'

'কিছু বলেছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, বলেনি। অনুমানে বুঝলাম। আমি হ্যারি আবার শুতে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। নানীর ঘরের দরজা খুলতে শুনে উঠে দেখতে গেলাম। দেখলাম, নিচের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। ভীষণ চমকে গেল নানী। যখন দেখল আমি দাঁড়িয়ে আছি, তখন শান্ত হলো। বলল, কিছু না। ঘুম আসছিল না, তাই সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে ঘরে যেতে বলল। আমি জানি, নানীর ঘুমের অসুবিধে নেই। নিশ্চয় কিছু শুনেছে।'

'ভয় পেয়েছিলেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না। কিছুই বলেনি আমাকে। তবে আমি শব্দ শুনেছি, আমার বিশ্বাস নানীও শুনেছে। ওরকম অদ্ভুত ঘটনা আগে আর ঘটেনি বাড়িটাতে, আমাদের সামনে। ওটা ভূত নয়। অন্য কোন ব্যাপার। তোমরা তো গোয়েন্দা। আয়নার রহস্যের সমাধান করতে পারবে? নানী তেমন কিছু জানে না। তার বান্ধবী তাকে যা বলেছেন কেবল সেটুকুই।'

'পিলভারেজের বিধবা স্ত্রী,' আনমনে বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল ডন। 'ছোটবেলায় নানী যখন বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়ে, যখন রাফিনো থেকে আসা একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় তার। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের ছোট্ট একটা দেশের দ্বীপ থেকে এসেছিল মেয়েটা। সঙ্গতি আছে ওখানকার এরকম কিছু পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল। লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে গেল মেয়েটা; পিলভারেজকে বিয়ে করল। নানীর সাথে তার যোগাযোগ নষ্ট হলো না। দু'বার বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্যে রাফিনোতেও গিয়েছিল নানী। মহিলা বলতেন, তাঁর স্বামী লোকটা ভাল না, তাঁর বান্ধবীদের সাথেও খারাপ ব্যবহার করে। যাই হোক, হঠাৎ করেই দ্রুত উন্নতি করে ফেলল লোকটা। প্রেসিডেন্টের অ্যাডভাইজার হয়ে গেল। মাসখানেক আগে সে মারা গেছে। সিনোরা পিলভারেজ তখন আয়নাটা নানীকে পাঠিয়ে দেন। আমরা জানি, আয়নাটা স্পেন থেকে নিয়ে এসেছিল পিলভারেজ। শিয়াভো নামে এক জাদুকরের আয়না ওটা। লোকটা নাকি আয়নার সাহায্যে গবলিনদের সাথে কথা বলতে পারত। এর বেশি আর কিছু জানা নেই আমাদের।'

'তবে জেনে যাব,' কিশোর বলল। 'আশা করি খুব শীঘ্রি শিয়াভো আর তার আয়নার ব্যাপারে নতুন কিছু জানাতে পারব তোমাদের। আয়নাটার ব্যাপারে আমাদেরও কৌতূহল আছে। সে জন্যেই আমি আর রবিন কয়েকদিন ধরে খোঁজ-খবর করছি। রকি বীচ লাইব্রেরিতে কিছু পাইনি। গেলাম ইউনিভার্সিটি অভ ক্যালিফোর্নিয়ার লাইব্রেরিতে। পেলাম না।

লস অ্যাঞ্জেলেস লাইব্রেরিতেও কিছু না পেয়ে শেষে আজ সকালে রবিনকে পাঠিয়েছি রুক্সটন ইউনিভার্সিটিতে অ্যান-থ্রপলজির প্রফেসর ডক্টর জন স্মিথের কাছে। আধিভৌতিক ব্যাপারের তিনি বিশেষজ্ঞ। আগেও সাহায্য করেছেন আমাদেরকে। মনে হলো, শিয়াভোর কথা তিনি জানতে পারেন, তাই রবিনকে পাঠিয়েছি। সে ফিরে এলে...'

'আমি এসেছি,' বলতে বলতে ওঅর্কশপের দরজায় এসে দাঁড়াল রবিন। গাড়িটা খারাপ হয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে, তাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। সেটা হেলান দিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে। 'একেবারে সময়মত হাজির হয়ে গেছি দেখা যাচ্ছে। ডন, কেমন আছ?'

'ভাল,' জবাব দিল ডন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কিছু জানতে পারলে?'

'নিশ্চয়। রুক্সটন ইউনিভার্সিটি একটা সাংঘাতিক জায়গা। দুনিয়ার এমন কোন খবর নেই পাওয়া যায় না। ডক্টর স্মিথ শিয়াভোর কথা শুধু শোনেননি, তার

ওপর দুটো আর্টিকেলও লিখেছেন। পুরানো কাহিনীতে জানা যায়, অনেক বড় জাদুকর ছিল শিয়াভো, তার আয়নাটারও নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বলা হয়, শিয়াভো মারা যায়নি। আয়নার ভেতর দিয়ে চলে গেছে প্রেতাত্মাদের জগতে। পিটাক যা বলেছে।'

চুপ হয়ে গেল চার কিশোর। ভাবছে এক অদ্ভুত কিংবদন্তীর কথা। আয়নার ভেতর দিয়ে ঢুকে গেছে এক বৃদ্ধ জাদুকর, হয়তো এখন বাস করছে অপার্থিব এক জগতে, যেখানে মানুষের বাস নেই। হঠাৎ করেই আলো কমে এল, ধূসর হয়ে গেল দিনের রঙ। নড়েচড়ে উঠে মুখ তুলে তাকাল মুসা। 'মনে হয় ঝড় আসবে।' কোন কারণ ছাড়াই ফিসফিস করে বলল সে কথাটা।

ছাপাখানার ওপরে একটা লাল আলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করল।

উঠে গিয়ে দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরাল কিশোর। ট্রেলারের চারপাশে আবার জঞ্জালের পাহাড় জমে উঠেছে। এই দিন কয়েক আগেও যেমন সরাসরি ঢুকে যাওয়া যেত হেডকোয়ার্টারে এখন আর তেমন যায় না। গুপ্ত পথগুলো ব্যবহার করতে হয়। ঢাকনা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল মোটা একটা পাইপের মুখ।

সেটার দিকে তাকিয়ে ডন জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

বাতিটার জ্বলা-নেভা থেমে গেল। রবিন বলল, 'এই আলোর সংকেতের মানে হলো হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজছে। ওই পাইপের মুখটা একটা গুপ্তপথ। কিশোর যাচ্ছে টেলিফোন ধরতে। তুমি যে এখানে এসেছ তোমার নানী জানে?'

'আমার বোন জানে।'

'তাহলে সে-ই হবে। চলো, দেখি।'

কিশোর আগেই ঢুকে গেছে। রবিন আর মুসার দেখাদেখি ডনও চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতরে। নিচে কার্পেট পাতা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে মোটেও কষ্ট হলো না। পাইপের শেষ মাথায় পৌঁছে ট্র্যাপডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল মুসা আর রবিন। ওটা খোলা রেখেই নিচে তাকিয়ে রবিন ডাকল ডনকে, 'এসো।'

কিশোর দাঁড়িয়ে আছে তার ডেস্কের কাছে। কানে রিসিভার ধরা।

'কতক্ষণ আগে?' তাকে প্রশ্ন করতে শুনল অন্য তিনজন।

চারপাশে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে ডন। নানা রকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘরটা। চেয়ার, টেবিল, ফাইলিং কেবিনেট সব আছে। টেবিলে রাখা একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র, আর নানা ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র, গোয়েন্দাগিরিতে ওগুলো কাজে লাগে তিন গোয়েন্দার।

'মনে হয় ঠিকই করেছ,' রিসিভারে বলল কিশোর। 'আমাদের সাধ্যমত আমরা অবশ্যই করব। দরজায় তালা দিয়ে রাখো।'

রিসিভার রেখে দিল সে।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

রবিনের কাঁধের ওপর দিয়ে ডনের দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমার বোন। মিনিট পনেরো আগে বাজার সেরে ফিরেছে টুলসা আর তোমার নানী। দোতলায় উঠেই শুনতে পেয়েছে নিচে লাইব্রেরিতে হাসির শব্দ। তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে

সিঁড়ি বেয়ে। মাঝপথে থাকতেই দেখে লাইব্রেরির আয়নাটার ভেতরে একজন মানুষ। ফ্যাকাসে মুখ, সাদা চুল, সবুজ চোখ।'

'শিয়াভো!' বলে উঠল ডন।

'আমাদেরকে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছেন তোমার নানী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখান থেকে আমাদেরকে তুলে নেবে হ্যানসন।'

পাঁচ

আধ ঘণ্টার আগেই ইয়ার্ডে পৌছে গেল হ্যানসন। ছেলেদেরকে তুলে নিয়ে দ্রুত চলল মরিয়ার্টি হাউসে।

'অনেকক্ষণ হলো বেরিয়েছি,' হ্যানসন জানাল। 'তোমাদের পৌছে দিয়ে অফিসে গাড়িটা ফেরত দিয়ে বাড়ি যাব। সাহায্যের দরকার হলে আমাকে ফোন করো।'

'করবো,' বলল কিশোর।

মরিয়ার্টি হাউসে পৌছে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল হ্যানসন। ডনের পিছু পিছু দরজার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। নিশ্চয় কান পেতে ছিল টুলসা। বেল বাজানোর আগেই দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল ছেলেরা। এনট্র্যান্স হলে একটা চেয়ারে বসে আছেন মিসেস মরিয়ার্টি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন লাইব্রেরির দিকে। রক্তশূন্য চেহারা। টুলসা দরজায় তালা না দেয়া পর্যন্ত নড়লেন না। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'ওখানে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না আমার। তবে কড়া নজর রেখেছি। কেউ বেরোতে পারেনি।'

'আয়নায় লোকটাকে দেখার পর থেকেই চোখ রাখছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একবারের জন্যেও সরাইনি।' কপালে এসে পড়া একগাছি চুল সরালেন মিসেস মরিয়ার্টি। হাত কাঁপছে তাঁর পরিষ্কার দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।

'তোমাদেরকে ফোন করেই নানীকে একটা চেয়ার এনে দিয়েছি বসার জন্যে,' টুলসা জানাল। 'তারপর গিয়ে সমস্ত দরজা-জানালা পরীক্ষা করেছি।'

'হ্যারি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আজ তার ছুটি,' ডন জবাব দিল।

'তারমানে,' মিসেস মরিয়ার্টির দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'আপনারা বাইরে থাকার সময় খালি ছিল বাড়িটা?'

'খালি এবং তালা দেয়া। দুটো দরজাতেই ডেড-বোল্ট লাগানো, জানালাগুলোতে বার লাগানো। কোনটাই ভাঙা হয়নি, যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। ওপথে কেউ ঢোকেনি ভেতরে। বেরিয়েই দরজায় তালা লাগিয়েছিলাম। আমাদের সাথেই বেরিয়েছিল হ্যারি। সে তালা লাগিয়েছে। ঠিকমত লেগেছে কিনা সেটা আবার পরীক্ষা করে দেখেছে টুলসা।'

'এমন কি হতে পারে, হ্যারি আবার ফিরে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলেছে?'

'না। ইবেল ক্লাবে একটা কনসার্ট আছে। তাতে হ্যারি আর তার কয়েকজন ছাত্র মিলে গিটার বাজাবে। মূল বাদক হ্যারি, কাজেই কনসার্ট শেষ হওয়ার আগে কিছুতেই বেরোতে পারবে না সে। ওয়েস্টউডে যাওয়ার পথে ইবেলে আমরা নামিয়ে দিয়ে গেছি ওকে।'

লাইব্রেরিতে ঢুকল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন মিসেস মরিয়াটি, তারপর গেলেন তার পিছু পিছু। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। এমনিতেই দিনটা মেঘলা, ঘোলাটে আলো, তার ওপর জানালায় রয়েছে ভারি পর্দা। আয়নার ভেতরে নিজের আবছা প্রতিবিম্ব দেখতে পেল কিশোর। সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে চারপাশে তাকাতে শুরু করল। রবিন আর মুসাও ঢুকল ঘরে, দরজার কাছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল টুলসা। এক হপ্তা আগে যেমন দেখে গিয়েছিল লাইব্রেরিটা, ঠিক তেমনিই রয়েছে, কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না তিন গোয়েন্দা।

'টুলসা,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ভূতটাকে আয়নায় দেখা যাওয়ার সময় তুমি কোনখানে ছিলে? ঠিক জায়গাটা মনে আছে?'

'আছে,' বলেই বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির একটা জায়গায় উঠে দাঁড়াল টুলসা। সিঁড়ির মাথা থেকে আট ধাপ নিচে। 'এখানে। নানী ছিল আমার দুই ধাপ নিচে।'

'থাক ওখানে।' লাইব্রেরির এক কোণে সরে এল কিশোর। আয়নার দিকে চোখ রেখেছে। একটা জায়গায় এসে যখন আয়নার ভেতরে টুলসার ছবি দেখতে পেল, ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল টুলসা। 'আয়নার ভেতর।'

'এভাবেই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে,' কিশোর বলল মিসেস মরিয়াটিকে। 'আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আপনাদের চোখে পড়বে, যদি আয়নার দিকে তাকান। মনে হবে আয়নার ভেতরেই রয়েছে লোকটা। ঘরটা অন্ধকার। আলো না থাকলে স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কথা নয় আয়নার ভেতরে। আপনি দেখেছিলেন?'

চোখ বন্ধ করে ফেললেন মিসেস মরিয়াটি, যেন দৃশ্যটা মনে করতে চান না। বললেন, 'স্পষ্ট, খুব স্পষ্ট···যেন জ্বলছিল।'

'গোপন পথ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এঘর থেকে বেরোনোর নিশ্চয় আর কোন পথ আছে, দরজা বাদেও।'

কেঁপে উঠল মুসা। 'ভূতের চলাচল করতে অবশ্য কোন পথের দরকার হয় না!'

খুঁজতে শুরু করল ছেলেরা। মুসা আর ডন কার্পেট উল্টে ঘরের মেঝে পরীক্ষা করতে লাগল। রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে। অনেক জায়গায় ফাটল আর চিড় রয়েছে। সেসব জায়গায় ছুরির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল। কিশোর আর রবিন তাকের বই সরিয়ে পেছনের দেয়ালে ফাঁপা জায়গা আছে কিনা দেখতে লাগল।

'একেবারে নিরেট,' রবিন বলল।

ভুরু কুঁচকে রেখেছে কিশোর। আয়নাটা যেখানে রয়েছে ঠিক তার উল্টো

দিকের দেয়ালটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওপাশে কি আছে?'

'কিছু না,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'দেয়ালের বাইরের দিক। তারপরে পাহাড়ের ঢাল। দেয়ালের নিচের অংশটা মাটির সমতলের বেশ খানিকটা নিচে। সে জন্যেই দেয়ালের ওদিকটায় জানালা রাখা হয়নি। লিভিংরুমের উত্তরের দেয়ালেও জানালা নেই একই কারণে।'

'হুঁম্!' নিচের ঠোঁট ধরে জোরে একবার টান দিয়েই ছেড়ে দিল কিশোর। দেয়ালে থাবা মারল। 'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। চমকে দিল সবাইকে।

'দেখি, কে এল,' দরজার দিকে এগোল টুলসা।

তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল টুলসা, 'আপনি?'

মুহূর্ত পরেই লাইব্রেরিতে ঢুকল সিনর পিটাক। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এল টুলসা। চোখেমুখে রাগ। 'আপনাকে তো ঢুকতে বলা হয়নি!'

তার কথা যেন কানেই যায়নি পিটাকের। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভুরু কুঁচকে। ওল্টানো কার্পেট, আর মেঝেতে নামিয়ে রাখা বইয়ের স্তূপ দেখছে।

'নিশ্চয় কিছু বলতে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মরিয়াটি।

'দেখতে এসেছি আয়নাটা নিরাপদেই আছে কিনা। স্পেনে খবর পাঠিয়েছি কাগজপত্র পাঠানোর জন্যে। চলে আসবে। কিন্তু এখানে মনে হয় কিছু ঘটেছে? ভয়টয় পেয়েছেন নাকি কোন কারণে?'

'কিছুই ঘটেনি,' আরেক দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস মরিয়াটি।

বিশ্বাস করল না পিটাক। 'নিশ্চয় কিছু দেখেছেন। শিয়াভোকে দেখেছেন, তাই না সিনোরা? এখনও সময় আছে। আর দেরি করবেন না। শিয়াভোকে দেখার মানেই হলো সামনে ভয়ানক বিপদ। আয়নাটা দিয়ে দিন আমাকে।'

'অবশ্যই দেব। তবে আগে প্রমাণ করতে হবে আপনি শিয়াভোর বংশধর।'

'আপনার ইচ্ছে।' পকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক আর রূপার পেন্সিল বের করে কিছু লিখল পিটাক। পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে মিসেস মরিয়াটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মত বদলাতেও পারেন আপনি। যদি বদলান, এই যে রইল আমার হোটেলের ঠিকানা আর ফোন নম্বর। বেভারলি সানসেট হোটেলে উঠেছি আমি।' বাউ করে বেরিয়ে গেল পিটাক।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এল টুলসা।

'ও সব জানে!' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'জানে আয়নার মধ্যে আমরা কিছু দেখেছি। কি করে জানল?'

'অনুমানেও বলতে পারে,' কিশোর বলল। 'ঘরের অবস্থা আর আমাদের ভাবসাব দেখেই সন্দেহ করে ফেলেছিল। ধরে নিয়েছিল, নিশ্চয় আয়নার মধ্যে কিছু দেখেছি আমরা, নইলে অমন করব কেন?'

পিটাকের দেয়া ফোন নম্বরটা দেখলেন মিসেস মরিয়াটি। 'অনেক দামী হোটেল। আয়নাটার জন্যে প্রচুর খরচ করছে সিনর পিটাক। আমার বান্ধবী ক্যারোলিন কিছুদিন থেকে ছিল হোটেলটায়। বলেছে সব কিছুর দামই নাকি ওখানে অস্বাভাবিক বেশি।'

'চিনি আমি,' কিশোর বলল। 'সানসেট বুলভারের দক্ষিণে। সানসেট স্ট্রিপের পশ্চিম মাথায়।'

'হ্যাঁ। সানসেট আর রোজউডের এক কোণায়।'

দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'হ্যানসন বলেছে সে বাড়িতেই থাকবে। দরকার হলে যেন ফোন করি। এক কাজ করো না, তাকে ফোন করে আসতে বলো। তোমাদেরকে বেভারলি হোটেলে নিয়ে যাক। পিটাকের ওপর নজর রাখতে পারবে। দু'জন দুইখানে পাহারা দেবে। একজন থাকবে সার্ভিস এন্ট্র্যান্সে, আরেকজন মেইন এন্ট্র্যান্সে। তোমাদের চোখ এড়িয়ে আর বেরোতে পারবে না তাহলে পিটাক।'

'যাচ্ছি,' খুশি হয়েই রাজি হলো মুসা। যেন এই ভূতের আড্ডাখানা থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

'মাকেও একটা টেলিফোন করতে হবে,' রবিন বলল। 'বলে দিতে হবে বাড়িতে ডিনার খেতে আসতে পারছি না। আমরা তো যাচ্ছি পিটাককে পাহারা দিতে, তুমি কি করবে?'

আয়নার ফ্রেমের একটা কুৎসিত গবলিনের গায়ে হাত বোলাল গোয়েন্দা-প্রধান। 'আমি আর ডন বইগুলো তাকে তুলে রাখব। তারপর অপেক্ষা। বলা যায় না, আবার আয়নার ভেতরে দেখা দিতে পারে শিয়াভোর ভূত। এবার আর মিস করতে চাই না।'

ছয়

বেভারলি হিলে যাওয়ার পথে একটা হ্যামবার্গার স্ট্যাণ্ডে থেমে দ্রুত কিছু খেয়ে নিল মুসা, রবিন আর হ্যানসন। পাহারা দিতে গেলে কতক্ষণ আর খেতে পারবে না কে জানে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বেভারলি সানসেট হোটেলে ওরা পৌছতে পৌছতে পর্বতের উত্তরের মাথার কাছটায় মেঘে ঢেকে গেল। সানসেট বুলভারের পুরো ব্লকটাই জুড়ে রয়েছে হোটেলের সুন্দর চারতলা ইঁটের বাড়িটা।

'দেখেই বোঝা যায় দামী,' মুসা বলল।

হোটেলের বাইরে কিছুটা দূরে ওর ফোর্ড সেডান গাড়িটা পার্ক করল হ্যানসন। 'অনেকের কাছেই জায়গাটা বেশ আকর্ষণীয়,' বলল সে। 'ওখানকার অনেক মেহমানেরই শোফার হতে হয়েছে আমাকে। সাধারণ কমার্শিয়াল হোটেল নয় ওটা। বাসাবাড়ির ঝামেলায় যেতে চায় না এরকম কিছু মানুষ তো থাকার স্থায়ী ব্যবস্থাই করে নিয়েছে ওখানে।'

'একটা কথা ধরেই নিতে পারি,' রবিন বলল, 'সিনর পিটাকের টাকার অভাব নেই।'

'ওই যে!' বলে উঠল মুসা।

গাড়িতে বসেই তিনজনে দেখতে পেল হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে সিনর পিটাক। মেঘের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল একটা মুহূর্ত, কান পেতে শুনল দূরের বজ্রপাতের শব্দ. তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সাইডওয়াকের দিকে, হাত

পকেটে ঢোকানো।

ভ্রূকুটি করল হ্যানসন। 'গাড়ি ঘুরিয়ে যাব নাকি? দেখে ফেলতে পারে।'

ফুলের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পিটাক। ডিসপ্লে উইনডোতে সাজানো ফুল দেখল। এগোল আবার। কয়েক শো গজ এগিয়ে আবার থামল। তাকিয়ে রইল একটা আর্ট সাপ্লাই হাউসের জানালার দিকে। কি ভেবে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'কোথাও যাবে বলে মনে হয় না,' মুসা বলল। 'সময় পার করছে কেবল।'

'এই,' হঠাৎ বলে উঠল রবিন, 'দেখো দেখো! কোণের দিকে!'

হালকা-পাতলা একজন মানুষ বেরিয়ে এল। পরনের গাঢ় রঙের স্যুটটায় ইস্তিরি নেই, কুঁচকে রয়েছে জায়গায় জায়গায়। বুলভারের এককোণ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল হোটেলের সদর দরজার দিকে।

'সেই চোরটা!' মুসা বলল।

'হ্যাঁ।' গাড়ির দরজার দিকে হাত বাড়াল হ্যানসন। বেরিয়ে যাবে।

'দাঁড়ান!' তাড়াতাড়ি থামাল তাকে মুসা। 'কি ঘটছে জানার এটাই সুযোগ আমাদের।'

'লোকটা ক্রিমিন্যাল,' হ্যানসন বলল। 'মিসেস মরিয়াটির বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। ওকে ছাড়া যায় না।'

'জানি। মিসেস মরিয়াটির সন্দেহ পিটাকই তাকে পাঠিয়েছে। তারপর ভূতটা দেখা গেল আয়নার ভেতর। এবং তারপর চোরটা এসে হাজির হলো পিটাকের হোটেলে।'

ভুরু কুঁচকে একটা মুহূর্ত ভাবল সে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বেরোতে শুরু করল গাড়ি থেকে।

'কোথায় যাও?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওই ব্যাটার পিছে। পিটাকের সাথে সত্যিই যোগাযোগ আছে কিনা জানা দরকার।'

'হয়তো ওই আর্ট শপটায় দেখা করবে ওরা। সাবধানে থাকবে। দু'জনেই তোমাকে দেখেছে। চিনে ফেলবে।'

'ওই চোরটা কিন্তু সাংঘাতিক লোক,' হ্যানসনও হুঁশিয়ার করল মুসাকে।

শক্ত হয়ে আছে মুসার চোয়াল। 'জানি। ভাববেন না। সাবধানেই থাকব আমি।'

লোকটার দিকে চোখ রেখে দ্রুত এগিয়ে চলল মুসা। মাথা নিচু করে হাঁটছে লোকটা। পথের দিকে চোখ, আর কোনদিকে নজর নেই। আর্ট শপের দিকে গেল না। হোটেলে ঢুকে পড়ল। স্বস্তিই বোধ করল মুসা।

বুলভারটা পার হয়েছে মুসা, এই সময় বদলে গেল দিনের আলো। মাথা সোজা করে শিস দিতে দিতে এগোল, ভাবখানা এমন যেন কোন কাজকর্ম নেই, তাড়া নেই, তাই অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। চোরটার পিছে পিছে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল হোটেলের ভেতর।

লবিটা খুবই শান্ত। পুরু কার্পেটে ঢাকা। নিচু, গোল গোল টেবিল সাজানো রয়েছে, সেগুলোতে সদ্য কেটে আনা ফুল রাখা হয়েছে। অনেকগুলো নরম

গদিমোড়া সোফা আর চেয়ার রয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে মেহমানেরা। বেশির ভাগই বয়স্ক। কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ পড়ছে, কেউ কেউ বা নিচু গলায় গল্প করছে।

চোরটাকে চোখের আড়াল হতে দিল না মুসা। লবির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলছে।

এই পরিস্থিতিতে কিশোর হলে কি করত অনুমান করল মুসা। কিশোর হলে নিশ্চয় এগিয়ে গিয়ে শোনার চেষ্টা করত কি বলছে লোকটা। সে-ও তাই করল। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল পুরু কার্পেটে পা ফেলে। চোরের তিন হাত দূরে এসে থমকে গেল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করল।

'সরি, স্যার,' ক্লার্ক বলছে, 'সিনর পিটাক রুমে নেই।'

'তাহলে মেসেজ রেখে যেতে হয়,' চোর বলল। 'একটা কাগজ দেবেন, প্লীজ?'

'নিশ্চয়, স্যার।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুসা দেখল, ডেস্কে কাগজ রেখে লিখতে শুরু করেছে চোর। ডেস্কের ওপরে রাখা ঘড়িটা দেখল সে। নিজের হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল। ঘুরে গিয়ে বসে পড়ল ডেস্কের দিকে পেছন করে রাখা একটা সোফায়।

'নিন,' কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে চোর বলল, 'সিনর পিটাকের হাতে দেবেন।'

'দেব,' ক্লার্ক বলল।

কাঁধের ওপর দিয়ে একবার চোরা চাহনি দিয়ে নিল মুসা। তার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কাগজটা ভাঁজ করল ক্লার্ক। পেছনের দেয়ালে নম্বর দেয়া একটা স্লটে ঢুকিয়ে রাখল। পরিষ্কার দেখতে পেল মুসা, ৪২৬ নম্বর।

দায়িত্ব পালন শেষ করল ক্লার্ক। আগন্তুককে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল। নীরব প্রশ্নঃ আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি, স্যার?

'খুব জরুরী কিন্তু,' চোরটা বলল।

'খেয়াল রাখব,' কথা দিল ক্লার্ক। 'মেসেজ অবশ্যই পাবেন সিনর পিটাক।'

ডেস্কের পেছনে একটা টেলিফোন বেজে উঠল।

'এক্সকিউজ মী,' বলে ফোন তোলার জন্যে ঘুরল ক্লার্ক।

চট করে সরে গেল ওখান থেকে চোরটা। ঢুকে পড়ল কোণের একটা করিডরে, নির্দেশ চিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে এলিভেটর আছে ওখানটায়। মুহূর্ত পরেই দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেল মুসা, তারপর মোটরের গুঞ্জন, তার মানে রওনা হয়ে গেছে এলিভেটর। মেসেজ পৌঁছে দেয়ার জন্যে ক্লার্কের ওপর ভরসা করতে পারল না চোরটা! সন্দেহ হলো মুসার। বুঝে ফেলল হঠাৎ। মেসেজ-ফেসেজ কিছু না। কায়দা করে সিনর পিটাকের রুম নম্বর জেনে নিল ধড়িবাজ লোকটা।

দ্বিধা করল একবার মুসা। তারপর উঠে নিঃশব্দে পেরিয়ে এল ক্লার্কের ডেস্ক, এগোল করিডরের দিকে, এলিভেটরের কাছে।

দুটো এলিভেটর রয়েছে। পাশে একটা সিঁড়িও আছে। সাধারণ সিঁড়ি নয়।

প্রবেশমুখে ইস্পাতের ভারি পাল্লা লাগানো। আবার দ্বিধা করল মুসা। শক্ত হয়ে গেছে পেটের পেশী। শেষে যেন গা ঝাড়া দিয়ে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেলল সিঁড়ির দরজা। ভেতরে ঢুকে একেক লাফে দুটো তিনটে করে ধাপ ডিঙিয়ে উঠতে লাগল। পাঁচতলায় পৌঁছে বেরোনোর দরজাটা খুলে উঁকি দিয়ে তাকাল হলওয়ের দিকে। অস্বস্তি তাড়াতে পারছে না কিছুতে।

এখানকার মেঝেতেও নিচতলার লবির মত দামী কার্পেট পাতা। দেয়াল ঘেঁষে রাখা নিচু ছোট ছোট টেবিল। সেগুলোতে তাজা ফুল। আর রয়েছে অসংখ্য দরজা। গাঢ় রঙের স্যুট পরা চোরের হালকা মূর্তিটা চোখে পড়ল না কোথাও।

হলওয়েতে বেরিয়ে এগিয়ে চলল সে। দরজার নম্বর গুণে গুণে এসে দাঁড়াল ৪২৬ নম্বরের সামনে। অবাক লাগছে। কি করছে চোরটা? পিটাকের ঘরে ঢুকেছে? চুরি করতে? নাকি পিটাকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বসে আছে?

হলের এমাথা-ওমাথা দেখল সে। টেলিফোন চোখে পড়ল না। শুধুই কার্পেট, টেবিল, ফুল আর বন্ধ দরজা। লবিতে ফিরে গিয়ে ক্লার্ককে সাবধান করে দেবে?

আবার ভাবল মুসা, কিশোর পাশা হলে কি করত? লবিতে ফিরে যেত? না, যেত না। এখানেই থাকত, দেখত কি ঘটে। পিটাক আসার আগেই যদি চোরটা ফেরত যায় তাহলে আবার তাকে অনুসরণ করা যাবে। আর লোকটা যাওয়ার আগে পিটাক এলে কিছু ঘটতে পারে।

কিন্তু হলে অপেক্ষা করা যাবে না। যদি কোন দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে কেউ, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। এড়াতে হলে এখনই লুকিয়ে পড়তে হবে কোথাও।

পিটাকের দরজার উল্টো দিকের দরজাটায় নম্বর নেই। নব ধরে সেটা খোলার চেষ্টা করল মুসা। ঘুরে গেল নব। টান দিয়ে পাল্লা খুলতেই নাকে এসে লাগল মোমের, সেই সঙ্গে এক ধরনের ভেজা ভেজা গন্ধ। ঝাড়ু রাখার আলমারি।

'হ্যাঁ, ভালই হচ্ছে, চালিয়ে যাও,' নিজেকে বোঝাল মুসা। ঢুকে পড়ল আলমারির ভেতরে। হুঁশিয়ার রইল যাতে ঝাড়ু, ব্রাশ কিংবা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে ওগুলোকে উল্টে না ফেলে। দরজাটা টেনে দিল আবার। পুরোপুরি লাগাল না, সামান্য ফাঁক রেখে দিল। কাত হয়ে সেই ফাঁক দিয়ে তাকাতে গিয়ে গায়ে ঠেকল একটা তাক, তার ভেতরে রয়েছে সাবান আর আসবাব চকচকে করার পালিশ। লাগুক, কেয়ার করল না সে, কিছু ফেলে না দিলেই হলো। পিটাকের দরজা দেখতে পাচ্ছে। দরজাটা খোলা থাকলে ঘরের ভেতরটা দেখতে পেত এখান থেকে।

অপেক্ষা করতে লাগল সে। নড়ল না। বাইরে বাজ পড়ার শব্দ হলো।

এলিভেটরের গুঞ্জন এসে থেমে গেল। দরজা খুলল। কার্পেটের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসার হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুসার দিকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। বিড়বিড় করে স্প্যানিশ ভাষায় বলল কি যেন। আলমারির সামনে দিয়ে চলে গেল সিনর পিটাক, ৪২৬ নম্বর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চাবি ঢোকাল তালায়।

আলমারির দরজা আরেকটু ফাঁক করল মুসা। কিছু ঘটলে যাতে আরও ভাল

করে দেখতে পারে।

ভ্রূকুটি করল পিটাক। দু'বার মোচড় দিল চাবি দিয়ে। তারপর ঠেলে পাল্লা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরে। পেছনে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা। আস্তে করে আলমারি থেকে বেরিয়ে পড়ল মুসা। হল পেরিয়ে পিটাকের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তালার ফুটোয় কান পাততে যাবে এই সময় একটা শব্দ শুনে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। ঘুসির শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। তারপর ধুপ করে ভারি কিছু পতনের আওয়াজ।

আবার খুলে গেল পিটাকের ঘরের দরজা। চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে, মুসা আর সেই চোরটা।

'তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। তেড়ে এল মুসার দিকে।

ঝট করে নিচু হয়ে গেল মুসা। লোকটার ঘুসি চলে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। আর মারার চেষ্টা করল না সে। একবার মিস করেই মুসা আবার সোজা হতে হতে তীরগতিতে ছুটল সিঁড়ির দিকে। হাতে সাদা কিছু রয়েছে দেখতে পেল মুসা।

পেছনে ছুটল সে। বেশি দূর যেতে দিল না লোকটাকে। মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে পড়ল লোকটার পিঠ লক্ষ্য করে। নিশানা ব্যর্থ হলো, তবে পুরোপুরি নয়। লোকটার উরুতে লাগল তার মাথা। সামলাতে পারল না। উপুড় হয়ে পড়ে গেল লোকটা। হাতের সাদা জিনিসটা ছুটে চলে গেল। তার পা জড়িয়ে ধরেছে মুসা, আটকে রাখার জন্যে। লাথি দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। ছাড়াতে না পেরে চেষ্টা আর করল না, উঠে বসে মুসার মাথা সই করে ঘুসি মারল।

মুসার মনে হলো মুগুরের বাড়ি পড়ল মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে যেন। আপনাআপনি ঢিল হয়ে গেল হাত। এই সুযোগে ঝাড়া দিয়ে পা ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল আবার লোকটা। সিঁড়ির কাছাকাছি পৌছতেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

কোনমতে উঠে দাঁড়াল মুসা। শরীর কাঁপছে। বাপরে বাপ, কি প্রচণ্ড জোরে মারে ওইটুকু মানুষটা! বিশ্বাসই হতে চায় না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। টলে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি দেয়ালে হেলান দিল। ঘোলা হয়ে আসছে দৃষ্টি। মাথা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল সাদা জিনিসটা, লোকটার হাত থেকে যেটা পড়েছে। কার্পেটের কিনারে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। নিচু হয়ে ওটা তুলে নিয়েই পকেটে ফেলল মুসা। ফিরে এল ৪২৬ নম্বরের সামনে। দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। মেঝেতে পড়ে আছে সিনর পিটাক। কানের পেছন থেকে রক্ত বেরিয়ে ঘাড় আর শার্টের কলার লাল করে দিয়েছে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। মরে গেল না তো! পলকে কেটে গেল দুর্বলতা। দুই লাফে চলে এল পিটাকের পড়ে থাকা দেহটার পাশে। ঘাড়ের পাশে আঙুল ছুঁইয়ে নাড়ি খুঁজতে লাগল। পেতে দেরি হলো না। নাহ্, বেঁচেই আছে লোকটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আঘাতটা মারাত্মকই হতে পারে, তবে এখনও মরেনি সিনর পিটাক।

টেবিলে একটা টেলিফোন রাখা। একটা খোলা ব্যাগ, একগাদা কাগজ ছড়িয়ে

আছে তার পাশে। রিসিভার তুলে নিল মুসা।

'কি করতে পারি বলুন?' জিজ্ঞেস করল হোটেল অপারেটরের মসৃণ কণ্ঠ।

'সিনর পিটাক আহত হয়েছেন,' মুসা বলল। 'জলদি পুলিশ আর ডাক্তারকে খবর দিন।'

বিস্মিত অপারেটর আর কিছু বলার আগেই রিসিভার রেখে দিল সে। পিটাককে ডিঙিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দৌড় দিল করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় এলিভেটরের শব্দ শুনতে পেল, উঠে যাচ্ছে।

নিচতলায় পৌঁছে করিডরে বেরিয়ে এল মুসা। তাড়াহুড়া করল না। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। এখানে কোন উত্তেজনা চোখে পড়ল না, কেবল ডেস্কে নেই ক্লার্ক।

বুলভারে বেরিয়ে এল মুসা। অন্ধকার হয়ে গেছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে পাহাড়ের মাথায়, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে কুঁজো হয়ে দৌড় দিল সে। কোণের ট্র্যাফিক সিগন্যালটা গাড়িগুলোকে আটকে দিতেই পথিক পারাপারের ক্রসিং ধরে দৌড়ে রাস্তা পেরোল, ছুটল গাড়ি নিয়ে যেখানে অপেক্ষা করছে হ্যানসন আর রবিন। একটানে দরজা খুলেই প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভেতরে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'পিটাককে ঢুকতে দেখলাম। চোরটার সাথে কথা বলেছে?'

ততক্ষণাৎ জবাব দিল না মুসা। তাকিয়ে রয়েছে নিজের হাতের দিকে। কাঁপছে।

'কি হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তুমি…তোমরা চোরটাকে বেরোতে দেখেছ?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না। পিটাকের ঘরে আছে?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'আমি…আমি ডেস্ক ক্লার্ককে খবর দিয়েছি…চোরটা… নিশ্চয় সার্ভিস ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'কি হয়েছে, মুসা?' হ্যানসন জানতে চাইল।

সাইরেন শোনা গেল। রাস্তার গাড়ির সারির পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে এল পুলিশের গাড়ি, বুলভার পেরিয়ে গিয়ে থামল হোটেলের সামনে।

'চোরটা,' সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল মুসা, 'পিটাককে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কানের পাশে কি দিয়ে যেন সাংঘাতিক বাড়ি মেরেছে। অপারেটরকে ফোন করে জানিয়েই পালালাম। আর থাকতে সাহস হলো না। ওই ঘরে ধরা পড়লে মহা মুশকিলে পড়তাম। প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছে পিটাকের জখম থেকে।

সাত

মুসারা বেরিয়ে যাওয়ার পর সমস্ত ম্যানশনে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিশোর। ভাল করে দেখল দরজার ছিটকানি দেয়া আছে কিনা. জানালার গ্রিলে কোনরকম

দুর্বলতা কিংবা ফাঁক আছে কিনা যেখান দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারে। আবছা অন্ধকার ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে চারপাশে কিসের যেন নড়াচড়া, যেন অসংখ্য ছায়ারা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে সবখানে। মনকে বোঝাতে লাগল সে, ওগুলো কিছু না, অগনিত আয়নায় তার নিজেরই ছায়া। সে নড়লেই ওগুলো নড়ে ওঠে, থামলে থেমে যায়।

লাইব্রেরিতে ফিরে এসে কান পাতল। বাড়ির আরেক প্রান্তে রান্নাঘরে শোনা যাচ্ছে মিসেস মরিয়াটি আর টুলসার কথা, চামচ আর বাসন-পেয়ালার টুংটাং। রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ হলো শব্দ করে। স্টোভের ওপরে বসানো এগজস্ট ফ্যানটা গুঞ্জন করছে। সহজ, স্বাভাবিক, পরিচিত সব আওয়াজ। অথচ এখানে সেগুলোই কেমন যেন অপার্থিব লাগছে। বার বার মনে হচ্ছে তালা দেয়া দরজা, গ্রিল লাগানো জানালা আর নিরেট দেয়ালও আটকাতে পারবে না, ঠিকই এসে উদয় হবে আজব কোন মানুষ কিংবা অন্য কিছু।

বজ্রপাতের ভারি গুড়ুগুড়ু কানে আসছে উত্তর দিক থেকে। গবলিন গ্লাসে ছায়া পড়ল একটা। চমকে উঠল সে। ঢিল হয়ে গেল আবার শরীর। ডন কারনেস, লাইব্রেরিতে এসে ঢুকেছে।

'আজ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যাবে,' বলল সে।

'হ্যাঁ। ঝড়টা সরে গেলে অবশ্য আর তা হবে না।'

কুঁচকে গেছে ডনের নাক। 'আমি জানতাম গরমের সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় বৃষ্টি হয় না।'

'কম হয় আরকি।'

'খাবার তৈরি হয়ে গেছে,' ডন বলল। 'রান্নাঘরে খেতে বসব আমরা। ওখানে আয়না নেই। আমার মনে হচ্ছে আপাতত কিছুদিন আয়না দেখবে না আর নানী।'

ডনের পিছু পিছু লম্বা করিডর ধরে এগোল কিশোর। ঢুকল এসে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিরাট রান্নাঘরে। সকালের আগে ফিরবে না হ্যারি কোলাস। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর দরজাটার সামনে একটা আলমারি ঠেলে আটকে দেয়া হয়েছে। ওটা না সরিয়ে আর কোনমতেই খোলা যাবে না দরজা।

হালকা রঙের একটা সামার স্যুট পরেছিলেন মিসেস মরিয়াটি, নাতনীকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার সময়। সেটা খুলে স্ল্যাকস আর শার্ট পরেছেন, স্বাভাবিক পোশাক, জমকালো নয়, তবে খুব দামী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সোনালীর ছোঁয়া মেশানো সাদা চুলগুলোকে খোঁপা করে পিন দিয়ে আটকে দিয়েছেন ঘাড়ের ওপরে।

'এখানে কখনও ভূত দেখা যায়নি,' বলতে বলতে ডিম ভাজার একটা প্লেট টেবিলে নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'হ্যারি যে এখানে আয়না রাখতে দেয়নি, সে জন্যে এখন খুশিই লাগছে তার ওপর। আয়না নেই বলেই ভূতও দেখা যাবে না।'

'আর কোন আয়নায় তো ভূত দেখা যায়ওনি,' কিশোর বলল, 'শিয়াভো গ্লাসটায় বাদে। ওটাতেও যা দেখা গেছে সেটা ভূত নয়, প্রতিবিম্ব।'

চেয়ারে বসলেন মিসেস মরিয়াটি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত লাগছে তাঁকে। একদিনেই যেন বয়েস বেড়ে গেছে অনেকখানি। 'একেক সময় মনে হয় আমার আয়নাগুলো

সব ভূতুড়ে। মাঝে মাঝে একা বাড়িতে যখন থাকি, তখন যেন ভূতের আসর হয় আয়নাগুলোতে। আর সেই ভূতটা হলাম গিয়ে আমি।'

সর্তক হয়ে উঠল কিশোর। প্রসঙ্গটা ধরে রাখার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'মিসেস মরিয়াটি, এর আগেও কি ভূত দেখেছেন আয়নায়?'

কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। চোখের দৃষ্টি অন্য রকম হয়ে গেছে। স্বাভাবিক আর লাগছে না। কেমন যেন স্বপ্নিল। তবে সেটা থাকল না। বদলে গেল পলকে। 'না, দেখিনি। এই বাড়িতে আমার নিজেকেই এত বেশি বার দেখেছি, ভূতের মতই লাগে এখন। যাদের আয়না তারাও বোধহয় নিজেদেরকে এত বেশি বার দেখেনি। তবে ভূত দেখিনি, এটা ঠিক। কোন রকম হ্যালুসিনেশনও না। অদ্ভুত কোন কিছুই দেখিনি কোন আয়নায়।'

'গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল কিশোর। 'তাহলে একটা আয়নার ওপরই এখন গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের, শিয়াডো গ্লাস। মিসেস মরিয়াটি, ওই আয়নাটা হয় সত্যিই ভূতুড়ে, নয়ত এ বাড়িতে ঢোকার গোপন কোন পথ রয়েছে, যেটা আপনার জানা নেই। কোন গোপন ঘরও থাকতে পারে। ভূতটা যেহেতু দেখা গেছে, এই তিনটের কোন একটা হতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস মরিয়াটি। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'গত এক হপ্তায় অদ্ভুত যে-সব শব্দ শোনা গেছে, সব শোনা গেছে রাতের বেলায়, তাই না?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। প্রথমবার আমি ভূতটা দেখলাম...'

শক্ত হয়ে গেল কিশোর। 'আজকের আগেও দেখেছেন?'

'দেখেছি। কাল রাতে,' স্বীকার করলেন মিসেস মরিয়াটি। 'ডন আর টুলসা শুতে গেল। আমার ঘুম আসছিল না। হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। মনে হলো কে যেন করিডরে হাঁটছে। ডন নয়। কারণ করিডরে বেরোতে হলে তাকে দরজা খুলতেই হত, আর যত আস্তেই খুলুক শব্দ হতই, আমি শুনতে পেতাম। শুনিনি যখন, তার মানে ডন নয়। তাছাড়া ওর পায়ের শব্দও আমার চেনা। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এলাম। হলঘরটা অন্ধকার, তবে এতটা অন্ধকার নয় যে কোন কিছুই দেখা যাবে না। কাউকে দেখলাম না। কিন্তু ভয়াবহ একটা শব্দ হচ্ছে, অনেকটা খিলখিল হাসির মত। লাইব্রেরি থেকে আসছিল শব্দটা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে রইলাম। শেষে দেখতে পেলাম ওটাকে। আজ টুলসা আর আমি যে জিনিস দেখেছি সেই একই জিনিস। একটা মুখ। আয়নার ভেতরে।'

'আজ দেখেছেন দিনের বেলায়। যতই পর্দা টানা থাকুক, রাতের মত অন্ধকার হয় না দিনের বেলা। রাতে নিশ্চয় আরও অন্ধকার ছিল।'

'অনেক বেশি। তবু মুখটা আমি দেখেছি।'

'নানী,' ডন বলল, 'কাল বললে না কেন? আমাকে বলতে পারতে। তখনই কিছু একটা করতে পারতাম।'

'বলিনি, তার কারণ ভূত বিশ্বাস করি না আমি। ভেবেছি আমার চোখের ভুল। তবে আজ যখন টুলসাও দেখল, তখন বুঝলাম ভুল নয়। কাজেই এখন বললাম।'

'ভাল করেছেন,' কিশোর বলল। 'এখন শুনুন, আমরা কি করব। সবাই

দোতলায় চলে যাব। সকাল সকাল। খেয়ে উঠে এখনই। টেলিভিশন আছে?' মিসেস মরিয়াটি মাথা ঝাঁকালে আবার বলল, 'গুড। সবাই টেলিভিশন দেখব আমরা।'

'সবাই?' টুলসা তাকাল কিশোরের দিকে।

'আমি বাদে। হলের আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। আমি বসে থাকব সিঁড়ির মাথায়। আজ বিকেলে যেখানে দাঁড়িয়ে ভূত দেখেছিলে তোমরা, যেখান থেকে আয়নাটা দেখা যায়। সারা বাড়ি চুপচাপ হয়ে গেলে আবার হয়তো বেরোতে পারে শিয়াভোর ভূত। হয়তো বুঝতে পারব আয়নার ভেতরে ছায়াটা পড়ে কি করে।'

কিশোরের কথাটা সবারই মনে ধরল। খাওয়া শেষ করে ডন, টুলসা আর মিসেস মরিয়াটি ইচ্ছে করে বেশি বেশি শব্দ করে উঠে চলে গেলেন দোতলায়। জোরে জোরে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মরিয়াটি, কোন্ চ্যানেল আর কোন্ অনুষ্ঠান কিশোরের বেশি পছন্দ। তারপর দোতলার হলঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। পা টিপে টিপে কিশোর গিয়ে বসল সিঁড়িতে, তাকিয়ে রইল লাইব্রেরিতে রাখা আয়নার দিকে।

পুরো আধ ঘণ্টা কোন রকম শব্দ হলো না। বাইরে কেবল ঘনায়মান ঝড়বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মাঝে সেই শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত হাসি—টেলিভিশনে একটা হাসির ছবি চলছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাইরে, বাজ পড়ছে কখনও দূরে, কখনও কাছে। অপেক্ষা করছে কিশোর। একটা মুহূর্তের জন্যে ঢিল করতে পারছে না স্নায়ু। গোয়েন্দাগিরির সব চেয়ে কঠিন কাজ এটাই, তার মতে, এই অপেক্ষা করাটা।

তারপর, হঠাৎ করেই একটা শব্দ শোনা গেল নিচে। এতই মৃদু, কিশোরের সন্দেহ হতে লাগল সত্যিই শুনেছে কিনা ভেবে।

আবার হলো শব্দ। দুপ করে।

চমকে গেল কিশোর। না, আর কোন সন্দেহ নেই। অনেক জোরে হয়েছে এবার শব্দটা, কিছু ফেলে দেয়ার মত। অথবা মেঝেতে পা ঠুকেছে কেউ।

কিছুই দেখতে পেল না কিশোর। লাইব্রেরির দরজায় আবছা কাঠামো, তার ওপাশে কালো হলঘর। আর কিছু নেই।

হাসি শোনা গেল। সহজে ভয় পায় না কিশোর, তবু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার এখন। হাসিটা বড়ই ভয়ঙ্কর।

ঝিক করে উঠল সবুজ আলো। আয়নাটার দিকে তাকিয়ে থেকেও এতক্ষণ ওটার কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। এখন দেখল। আয়নার ভেতরে ভূত!

একটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর, ধক করে উঠল বুকের ভেতর। পরক্ষণেই হারিয়ে গেল ওটা। চোখ ডলল সে। বিশ্বাস করতে পারছে না দেখেছে ওটাকে। চুলগুলো ছিল ধূসর, জট পাকানো, মাথা আঁকড়ে ঝুলে ছিল যেন সাগরের শ্যাওলার মত। মুখটা চকের চেয়েও সাদা, মড়ার মুখের মত, জ্বলজ্বল করছিল যেন অলৌকিক কোন ক্ষমতায়। বড় বড় চোখ, সবুজ, চকচকে; তীব্র ব্যঙ্গ ঝরছে ওগুলো থেকে।

টেলিভিশন যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরের দরজা খুলে গেল।

আবার হাসি শুনতে পেল কিশোর। চেহারাটা দেখতে পেল আয়নার ভেতর।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল আয়নার ভেতরের মুখটা। অন্ধকার হয়ে গেল আবার লাইব্রেরি। হাসিটা শোনা যাচ্ছে এখনও, সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।
ছুটে এসে লাইব্রেরিতে ঢুকল কিশোর। পাগলের মত হাতড়াতে লাগল আলোর সুইচের জন্যে। টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা আঙুলে ঠেকতেই টিপে দিল। জ্বলে উঠল আলো।
শূন্য লাইব্রেরি। সে ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। আয়নার ভেতরে তার নিজের প্রতিবিম্ব, ওটার পাশে নেই কোন জাদুকর কিংবা গবলিনের চেহারা।

আট

কিশোরের পাশে উদয় হলো আরেকটা প্রতিবিম্ব, ডন কারনেস।
'দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল ডন।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
দরজায় এসে দাঁড়ালেন মিসেস মরিয়াটি আর টুলসা। কিশোরের সাদা হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র একটা আওয়াজ বেরোলো তাঁর মুখ থেকে, হাসি আর দীর্ঘশ্বাসের মিশ্রণের মত। 'ভয়ংকর দেখতে, তাই না?'
লম্বা দম নিল কিশোর। স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে নিজেকে। 'হ্যাঁ, ভয়ংকরই। আপনি যে এখন আয়নার দিকে তাকাতে দ্বিধা করেন, ঠিকই করেন।'
শূন্য আয়না আর দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল সে। 'কিন্তু গেল কোথায় ওটা?'
'যেখান থেকে এসেছে সেখানেই,' টুলসা বলল। কেঁপে উঠল একবার। 'হয়তো...হয়তো সিনর পিটাকের কথাই ঠিক। মিথ্যে গল্প বলেনি। আয়নার ভেতরে দেখা দিয়েছে শিয়াভো।'
'কিন্তু...কিন্তু সেটা অসম্ভব,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'আয়নার ভেতরে কেউ বাস করতে পারে না। ফ্রেমটা যতই উদ্ভট হোক, ওটা একটা অতি সাধারণ আয়না। মানুষ ঢোকার জায়গাই নেই ওর মধ্যে।'
'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল আয়নার ফ্রেমে 'উদ্ভট, কিন্তু তৈরি হয়েছে সাধারণ ইস্পাত দিয়ে। তার নেই কিছু নেই, যে ইলেকট্রনিকের সাহায্যে ম্যাজিক দেখাবে। আয়নাটাতেও কিছু নেই। অথচ ভয়ংকর একটা মুখ দেখা গেছে এর ভেতরে। প্রতিবিম্ব ছাড়া ওটা আর কিছু ছিল না। নিশ্চয় কোন একটা কায়দা করে রাখা হয়েছে এই ঘরের ভেতরেই। কিছু একটা ব্যাপার আছেই। বাস্তব কিছু। নইলে কিছুতেই দেখতে পেতাম না।'
অনেকক্ষণ থেকেই আগমন সংকেত দিয়েছে ঝড়, এবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল গতিতে। ভাব দেখে কিশোরের মনে হতে লাগল, আয়নার ওই আজব আচরণ ঝড়েরও যেন পছন্দ হয়নি, তাই প্রচণ্ড রেগে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চাইছে। মুষল ধারে নামল বৃষ্টি। ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগল, কেঁপে কেঁপে উঠতে

লাগল বিশাল প্রাসাদটা। ভিত ধরে যেন ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। কয়েকবার মিটমিট করে নিভে গেল বাতিটা।

'সর্বনাশ!' ভয় পেয়ে গেলেন মিসেস মরিয়াটি, 'নিশ্চয় পাওয়ার লাইনে বাজ পড়েছে!'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। কান পেতে শুনছে বাইরের বৃষ্টির শব্দ। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করছে ঘরের ভেতরে। তাকাতে তাকাতে চোখে পড়ল ওটা। ঘরের এ কোণে যেন শূন্যে ঝুলে রয়েছে হালকা সবুজ একটা আভা।

রহস্যময় আভাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। হাত বাড়িয়ে অন্ধকারেই ছুঁয়ে দেখল। বুকশেলফের কিনারে ঠেকল আঙুল, আঠা আঠা কি যেন লাগল। হাতটা সরিয়ে আনার পরেও শেলফে আভাটা রইল, ওর আঙুলেও এখন হালকা ভাবে দেখা যাচ্ছে ওই জিনিস।

'আলো দরকার, আলো,' বলে উঠল সে।

বেরিয়ে গেল ডন আর টুলসা। অন্ধকারে আন্দাজে এগিয়ে চলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেই। কিছুক্ষণ পর আলো দেখা গেল, মোমের ম্লান আলো।

'টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে,' ঘরে ঢুকে বলল ডন। জ্বলন্ত মোমটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে আরেকটা মোম বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'এর বেশি আর কিছু দিতে পারছি না।'

হাতের দিকে তাকাল কিশোর। সবুজ আভাটা নেই। আঙুলে লেগে রয়েছে ধূসর রঙের কি যেন।

'কি?' জিজ্ঞেস করল ডন।

আঙুল নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকল কিশোর। ফিরে তাকাল মিসেস মরিয়াটির দিকে। 'ভূতটা মেকাপ নিয়েছিল! সাধারণ জিনিস নয়, এমন কিছু যা অন্ধকারে জ্বলে। আরও মোম দরকার।'

আরও কয়েকটা নিয়ে এল টুলসা। যেখানটায় সবুজ আভাটা জ্বলছিল সেখানটা পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। শেলফে লেগে রয়েছে ধূসর রঙ, কিশোরের আঙুলে যে জিনিস লেগেছে। শেলফের ওই জায়গাটা থেকে বই সরাতে শুরু করল সে। পেছনের দেয়াল বেরিয়ে পড়তেই তাতে থাবা দিল। শুনল। আবার দিল। আবার শুনল।

'লাগছে তো একেবারে নিরেট,' বলল সে। 'বিশ্বাস করা কঠিন। তবু বোঝাই যাচ্ছে গোপন একটা দরজা আছেই কোথাও। অথচ এটা বাড়ির পেছনের দেয়াল যার ওপাশে কোন ঘর নেই। তাহলে বাইরে বোরোনোর দরজা আছে। দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাই ঘরে ঢুকে পড়ে ভূতটা, ওই পথেই যাওয়া আসা করে।'

'কিন্তু বাড়িটা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের ঢালে,' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'এই দেয়ালের ওপাশে আছে মাটি।'

'সুড়ঙ্গ থাকতে পারে। বেশি বড় না হলেও চলে।'

'কিংবা হয়তো আরেকটা ঘর,' গলা কাঁপছে টুলসার। 'মাটির নিচেও তো ঘর থাকে, ডানজন। হয়তো···হয়তো এখন ওপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে

ভূতটা।'

আচমকা ছুটে বেরিয়ে গেল ডন। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। আলমারির ড্রয়ার খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ হতে লাগল। ফিরে এল কাঠের একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে হ্যারি কি করে বলতে পারব না। তবে আমাদের কাজে লাগবে এখন। ভূতটা শুধু বেরিয়ে এলেই হয় এখন দেয়ালের ওপাশ থেকে, টের পাবে বাছাধন।'

'বাড়িতে এখন সে না-ও থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'সেটা জানার একটাই রাস্তা। দরজাটা খুঁজে বের করতে হবে। এঘরেই আছে কোথাও, আমি শিওর।'

বসে পড়লেন মিসেস মরিয়াটি। 'কিশোর, খুব সাবধান।'

'আমি সব সময়ই সাবধান থাকি, মিসেস মরিয়াটি।'

খুঁজতে শুরু করল সে। তাক থেকে বই নামাতে, দেয়ালে বাড়ি কিংবা থাবা দিয়ে ওপাশটা ফাঁপা কিনা বুঝতে তাকে সাহায্য করল টুলসা আর ডন। মনে হতে লাগল, অহেতুকই কষ্ট করছে ওরা। লাভ হবে না। বইয়ের পেছনে দেয়ালে কোন রকম ফাটল বা ছিদ্র দেখা গেল না। সুইচবোর্ডগুলোও খুলে দেখল কিশোর। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। গোপন কোন তার নেই, ফাটল নেই, আঙুলের চাপে নড়ে উঠল না কোন কিছু।

'হুড়কো-টুড়কো কিছু একটা নিশ্চয় আছে,' অবশেষে বলল কিশোর। 'আছে, এবং সেটা এই ঘরেরই দেয়ালে।'

'হয়তো অন্য পাশ থেকে খোলে,' অনুমান করল ডন।

'না। ভাবলেই বোঝা যায়। এই বাড়িটা বানিয়েছে জাদুকর টেরিয়ানো। দরজাটা তৈরি হয়েছে তারই নির্দেশে। অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান ছিল সে, তার প্রধান খেলাগুলোর একটা ছিল উধাও হয়ে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়া। অবসর নেয়ার পরেও বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত করে নিয়ে আসত বাড়িতে, উধাও হওয়ার খেলা দেখাত। আজ রাতে শিয়াভোর ভূত গায়েব হয়েছে এঘর থেকে। নিশ্চয় এঘরটাই টেরিয়ানোও বেছে নিয়েছিল খেলা দেখানোর জায়গা হিসেবে। উধাও হলে আবার ফিরে আসতে হবে, আর সে জন্যে দরজাটা দু'দিক থেকে খোলারই ব্যবস্থা থাকতে হবে।'

বুকশেলফগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুট একটা শব্দ করল সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল টুলসা।

'সব জায়গাই দেখেছি কেবল এই একটা জায়গা বাদে।' মিসেস মরিয়াটির দিকে তাকাল কিশোর, 'বাড়িটা কেনার সময় কি এগুলো ছিল এখানে? না পরে আপনি বানিয়েছেন?'

'ছিল।'

'এবং এগুলো বই দিয়ে ভরে রেখেছেন আপনি।' বলতে বলতেই গিয়ে যে শেলফটায় ধূসর দাগ লেগে রয়েছে সেটার নিচে হাত ঠেকিয়ে ওপরে ঠেলা মারল কিশোর।

কোন শব্দ হলো না। তবে হালকা এক ঝলক বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিল মোমবাতির শিখা। আরেকটু জোরে চাপ দিতেই দেয়ালের একটা অংশ, শেলফ এমনকি স্কার্টিং-বোর্ড সহ সরে গেল।

কেউ নড়ছে না। চারজনেই তাকিয়ে রয়েছে দেয়ালের খুলে যাওয়া অংশটার দিকে। ভয়ানক কোন কিছু বেরিয়ে এল না ওপথে, তেড়ে এল না ওদের দিকে।

কিশোরের পেছনে এসে দাঁড়াল ডন। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ফোকরটার দিকে। প্রচুর ধুলো আর মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে ভেতরে। সিঁড়িটাও চোখে পড়ল। ভেতরটা এত অন্ধকার, কালি গুলে দেয়া হয়েছে যেন।

'দেখি, একটা মোমবাতি,' হাত বাড়াল কিশোর। ডনের হাত থেকে নিয়ে ফোকরের আশপাশটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখল। 'একারণেই এত নিরেট মনে হয়েছিল,' ফোকরের সরে যাওয়া অংশটা দেখে বলল সে। 'মোটা করে বানিয়ে ভেতরের ফাঁপা জায়গায় কাঠের গুঁড়ো আর গলানো প্ল্যাস্টিক এমন ঠেসে ভরে দেয়া হয়েছে, বাইরে থেকে থাবা দিলে নিরেট দেয়ালই মনে হবে। একটা মাস্টারপিস!'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল দু'জনে। নিচের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডন বলল, 'একেবারে নিচে নামবে?'

'না না, ওখানে যাওয়ার দরকার নেই!' পেছন থেকে চিৎকার করে বললেন মিসেস মরিয়াটি।

'যেতেই হবে,' কিশোর বলল। 'নইলে রহস্যের সমাধান করতে পারব না।'

'চলো, আমি নামব তোমার সঙ্গে,' ডন বলল।

'না, ডন, যাসনে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আবার মিসেস মরিয়াটি। 'কিশোর, যেয়ো না!'

'মিসেস মরিয়াটি, ভূতটা নিচে না-ও থাকতে পারে,' ফিরে আসার পাত্র নয় কিশোর। 'হয়তো বাড়ি থেকে বহুদূরে চলে গেছে এতক্ষণে।' আবার পা বাড়াতে গেল সে। পেছন থেকে তার কাঁধ খামচে ধরল ডন। 'দাঁড়াও!'

'কি হলো?'

জবাব না দিয়ে ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেল ডন। ফিরে এল পরক্ষণেই। হাতে তার কাঠের হাতুড়ি, মুখে হাসি। 'চলো।'

খাড়া নেমে গেছে গুপ্তসিঁড়ি। দেয়ালে পুরু হয়ে জমে আছে ধুলো-ময়লা। মোমের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে পুরানো কবরে নেমে যাচ্ছে ওরা। মাটির নিচে আটকে থাকা বদ্ধ বাতাসে একধরনের ভেজা ছাতলার গন্ধ।

আচমকা তীক্ষ্ণ মোড় নিল সিঁড়ি। শেষ হলো গিয়ে ছোট একটা ঘরে। দেয়ালটা তৈরি হয়েছে কংক্রীটের চারকোণা বড় বড় ফলক একটার সঙ্গে আরেকটা গেঁথে। মেঝে তৈরি হয়েছে সিমেন্টে। মোমটা উঁচু করে ধরল কিশোর। তার পাশে এসে নামল ডন।

'কই, কেউ তো নেই?' ফিসফিসিয়ে বলল ডন।

'কিন্তু এখান থেকে যাওয়ারও কোন জায়গা নেই। মেঝেতে দেখো? ধুলোয় নানারকম দাগ, নতুন পড়েছে বলেই মনে হয়।'

সিঁড়ির গোড়া থেকে সাবধানে কয়েক পা সরল দু'জনে। চোখে পড়ল দুটো

বড় বড় পুরানো তোবড়ানো ট্রাংক। ঠোঁটে আঙুল রেখে ডনকে চুপ থাকতে ইশারা করল কিশোর। ট্রাংক দুটো দেখাল। মোম হাতে দু'জনে এগোল প্রথম ট্রাংকের ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। তালা নেই। মরচে পড়া হুড়কোটা ভেঙে কাত হয়ে ঝুলছে। সেটা চেপে ধরেই ডালা তোলার জন্যে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। পুরানো মরচে পড়া কব্জায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে উঠে এল ডালা। মোম আরেকটু নিচু করে ধরল ডন। ভাল করে দেখতে চায়। ভেতরে রয়েছে পুরানো, জীর্ণ একটা স্লীপিং ব্যাগ, কয়েকটা বোতল আর টিন, প্লাস্টিকে মোড়া একটা স্যাণ্ডউইচ।

ডনের দিকে তাকাল কিশোর।

বড় বড় হয়ে গেছে ডনের চোখ। একটা ভুরু উঁচু করল কিশোর। চোখের ইশারায় দেখাল আরেকটা ট্রাংক। ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথা ঝাঁকাল ডন। হ্যাঁ, কয়েক দিন এখানেই বাস করেছে ভূতটা, হয়তো এখনও আছে। অনেক বড় ট্রাংক। মানুষ ঢুকে লুকিয়ে থাকতে পারে সহজেই। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সেটার দিকে এগোল কিশোর। মোমটা উঁচু করে ধরে রেখেছে ডন, আরেক হাতে শক্ত করে ধরেছে হাতুড়িটা, বাড়ি মারার জন্যে তৈরি।

দ্বিতীয় ট্রাংকটার হুড়কোয় হাত দিল কিশোর।

টান দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে উঠে গেল ডালাটা। দড়াম করে বাড়ি খেল গিয়ে দেয়ালে। বিকট চিৎকার হলো। দ্বিধায় ভরা একটা মুহূর্ত। তার পরেই কিশোর দেখল দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ। মাটির তলার সেই বদ্ধ ঘরটায় দাঁড়িয়ে তাজ্জব হয়ে গেল দু'জনে জাদুকর শিয়াভোর ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে।

লাফিয়ে ট্রাংক থেকে বেরিয়ে এল ভূতটা। ছুটে এল কিশোরের দিকে। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল ডনের গায়ের ওপর। ডনের হাত থেকে মোম পড়ে গিয়ে নিভে গেল। চিত হয়ে পড়ে গেল দু'জনেই। ওপর দিকে তাকিয়ে অন্ধকারেও দেখতে পেল সবুজ মুখটা। জ্বলছে। আপনাআপনি ডনের হাত থেকে হাতুড়িটা খসে পড়ে গেল। থাবা দিয়ে ভূতের লম্বা ঢোলা আলখেল্লার একটা কোণ চেপে ধরল কিশোর। কিন্তু হ্যাঁচকা টানে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড় দিল ভূত।

সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ। গড়িয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল কিশোর। হাতে কিছু রয়ে গেছে, নরম কিছু। কাপড়ের টুকরো। লাফিয়ে উঠে সে-ও ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতেই ওপর থেকে শুনতে পেল টুলসার চিৎকার।

এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল। নিচের মাটির তলার ঘরে থেকেই ওপরটা দেখতে পেল কিশোর, লাইব্রেরির পর্দা টানা জানালাও বিদ্যুতের তীব্র আলোর ঝলকানি পুরোপুরি ঠেকাতে পারেনি। সেই আলোয় দেখল সে, লম্বা, নড়বড়ে, বন্য চুলওয়ালা জীবটাকে। সিঁড়ির মাথায় উঠে গেছে, ফোকরের কাছাকাছি।

আবার চেঁচিয়ে উঠল টুলসা।

পড়িমড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল কিশোর, প্রায় লাফিয়ে বেরোল লাইব্রেরিতে। দেখল, সদর দরজার ছিটকানি খুলে ফেলছে ভূতটা। দরজার পাল্লা হাঁ করে খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে ঝড়ের মধ্যে। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। আরেকবার বন্য চুলের উদ্দাম নৃত্য চোখে পড়ল কিশোরের। বাজ পড়ল পাহাড়ের মাথায়। হারিয়ে গেল মূর্তিটা।

জোরে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস মরিয়াটি। বিড়বিড় করে কিছু বললেন। বোধহয় ঈশ্বরেরই নাম নিলেন।

হাঁপাচ্ছে কিশোর। তবে মুখে হাসি ফুটেছে। 'একটা আজব ভূত। ওর আলখেল্লার কোণা ছিঁড়ে রেখে দিয়েছি আমি।'

নয়

আটটার অনেক পরে মরিয়াটি হাউসে ফিরে এল মুসারা। তাকে আর রবিনকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল না হ্যানসন। সঙ্গে এল। ওই সময় মাটির তলার ঘরে ট্রাংকগুলোর ভেতরে খুঁজে দেখছে কিশোর আর ডন। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে টুলসা। মিসেস মরিয়াটি পুলিশকে ফোন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু রিসিভারে ডায়াল টোনই পাচ্ছেন না।

'আরেকটু হলেই শিয়াভোর ভূতটাকে ধরে ফেলেছিলাম আমরা,' মুসাদেরকে জানাল টুলসা। 'আমাদের বাড়ির নিচেই পাতালঘরে বাস করছিল সে। এসো, দেখে যাও।'

রবিন আর মুসাকে নিয়ে লাইব্রেরিতে এল সে। সঙ্গে এল হ্যানসন। গুপ্তদরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে ডনকে ডাক দিল কিশোর। সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দু'জনে। ধুলোয় মাখামাখি। তবে কিশোরের মুখে হাসি।

'জানতাম ওটা ভূত নয়,' বলল সে। 'মাটির নিচের ঘরে লুকিয়ে ছিল লোকটা। কি করে ঢুকল বলতে পারব না। টিনে ভরে খাবার আর বোতলে ভরে পানি নিয়ে গিয়েছিল। পুরানো একটা স্লীপিং ব্যাগও পেয়েছি। একটা আয়না, একটা টর্চ আর মেকাপের জিনিসপত্র সাথে রেখেছিল, ভূত সাজার জন্যে।'

বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে হল থেকে ফিরে এলেন মিসেস মরিয়াটি। 'পুলিশকে খবর দিতে পারলাম না। ঝড়ে টেলিফোন লাইনও ছিঁড়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই আমাদের,' টুলসা বলল, 'ভূতটা পালিয়েছে। আর যেই হোক, সিনর পিটাক কিংবা সেই রোগা চোরটা যে নয়, এটা বুঝে গেছি। ভূতটা অনেক বেশি লম্বা, ওদের দু'জনের চেয়ে বেশি।'

'বেরোল কি করে?' মুসার প্রশ্ন। 'আটকাতে পারলে না? কতক্ষণ আগে গেছে?'

'এই মিনিট বিশেক,' জবাব দিল ডন। 'আটকাতে তো চেয়েইছিলাম। হাতুড়ি নিয়ে নেমেছিলাম পাতালঘরে। কিন্তু এমন আচমকা বেরিয়ে এল, বিকট চেহারা করে, চিৎকার করতে করতে, ঘাবড়েই গেলাম। এই সুযোগে আমার গায়ে কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ছুটে পালাল।'

টুলসা বলল, 'আমিও তৈরি হয়েই ছিলাম। কিন্তু লাভ হলো না। চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে গেলাম। বাধা দেয়ার আগেই পালিয়ে গেল। যা কিছু করতে পেরেছে, সে কেবল কিশোর। আলখেল্লা চেপে ধরেছিল। ছিঁড়ে রয়ে গেছে খানিকটা কাপড়। এটা দেখিয়ে কাল নাকি বের করার চেষ্টা করবে আলখেল্লাটা কোত্থেকে এসেছে।'

'সাধারণ হলে হয়তো পারতাম না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু জিনিসটা বেশ অদ্ভুত। মোটা কালো রঙের উল আর রুপার সুতো মিশিয়ে তৈরি হয়েছে কাপড়ের সুতো। আমাদের রহস্যময় ভূতের বিরুদ্ধে এটা একটা মূল্যবান সূত্র হতে পারে। তোমাদের খবর বলো।'

'পিটাককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে,' মুসা জানাল। 'চোরটা ওর সহকারী নয়।' কি কি ঘটেছে খুলে বলল সে। শেষে বলল, 'পিটাককে পিটিয়ে বেহুঁশ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে সে। বোধহয় সার্ভিস এনট্র্যান্স দিয়ে পালিয়েছে। সদর দরজায় চোখ রেখেছিল হ্যানসন আর রবিন, ওরা ওকে বেরোতে দেখেনি। অ্যাম্বুলেন্স এসে পিটারকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি আমরা।'

'নিজের গালেই জুতো মারতে ইচ্ছে করছে এখন আমার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'সার্ভিস এনট্র্যান্সের কাছে থাকতে পারতাম আমি। হ্যানসন তো ছিলই সামনের দিকে, সদর দরজার ওপর সহজেই নজর রাখতে পারত, আমি পেছন দিকে থাকলে ওর পিছু নিতে পারতাম, অন্তত গাড়ির লাইসেন্স নম্বরটা তো রাখতে পারতাম।'

'চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে,' হ্যানসন বলল। 'আসলে, ওর সাথে যে সিনর পিটাকের সম্পর্ক নেই এটাই ভাবিনি আমরা। ভেবেছি তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। তাই আর দু'দিকে চোখ রাখার প্রয়োজন মনে করিনি।'

'তুমি একাই সূত্র পাওনি,' হেসে পকেট থেকে দোমড়ানো কাগজের টুকরোটা বের করল মুসা, 'আমিও পেয়েছি। চোরটার হাত থেকে এটা পড়ে গিয়েছিল। পড়তে পারিনি। ইংরেজি নয়। স্প্যানিশ। লোকটা যখন এত আগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছিল, নিশ্চয় জরুরী জিনিস। সম্ভবত একটা চিঠি। মিসেস মরিয়াটি, আপনার নাম লেখা রয়েছে এটাতে।'

'তাই?' বসে পড়লেন মিসেস মরিয়াটি।

আলো জ্বলে উঠল।

'যাক, এল,' ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস মরিয়াটি। 'টুলসা, মোমগুলো নেভা। দেখি তো, কাগজটায় কি লেখা আছে?' মুসার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

চিঠিটা নিয়ে তাতে চোখ বোলালেন। 'পাঁচদিন আগের তারিখ,' বললেন তিনি। 'অ্যাড্রেস করা হয়েছে অ্যাটনিকে।' মুখ তুললেন। 'অ্যাটনি সম্ভবত পিটাকের ফার্স্ট নেম, এখানে প্রথম এসে ওই নামই বলেছিল।' আবার তাকালেন চিঠির দিকে। 'স্প্যানিশ খুব ভাল জানি না, তবে পড়তে পারছি। লিখেছে ঃ

মাই ডিয়ার অ্যাটনি
শিয়াডো গ্লাসের ইতিহাস মিসেস মরিয়াটিকে বলে ঠিকই করেছ। কাগজপত্র জোগাড় করে পাঠাতে সময় লাগবে। যদি ওগুলো ছাড়াই জায়গাটা কিনতে পারো, যত তাড়াতাড়ি পারো, ততই ভাল। লিও পোয়েল্লার ভয় পাচ্ছি আমি। ভীষণ পাজি লোক, বিপজ্জনক। তোমার জন্যে, মিসেস মরিয়াটির জন্যে, পুরো রাকিনোর জন্যে ভয় পাচ্ছি আমি।

আয়না থেকে যেন কিছুতেই গোপন জিনিসটা বের করতে না পারে গোয়েরা। পারলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা হবে। জেনেছি লস অ্যাঞ্জেলেসে গোয়েরার কয়েকজন চাচাত ভাই আছে। সিলভার লেকে থাকে ওরা। ওদের সাহায্য পেতে পারে সে। হয়তো ওখানেই বাস করছে। কোথায় আছে বের করার চেষ্টা করো, করতে পারলে তার ওপর নজর রাখো। আয়নাটা হাত করার চেষ্টা করো। আয়নাটা যেন কোনমতেই গোয়েরার হাতে না পড়ে। খুব সাবধানে থাকবে। আমার বয়েস হয়েছে, একা আর পারছি না। তোমাকে এখানে পেলে ভাল হত। তোমার তরুণ চোখ দিয়ে রাফিনোকে দেখতে পারলে এখন আর কিছুই চাইতাম না।

এ. ডি. এফ.

চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মিসেস মরিয়াটি। কিশোরের পড়া শেষ হলেও চুপ করে রইলেন পুরো এক মিনিট। তারপর বললেন, 'মনে হচ্ছে নিঃসঙ্গ কোন বুড়ো মানুষের লেখা।'

'হ্যাঁ, উঁচু পদে নিয়োজিত,' কিশোর বলল। 'যে লোক ভয় পাচ্ছে অনেকের জন্যে, অনেকের জন্যে চিন্তিত। পিটাকের জন্যে, আপনার জন্যে, রাফিনোর অধিবাসীর জন্যে। মিসেস মরিয়াটি, কে লিখেছে আন্দাজ করতে পারেন? আপনার বান্ধবী সিনোরা পিলভারেজকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন, কার নামের আদ্যাক্ষর এ ডি এফ? রাফিনোতে তাঁর স্বামী একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। অনেককেই চিনতেন। সিনোরাও হয়তো চিনতে পারেন।'

মাথা নাড়লেন মিসেস মরিয়াটি। 'না। ওর স্বামীকে নিয়ে আমাদের কোন আলোচনাই হত না, ওর কথা পারতপক্ষে বলতে চাইত না। চিঠিতে লিখত না। ওই লোকটাকে বিয়ে করে সারাটা জীবন অশান্তি ভোগ করেছে।'

'নানী,' টুলসা বলল, 'তুমি কাউকে পছন্দ না করলে তার কোন কিছুই ভাল বলো না। সবার কাছেই তার কুৎসা গাইতে থাকো।'

'ঠিকই বলেছিস,' লজ্জিত হলেন মিসেস মরিয়াটি। 'এভাবে কারও সমালোচনা করা উচিত না আমার। বলতে শুরু করলে বেশিই বলে ফেলি, আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আমার। কিন্তু দিয়েগো পিলভারেজকে পছন্দ করতে পারিনি আমি, কি করব? আমি কোনদিনই ভেবে পাইনি, ওরকম একটা লোককে কেন বিয়ে করেছিল এলিজাবেথ। শুরুতে যতটা করতাম, যত দিন গেল, লোকটা সরকারী কাজে আরও উঁচু পদ পেল, উন্নতি করতে লাগল, ততই বেশি অপছন্দ করতে লাগলাম। বাজে একটা মুদ্রাদোষ ছিল তার, কথা বলতে গেলেই জিভ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করত, ভঙ্গিটা এমন যেন সবজান্তা, দুনিয়ায় তার মত জ্ঞানী আর একজনও নেই। ওর সাথে সম্পর্ক ভাল থাকলে অবশ্য রাফিনোর ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতে পারতাম। নাহ্, চিঠিটা কে লিখেছে বলতে পারব না।'

'এখানে অ্যালম্যানাক আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'দেশবিদেশের অনেক তথ্য থাকে তো ওগুলোতে, রাফিনোর কথাও হয়তো থাকতে পারে।'

টুলসা বলল, 'আমার কাছে একটা আছে। দাঁড়াও, বের করে আনছি।'

ভারি একটা বই নিয়ে এল টুলসা। ঘাঁটতে শুরু করল রবিন। বের করতে সময় লাগল না। তবে রাফিনোর কথা খুব সামান্যই লেখা আছে, মাত্র আধ পৃষ্ঠা। এত অল্প কথায় তথ্য তেমন একটা দিতে পারেনি।

'গণতান্ত্রিক দেশ,' লেখাটা পড়ে বলল রবিন। 'সরকার গঠন পদ্ধতি অনেকটা আমেরিকার মতই। সিনেট আছে, আটাত্তর জন রিপ্রেজেনটেটিভ আছে। প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে একজিকিউটিভ কাউন্সিল আছে...'

'কটমটে ওসব পলিটিক্যাল ব্যাপার বাদ দাও না,' বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'আসল কথাটা বলো। জেনেছ তো কিছু, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

হাসল রবিন। 'সিনেটর কিংবা রিপ্রেজেনটেটিভদের নাম দেয়নি, তবে প্রেসিডেন্টের নাম দিয়েছে।'

'বলে ফেলো।'

'এমিলানো ডা ফাইবার।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল সবাই। তারপর উঠে পায়চারি শুরু করল কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। একসময় বলল, 'এই চিঠি অনেক তথ্য দিয়েছে আমাদের। লিও গোয়েরা নামে একটা লোকের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। সতর্ক থাকতে বলেছে। মনে হচ্ছে এই লিও গোয়েরাই আমাদের রোগাটে চোর। পিটাক আর সে একে অন্যের দুশমন। দু'জনেই আয়নাটা চাইছে। আজ চোরটা পিটাককে জখম করেছে। হয়তো মেরেই ফেলতে চেয়েছিল, কে জানে। লোকটা আসলেই ডেঞ্জারাস। আরও একটা ব্যাপার জানা গেল, পিটাক নিজের জন্যে নয়, অন্য কারও জন্যে চাইছে আয়নাটা। রাফিনোর উচ্চপদস্থ কোন লোকের জন্যে। সাংঘাতিক মূল্যবান কোন কিছু জড়িয়ে আছে এই আয়নার সাথে। শিয়াভোর বংশধর পিটাক, কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। স্পেন থেকে যদি কোন কাগজপত্র আসেই, সেগুলো হবে জাল। তবে একটা ব্যাপারে শিওর, পিটাক রাফিনোর নাগরিক।'

আনমনে মাথা নাড়তে লাগলেন মিসেস মরিয়াটি। 'বেচারি এলিজাবেথ! এই চিঠির লেখক রাফিনোর প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকলে বেচারির কপালে আরও দুঃখ আছে। গণ্ডগোল হওয়ার আগেই এটার একটা উপায় করা উচিত।'

'কি করবে?' জানতে চাইল টুলসা।

'পুলিশকে খবর দেব। সমস্ত ঘটনা ওদেরকে জানানো উচিত।' একে একে কিশোর, রবিন আর মুসার দিকে তাকালেন মিসেস মরিয়াটি। 'ভূতুড়ে আয়নার রহস্য ভেদ করার জন্যে ডেকেছিলাম তোমাদের। করে ফেলেছ। এবার তোমাদের ছুটি। আর কোন বিপদের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। তেমন গোলমালের সম্ভাবনা বুঝলে আয়নাটা আমি বিদেয় করে দেব, ঝামেলা চুকে যাবে।'

'মিসেস মরিয়াটি,' কিশোর বলল, 'একটা রহস্যের সমাধান করেছি, কিন্তু আরও একটা রহস্য বাকি। নিশ্চয় আয়নার মধ্যে কিছু লুকানো রয়েছে, যার জন্যে খেপার মত হয়ে গেছে লোকগুলো। সেটা বের করার চেষ্টা করব?'

উসখুস করে মুসা বলল, 'যদি সত্যি সত্যি ভূত বেরিয়ে পড়ে?'

রবিন বলল, 'এখনও বিশ্বাস করছ এর ভেতরে ভূত আছে? এত কিছুর পরেও?'

কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না মুসা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কেবল।

মই আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনতে রান্নাঘরে চলে গেল ডন। নিয়ে এল। সে, তিন গোয়েন্দা আর হ্যানসন পাঁচজনে মিলেও আয়নাটা দেয়ালের কাছ থেকে সরাতে অনেক বেগ পেতে হলো, এতটাই ভারি। ইস্পাতের ফ্রেমের সাথে কাঠের ব্যাকিং লাগানো রয়েছে আয়নার পেছনে, স্ক্রু খুলে সেটা খুলে নিল কিশোর। ভেতরে কিছু নেই। ফ্রেমের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল সে। কিছু পেল না। এমন কোন গুপ্তকুঠুরিই নেই যে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে। বিশাল কুৎসিত একটা ফ্রেম, পুরানো একটা আয়না, আর একটা কাঠের ব্যাকিং যেটা বহুবার মেরামত করা হয়েছে। কাঠের গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে, অক্ষরগুলো মলিন হয়ে গেছে, উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। মাদ্রিদ আর রাফিনোর কারিগরদের নাম-ঠিকানা রয়েছে ওসব লেবেলে, যারা আয়নাটা তৈরি করেছে। পুরানো লেবেলগুলোর মাঝে নতুন একটা লেবেল আছে, সম্ভবত কয়েক দিন আগে মেরামত করা হয়েছিল আয়নার ফ্রেম।

গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে খুলে ফেলা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিড়বিড় করল, 'কি এমন রয়েছে এটাতে, যা একটা দেশের একজন প্রেসিডেন্টকেও আগ্রহী করে তুলেছে?'

দশ

পরদিন সকালে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রবিন। লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবে, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের পুরানো কপিগুলো ঘেঁটে দেখবে রিপাবলিক অভ রাফিনো সম্পর্কে কিছু আছে কিনা। ম্যাজিশিয়ান টেরিয়ানো আর হলিউড হিলসে তার বাড়িটার সংবাদ বেরিয়েছে কিনা তা-ও খুঁজবে।

ইয়ার্ডের দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন বোরিসের সঙ্গে পুরানো পিকআপে করে কিশোর আর মুসা চলল হলিউডে, পুরানো একটা ডাইনিং টেবিল কাস্টোমারের বাড়িতে দিয়ে আসতে।

ফ্রিওয়ে ধরে চলেছে গাড়ি। কিশোর বলল, 'পিটাক এখনও হাসপাতালে। কাল রাতে বেভারলি হিলসের হাসপাতালগুলোতে ফোন করে খোঁজ নিয়েছিলাম। বেভারলি ক্রেস্ট মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। কাল রাতে তার সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়নি কাউকে। আজ সকালে আবার করেছি। জিজ্ঞেস করল লাইন দেবে কিনা। বুঝলাম আঘাতটা তত মারাত্মক নয়।'

'শুনে খুশি হলাম,' মুসা বলল। 'লোকটা ভাল না মন্দ জানি না। তবে যে তাকে বাড়ি মেরেছে সেই লোকটা যে খারাপ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।'

'লিও গোয়েরা। শয়তান লোকটার নাম লিও গোয়েরা। আজ সকালে টেলিফোন ডিরেকটরি ঘেঁটে দেখল সিলভার লেকে গোয়েরা অনেক আছে। যাদের

সাথে রয়েছে সে তাদেরও মধ্যে কেউ গোয়েরা আছে কিনা বলতে পারছি না। তাদের টেলিফোন আছে কিনা তা-ও এখন বলা যাচ্ছে না। যাই হোক, গোয়েরাকে নিয়ে আজ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।'

'আজ কি করবে?'

পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। 'চাচীকে আলখেল্লার ছেঁড়া টুকরোটা দেখিয়েছিলাম। আমার সাথে একমত হলো। বলল সাধারণ কাপড় নয় ওটা। হলিউডের কস্টিউম শপগুলোতে খোঁজ করব। আলখেল্লাটা কোন না কোন জায়গা থেকে কিনতে হয়েছে ভূতটাকে। এধরনের জিনিস কস্টিউম শপে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।'

কিশোরের হাতের নোটবুকের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'লিস্ট করেছ দেখছি। কতগুলো কস্টিউম শপ আছে?'

'অনেক।'

'খাইছে!'

'খাওয়াখাওয়ির কিছু নেই। ভাল গোয়েন্দা হতে চাইলে ওটুকু কষ্ট করতেই হবে।'

ফ্রিওয়ে থেকে নেমে পড়ল ট্রাক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সানসেট বুলভারের ভাইন স্ট্রীটে এনে গাড়ি রাখল বোরিস। নামল দুই গোয়েন্দা।

'আবার এসে তুলে নিতে হবে তোমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'না, লাগবে না,' কিশোর বলল। 'বাসে করেই চলে যেতে পারব। কতক্ষণ লাগবে আমাদের বলতে পারছি না। সারাদিনই থাকতে হতে পারে হলিউডে।'

'তোমার চাচী রেগে যাবেন,' সাবধান করে দিল বোরিস। 'শনিবারে সারাদিন বাইরে থাকা তিনি পছন্দ করেন না।'

'জানি,' কিশোর বলল। 'চুপ করে থাকব। কতক্ষণ আর বকবে?'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল বোরিস। খোঁজা শুরু করল দু'জনে। কিশোরের তালিকার প্রথম দোকানটা ভাইন স্ট্রীটে। বিশাল এক বাড়িতে ঢুকল ওরা। অনেকটা গুদামঘরের মত বাড়ি। দরজার পাশে ছোট অফিস। হাসিখুশি টাকমাথা একজন লোক বসে ট্রেড ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। অফিসের পর থেকেই শুরু হয়েছে সারি সারি তাক, কস্টিউমে বোঝাই, যত রঙের যত ধরনের হতে পারে সব আছে।

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। 'বলো?'

কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোটা বের করল কিশোর। 'আমার চাচী এই কাপড়ের পোশাক চায়। পার্টির জন্যে একটা চেয়ে এনেছিল বান্ধবীর কাছ থেকে, ছিঁড়ে ফেলেছে। এখন সে রকম একটা কিনে ফেরত দিতে চায়। সাধারণ কাপড়ের দোকানে অনেক খুঁজেছে, পায়নি। তাই আপনাদের কাছে আসতে হলো। এরকম কিছু কি আছে? জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

টুকরোটা হাতে নিয়ে দুই আঙুলে ডলে দেখল লোকটা। 'হুম্! উল। ড্যালটন মিলে এ জিনিস তৈরি হয় বলে জানি। তবে আমরা কখনও আনিনি।' ফেরত দিতে দিতে বলল, 'সরি।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'আমি হলে এখনই খোঁজা বাদ দিয়ে চলে যেতাম,' মুসা বলল। 'বুঝতে পারছি লাভ হবে না।'

'মাত্র তো শুরু করলাম। কস্টিউম যারা ভাড়া দেয় তারা কোন জিনিস ফেলে না। নষ্ট হলে ঠিকঠাক করে নিয়ে ধোলাই করে সাজিয়ে রেখে দেয়।'

দ্বিতীয় দোকানের মালিক জানাল এরকম কাপড় দেখেইনি কোনদিন। তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম দোকানদারও একই কথা বলল। বেলা এগারোটা নাগাদ সান্তা মনিকার ল্যানসেট কস্টিউম কোম্পানির বিল্ডিংটার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। যে শপগুলো ঘুরে এসেছে ওগুলোর মত এটাতেও প্রায় সেরকমই দরজার কাছে অফিস ঘর। রুক্ষ চেহারার একজন লোক কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট টানছে।

ছেঁড়া টুকরোটা দেখিয়ে একই গল্প শোনাতে গেল কিশোর।

দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট সরিয়ে এনে জ্বলন্ত চোখে কাপড়টার দিকে তাকাল লোকটা। ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কিশোরের হাত থেকে। খেঁকিয়ে উঠল, 'ও, শেষ করে ফেলেছে তাহলে! নষ্ট করে দিয়েছে!'

বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল কিশোরের। 'শেষ করে ফেলেছে মানে?'

'ন্যাকা! কিছু জানে না!' ধমকে উঠল লোকটা। 'টেরিয়ানোর আলখেল্লা মারকাস হারামজাদার কাছে ভাড়া দিয়েই আমি গাধামি করেছি!' আবার কর্কশ হয়ে গেল লোকটার কণ্ঠ। 'হারামজাদাকে গিয়ে বলো আলখেল্লাটা যাতে ফেরত দেয়। মেরামত করতে যা টাকা লাগবে সেটা ওকেই দিতে হবে। নিজে নিজে কিছু করতে গিয়ে যেন আরও খারাপ করে না ফেলে, বলে দেবে। যাও এখন!'

'আমার চাচীর পোশাক…'

'দেখো ছেলে, এটা তোমার চাচীর পোশাক নয়। আর চাচীরা এসব পোশাক পরে না, আমাকে বোঝাতে এসো না। জলদি গিয়ে মারকাস হারামজাদাকে বলো আমার জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে যেতে। আমি গেলে ওর একটা দাঁতও জায়গামত থাকবে না, বলে দিয়ো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে বলবে।'

'কিন্তু মারকাস কোথায় থাকে জানি না তো,' নিজের দাঁত জায়গামত রাখার জন্যে মিন মিন করে বলল কিশোর।

'তাহলে কোথায় দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে তোমার? ভার্জিনিয়া অ্যাভেন্যুতে ওর বোর্ডিং টাউন, যাও জলদি। মনে থাকে যেন, পাঁচ মিনিট।'

তাড়াহুড়ো করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। বাইরে বেরিয়েই শব্দ করে হেসে উঠল কিশোর, 'দারুণ! দুর্দান্ত! চমৎকার খবর পেলাম! মারকাস নামে একজন ভাড়া করে নিয়ে গেছে টেরিয়ানোর আলখেল্লা। নিয়ে গিয়ে ভূতুড়ে করে তুলেছে টেরিয়ানোরই বাড়ির আয়না। যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেছি। এত তাড়াতাড়ি ভূতটার খবর পাব কল্পনাই করতে পারিনি।'

'বাস করে ভার্জিনিয়া অ্যাভেন্যুর একটা রুমিং হাউসে,' মুসা বলল। 'পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে, তারমানে বাড়িটা খুব কাছাকাছিই আছে।'

'চলো দেখি।'

বাড়িটা খুঁজে পেতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। ভার্জিনিয়া অ্যাভেন্যুর

বেশির ভাগ বাড়িই নতুন, পুরানো বাড়ি বলতে এই একটা বাড়িই চোখে পড়ল ওদের। বিল্ডিংটা মলিন, কিন্তু সামনের ফুল বাগানটা বেশ ঝলমলে। সুন্দর করে ছেঁটে রাখা হয়েছে লনের ঘাস, ফ্লাওয়ার বেডগুলোরও নিয়মিত যত্ন করা হয়। গেটের পাশে নোটিশ ঝোলানো রয়েছে ঃ ঘর ভাড়া দেওয়া হইবে।

'পেলাম তো। এবার?' মুসার প্রশ্ন। 'সোজা গিয়ে মারকাসকে জিজ্ঞেস করব সে-ই ভূত সেজেছিল কিনা?'

'আমাকে চিনে ফেলতে পারে, এবং সেটা উচিত হবে না। এক কাজ করি বরং। সোশ্যাল স্টাডিস ক্লাসের জন্যে সার্ভে করার ভান করি। বাড়িওয়ালিকে জিজ্ঞেস করি, কতজন ভাড়া থাকে এখানে, তাদের আয়ের উৎস কি?'

'ভাল। তবে আলোচনাটা তোমাকেই চালাতে হবে। অত গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারি না আমি।'

'ঠিক আছে, আমিই কথা বলব।' পকেট থেকে নোটবুক বের করে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল কিশোর, কলিং বেল বাজাল।

দরজা খুলে দিলেন এক প্রৌঢ়া, ধূসর হয়ে গেছে চুল। 'কি চাই?'

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ম্যা'ম,' কিশোর বলল, 'ইসকুলের জন্যে একটা সার্ভে করতে এসেছি।'

'কিন্তু এখন তো গরমকাল,' সরু হয়ে এল মহিলার চোখের পাতা, সন্দেহ করে বসেছেন, 'স্কুল ছুটি।'

কেঁদে ফেলবে যেন কিশোর। 'কিন্তু আমাদের জন্যে নয়, ম্যা'ম। জুনের ফাইন্যাল এক্সাম পাস করতে পারিনি আমরা, কাজটা শেষ করে দিতে না পারলে এবার আর গ্রেড দেয়া হবে না আমাদের।'

'সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় আছি,' সুর মেলাল মুসা।

'ও। বেশ, এসো,' দরজা পুরো খুলে দিলেন মহিলা। 'দেখে তো ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। কি জানতে চাও?'

'প্রথমে বলুন,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কত লোক বাস করে?'

'ছয়জন। আমি ছাড়া আর পাঁচজন বোর্ডার।'

লিখে নিল কিশোর।

'সবাই কি স্থায়ী ভাড়াটে? মানে অনেকদিন হলো এসেছে? নাকি আসে আর যায় ওরকম?'

'না না, স্থায়ী,' গর্বের সঙ্গেই বললেন মহিলা। 'আমার এখান থেকে কেউ যেতে চায় না। ভাড়াটেদের সমস্ত সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখি আমি। যাবে কেন? এই তো, মিস্টার রবার্ট তো পাঁচ বছর ধরে আছে।'

'বাইরে ঘর ভাড়ার নোটিশ দেখলাম? চলে যাচ্ছে নাকি কেউ?'

'হ্যাঁ, চলে গেছে। মিস্টার মারকাস। হঠাৎ করেই চলে গেল। অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে। অবশ্য থিয়েটারের লোকেরা অদ্ভুতই হয়, কি বলো?'

'অনেক দিন ধরে ছিল এখানে?'

'অনেক দিন। চার বছর। তবে চলে যাওয়াটা বড়ই অস্বাভাবিক। কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। কোনখান থেকে চিঠিটিঠি এলে যে নিয়ে যাবে পোস্টম্যান,

তারও উপায় নেই।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই,' একমত হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। 'আরও একটা কথা ঠিক বলেছেন আপনি, থিয়েটারের লোকেরা ওরকমই হয়। অভিনেতা ছিল নাকি?'

'ম্যাজিশিয়ান,' মহিলা জানালেন। 'ইদানীং কাজকর্ম তেমন পেত না, বেঁচে থাকার জন্যে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হত। সান্তা মনিকা আর ফাউনটেইন যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই মোড়টার কাছে তার স্ট্যাণ্ড।'

'তাই।' নোটবুক বন্ধ করল কিশোর। কলমের ক্যাপ লাগিয়ে পকেটে গুঁজল। 'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর মাত্র চারটে ইন্টারভিউ নিতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'না না, ও কিছু না। তোমরা ভাল ছেলে, ঠিকমত গ্রেডটা পেয়ে যাও এটাই আমি চাই।'

ওরা বেরোলে দরজা বন্ধ করে দিলেন বাড়িওয়ালী। দরজা বন্ধ হওয়ার পর আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না দু'জনে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল বাস স্টপেজে। বাসে চড়ল।

কিশোর বলল, 'যত তাড়াতাড়িই করি, গিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, নিউজ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে পাব না মারকাসকে।'

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। স্ট্যাণ্ডটা বন্ধ। দরজায় তালা দেয়া। একগাদা খবরের কাগজ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বারান্দার কোণে।

'আজকের কাগজগুলো খুলেও দেখেনি,' কাগজের বাণ্ডিলের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'মারকাস, অর্থাৎ আমাদের ভূত মিয়া গায়েব হয়ে গেছে!'

এগারো

দুপুরের পর পর রকি বীচে এসে বাস থেকে নামল কিশোর আর মুসা।

'গিয়ে এখন চাচীর সামনে না পড়লেই বাঁচি,' কিশোর বলল। 'অত তাড়াতাড়ি ফিরব না জানে। দেখলেই খুশি হয়ে উঠবে। ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে। ওসব করতে এখন ভাল্লাগবে না। রবিনকে ফোন করে জানা দরকার পত্রিকা থেকে সে কিছু বের করতে পারল কিনা।'

'ঢুকব কোন দিক দিয়ে? লাল কুকুর চার?'

'হ্যাঁ। তাহলে চাচী দেখতে পাবে না।'

বেড়ার বাইরে দিয়ে ঘুরে ইয়ার্ডের পেছনে চলে এল ওরা। অসংখ্য ছবি আঁকা রয়েছে বেড়ার গায়ে। বিচিত্র এই ছবিগুলো রকি বীচেরই একজন আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। ১৯০৬ সালে স্যান ফ্র্যান্সিসকোতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, সেই ছবি আঁকা রয়েছে এক জায়গায়। ছোট একটা কুকুর দূরে বসে অবাক চোখে দেখছে সেই আগুন। কুকুরটার চোখ হলো গুপ্তদরজার সুইচ। টিপে দিতেই খুলে গেল দরজা। এটাই হলো লাল কুকুর চার, হেডকোয়ার্টারে ঢোকার অনেকগুলো গোপনপথের একটা। ঢুকে পড়ল দু'জনে; পেছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। জঞ্জালের সারির ভেতর দিয়ে চলে গেছে একটা

সরু পথ। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।

রবিনকে ফোন করার আর দরকার হলো না। দু'জনে ভেতরে ঢুকে দেখল অফিসে আগেই ঢুকে বসে আছে সে। ডেস্কের ওপর ছড়ানো বই আর ম্যাগাজিন। সেগুলো থেকে নোট নিচ্ছে।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল রবিন। 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? কিছু করতে পারোনি?'

ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কিশোর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল মুসা।

'পেয়েছি,' জানাল কিশোর। 'আমাদের ভূতের পরিচয়। ম্যাজিশিয়ান, নাম মারকাস। থিয়েটারে কাজ করত। উধাও হয়ে গেছে।'

মুসা যোগ করল, 'আমি শিওর, ওকে পিটাকই ভাড়া করেছিল মিসেস মরিয়াটিকে ভয় দেখানোর জন্যে।'

'তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন।

'কেন, কিছু পেয়েছ নাকি?' সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'মারকাসের কথা কিছু জেনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'লিখে নিয়ে এসেছি।' একটা কাগজ টেনে নিল সে। 'মাইক্রোফিল্ম ঘেঁটে রাফিনো আর টেরিয়ানোর খবর যা যা পেয়েছি সব লিখে নিয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় টেরিয়ানোর বাড়িটার আগাগোড়া আমাদের ভূতের চেনা, নইলে গুপ্তঘরটা বের করতে পারত না। অনেক পার্টি দিয়েছে টেরিয়ানো। সেগুলোতে খবরের কাগজের লোককেও দাওয়াত করেছে। যাতে তার নাম ছাপা হয় কাগজে। একটা পার্টিতে নতুন একজনকে দাওয়াত করেছিল সে, যাকে আগে কখনও করেনি, সেই লোক ম্যাজিশিয়ান। রাফিনো থেকে সবে এসেছে তখন আমেরিকায়।'

'ইন্টারেসটিং,' আগ্রহ বাড়ছে কিশোরের।

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছে টেরিয়ানো, কিন্তু বাড়িতে ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করেনি। কোন একটা ছুতো পেলেই পার্টি দিয়ে লোককে দাওয়াত করত, তাদেরকে ম্যাজিক দেখাত। নতুন ম্যাজিশিয়ানদের শেখানোর চেষ্টা করত যা ওরা জানে না। এদেশে এসে, আমার ধারণা, মারকাস ম্যাজিকে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।'

'তাহলে রাফিনো থেকে এসেছে মারকাস,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ভুতুড়ে আয়নাটাও এসেছে রাফিনো থেকে। রাফিনোরই কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা সেটা ফেরত চায়, সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছে সিনর পিটাককে। আরও একজন চায়, সে হলো আমাদের রোগাটে চোর, লিও গোয়েরা। মারকাসও আয়নাটা চায় না তো?'

'ওকে পিটাকই ভাড়া করেছে,' আগের বিশ্বাসটাই ধরে রাখল মুসা। 'মারকাসও এসেছে রাফিনো থেকে। পিটাক তাকে চেনে। ভাড়া করেছে।'

'কিংবা মিসেস মরিয়াটিকে ভয় দেখাতে চেয়েছে মারকাস যাতে আয়নাটা তিনি বিক্রি করে দেন,' কিশোর বলল। 'এমনও হতে পারে, লিও গোয়েরার

সাথেই হাত মিলিয়েছে সে।'

'লিও গোয়েরাও যদি আয়নাটা এতটাই চায়,' রবিন বলল, 'মারকাসকে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে ঘরটা যখন খালি ছিল বের করে নিয়ে যায়নি কেন? মিসেস মরিয়াটি তো বহুবারই বাড়ি খালি ফেলে বেরিয়ে গেছেন। গত হপ্তায়ই অন্তত দু'বার বেরিয়েছেন তিনি। সুযোগ পেয়েছে দু'জনে।'

'নিতে পারেনি, তার কারণ,' মুসা বলল, 'আয়নাটা বেজায় ভারি। দু'জনের পক্ষে বয়ে নেয়া সম্ভব না। মনে নেই, দেয়ালের কাছ থেকে সরাতেই আমাদের পাঁচ-পাঁচজন মানুষকে হিমশিম খেতে হয়েছে? একজন বা দু'জনের পক্ষে অসম্ভব। তবে আয়নাটার ব্যাপারে অনেক খবর জানা থাকতে পারে মারকাসের। সে রাফিনোর লোক। জেনে গেছে সিনোরা পিলভারেজ আয়নাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন মিসেস মরিয়াটিকে।'

'সুতরাং সে খবরের কাগজের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, টেরিয়ানোর পুরানো আলখেল্লা পরে, ভূত সেজে গিয়ে হাজির হয়েছে আয়নাটাকে ভূতুড়ে করে তোলার জন্যে,' কিশোর বলল। 'রহস্যের জটিলতা আমার ভালই লাগে। এটাও লাগছে। আস্তে আস্তে চরিত্র বাড়ছে। একটা আয়না নিয়ে অনেককে আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে। মারকাসকে নিয়ে মাথা ঘামানো আপাতত থাক। রাফিনোর কথা কি জেনেছ?'

'চারটে আর্টিক্যাল পেয়েছি,' রবিন জানাল, 'আর একটা বই। রাফিনো একটা আইল্যাণ্ড কান্ট্রি, দ্বীপের দেশ, যেখানকার লোকেদের প্রধান পেশা চাষবাস, আখ আর কলা ফলানো। চমৎকার আবহাওয়া ওখানে, সুখশান্তি রয়েছে, খারাপ ঘটনা তেমন ঘটে না। আঠারোশো বাহাত্তর সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ কলোনি ছিল ওখানে, তারপরই ঘটে বিদ্রোহ।'

'রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায় নিশ্চয়?' মুসা বলল।

'না। অনেক বেশি সভ্য মনে হয় ওখানকার লোক। কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী আর রাজনৈতিক নেতা মিলে গিয়ে গভর্নরকে বলল, যে স্পেন থেকে গিয়ে শাসন করছিল ওখানে, তোমাকে আর আমরা চাই না। ধরে তাকে সোজা মাদ্রিদে পাঠিয়ে দিল তারা। স্প্যানিশরা প্রতিবাদ করল না, যুদ্ধ ঘোষণা করল না, নির্বিবাদে মেনে নিল সব কিছু। রাফিনোরা নিজেরা সরকার গঠন করল। টাইমসে বেরোনো তিন মাস আগের একটা খবরে জানলাম বর্তমান প্রেসিডেন্ট এই শীতের মধ্যেই নতুন করে ইলেকশন করার চেষ্টা করছে। বারো বছর আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলবার্তো নিকোলাস (গল্পের খাতিরে রাজনৈতিক নেতা এবং প্রেসিডেন্টের নাম বদলে দেয়া হলো। এসবই কল্পিত ঘটনা। বাস্তবে এরকম কিছু ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। তবে রাফিনো নামে একটা দেশ সত্যিই আছে। আঠারোশো বাহাত্তরের বিদ্রোহটাও ঐতিহাসিক সত্য।—লেখক।) যাঁকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছেন এখনকার প্রেসিডেন্ট এমিলানো ডা ক্বাইবার, তাঁর সঙ্গেই আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তাঁকে।'

'তার মানে একবার নির্বাচনে জেতার পর ছয় বছর ক্ষমতায় থাকার নিয়ম ওখানে,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। অনেক বাধা অনেক শর্ত আছে ওখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে টিকে থাকার। জনতা বড় বেশি হুঁশিয়ার। অবশ্য বইয়ে বিশেষ করে ইতিহাস বইয়ে অনেক সময়ই অনেক কিছু ভুল থাকে। ঐতিহাসিকের জানার ওপর নির্ভর করে সেটা। আমি যে বই থেকে রাফিনোর ইতিহাস জেনেছি, সেটাতে নিকোলাসকে খুব বেশি খারাপ লোক বলা হয়েছে। স্বৈরাচারী লোক ছিলেন নাকি তিনি, স্বজনপ্রীতি খুব বেশি করতেন। উঁচু উঁচু পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন নিজের লোকদের, অহেতুক ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ঘুষ খাওয়া শুরু করে পুলিশ, পার পেয়ে যায় অপরাধীরা। ফাইবারের অভিযোগ, অবৈধ উপায়ে টাকার পাহাড় গড়ে তুলতে থাকেন নিকোলাস। নিকোলাসও ফাইবারের বিরুদ্ধে নানা আজেবাজে কথা বলতে থাকেন। কাদা ছিটাতে থাকেন একজন আরেকজনকে। এ এক নোংরা পলিটিকস। নিকোলাস খোলাখুলিই বলে দেন, অল্প বয়েসে সাধারণ চোর ছিলেন ফাইবার। জোর দিয়ে বলেছেন সেটা প্রমাণ করতে পারবেন, কিন্তু পারেননি। ইলেকশনে জিতে গেলেন ফাইবার। এবং সেটা নাকি দেশের জন্যে ভালই হয়েছে, বেঁচে যায় জনসাধারণ আরেকটা ভয়াবহ বিদ্রোহ থেকে, প্রথমটার মত নির্বিবাদ হত না ওটা, অনেক রক্তপাত হত।'

বইটা সাথে করে নিয়েই এসেছে রবিন। ডেস্কের ওপর দিয়ে সেটা ঠেলে দিল কিশোরের দিকে। 'ফাইবারের ছবি আছে এতে।'

মুসা আর কিশোর দু'জনেই ঝুঁকে এল ছবিটা দেখার জন্যে।

বইটা হাতে তুলে নিয়ে ছবিটা ভাল করে দেখল কিশোর। বলল, 'চেহারাটা কিন্তু ভালই। চোরছ্যাঁচড় বা খারাপ লোকের মত মনে হয় না।' নিচের ক্যাপশনটা দ্রুত পড়ে ফেলল। সহজেই খুঁজে বের করে ফেলল ডিয়েগো পিলভারেজের ছবি। মিসেস মরিয়াটির বান্ধবী সিনোরা এলিজাবেথ পিলভারেজের মরহুম স্বামী। লম্বা, চামড়ার রঙ সাদা তো নয়ই, বরং গাঢ় বাদামী, চোখ টেরা। হেসে ফেলে বলল, 'চাচী দেখলে বলবে টেরা নয়, চোখ বেশি কাছাকাছি। টেরা মানুষকে টেরা বলতে খুব খারাপ লাগে তার। কত রকম যে বাতিক থাকে মানুষের।'

'কার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কার চোখ টেরা? ফাইবারের?'

'না। ডিয়েগো পিলভারেজ।'

তিনজনকেই ভীষণ চমকে দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভার তুলে নিল রবিন। 'বলুন?'

শুনল ওপাশের কথা। জিজ্ঞেস করল, 'কখন?' আবার শুনল। তারপর বলল, 'আসছি।'

রবিন রিসিভার রেখে দিলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'টুলসা কারনেস। আজ সকালে হলিউডে বাজার করার জন্যে বেরিয়েছিল ডন, এখনও নাকি ফেরেনি। একটা নোট রেখে গেছে কেউ লেটার বক্সে। তাতে জানা গেছে ডনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমাদের এখানেই আসতে চাইছিল টুলসা। ফোন করে হ্যানসনকে পায়নি। তাই আমাদেরকেই যেতে অনুরোধ করেছে।'

'আসলে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুসা, 'গাড়ি ছাড়া গোয়েন্দাগিরি অসম্ভব। এই

যে, এখন কতটা প্রয়োজন বলো? রবিনেরটা গ্যারেজে, আমারটা বেচে দিলাম। সাইকেল নিয়ে এত দূরে যেতে কষ্ট লাগে, বাসে চড়তে ভাল লাগে না, ট্যাক্সিতে যেতে অনেক পয়সা খরচ। নাহ্, আরেকটা গাড়ি নাহলে চলছে না আর।'

'দাঁড়াও,' হাসিমুখে বলল কিশোর, 'মোটর সাইকেল কিনব। গাড়ির চেয়ে অনেক সুবিধে হবে।'

বারো

তিনটের সময় মরিয়াটি হাউসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকে দেখল লিভিংরুমে পায়চারি করছেন মিসেস মরিয়াটি। চেয়ারে ঝুঁকে বসে আছে টুলসা, কপালে এসে পড়া চুলের একটা গোছা আঙুলে পেঁচিয়ে নিয়ে টানছে আর তাকিয়ে দেখছে আয়নার ভেতরে নানীর পায়চারি।

'পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মিসেস মরিয়াটি জানালেন, 'ওরা পুলিশকে খবর দিতে মানা করেছে।'

'কিডন্যাপিং জঘন্য অপরাধ,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'পুলিশ খুব সতর্ক থাকে এসব ক্ষেত্রে। কড়া নজর রাখে যাতে যাকে নিয়ে যায় তার ক্ষতি না হয়।'

'ওরা ডনের জন্যে কিছু করার সুযোগই পাবে না!' কেঁদে ফেললেন মিসেস মরিয়াটি। একটা মুখ খোলা খাম বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

ভেতরের কাগজটা বের করল কিশোর। তাতে লেখা ঃ

মিসেস মরিয়াটি,

আপনার নাতিকে নিয়ে গেলাম আমরা। পুলিশকে জানাবেন না। আজ কোন এক সময় ফোন করে জানানো হবে কখন তাকে কিভাবে মুক্ত করতে পারবেন। যা যা বলা হবে মেনে চলবেন। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে পারি আমি। তবে দরকার না হলে তা হব না।

দুইবার করে নোটটা পড়ে হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল কিশোর। 'শস্তা কাগজ। যে কোন দোকানে পাওয়া যায়। ক্যাপিট্যাল লেটারে লেখা। বলপেন ব্যবহার করেছে। লেখাটা আমেরিকান কারও নয়। আর মুক্তিপণ হিসেবে কি চাইবে এখনই আন্দাজ করতে পারছি।'

'আমরা সবাই পারছি,' টুলসা বলল। 'আয়নাটা।'

'নিয়ে যাক!' প্রায় চিৎকার করে বললেন মিসেস মরিয়াটি। 'কোন কুক্ষণে যে ওটার ওপর চোখ পড়েছিল আমার! ওই জানোয়ার পিটাকটা...'

'পিটাক এখন হাসপাতালে,' রবিন বলল। 'আজ সকালেও ছিল...'

চমকে গেল কিশোর। 'খোদা! তাই তো। ছিল, কিন্তু ছাড়া পেয়ে যেতে পারে! দেখা দরকার।'

বেভারলি ক্রেস্ট মেডিক্যাল সেন্টারে ডায়াল করল সে। অপারেটরের সঙ্গে কথা বলল। তারপর 'থ্যাংকিউ' বলে রেখে দিল।

'পিটাককে ছেড়ে দেয়া হয়েছে,' সবাইকে জানাল কিশোর। 'ক'টা সময় বাজার করতে বেরিয়েছিল ডন?'

'এগারোটা,' টুলসা বলল, 'সাড়ে এগারোও হতে পারে। ঘড়ি দেখিনি।'

'তাহলে পিটাকের কাজও হতে পারে। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে ছাড়া পেয়ে থাকলেও তার পক্ষে সম্ভব।'

আরেকবার ফোন করল কিশোর, এবার বেভারলি সানসেট হোটেলে। অপারেটর তাকে পিটাকের ঘরে লাইন দিয়ে দিল। জবাব দিল পিটাক। সাড়া না দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর।

'তাহলে ঘরেই আছে পিটাক,' রবিন বলল। 'গিয়ে চোখ রাখব নাকি? মুসার ঢোকা ঠিক হবে না। কাল তাকে অনেকেই দেখেছে। চিনে ফেলতে পারে।'

টেবিলের ওপর থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিলেন মিসেস মরিয়াটি। কয়েকটা নোট বের করে রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'ট্যাক্সি করে যাও। হোটেলে পৌঁছেই আমাকে ফোন করবে।'

টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে রবিন বলল, 'করব।'

'সাবধানে থাকবে। তোমারও কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'থাকব। ভাববেন না। এসব কাজ করে অভ্যাস আছে আমাদের। কিছু হবে না।'

বেরিয়ে গেল রবিন। লিভিংরুমে এক বিষণ্ন থমথমে পরিবেশ। চুপ করে আছে কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। মুসা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে একেকবার একেক আয়নার সামনে, এমন ভঙ্গি করছে যেন নিজের চেহারা এই প্রথম দেখছে।

পৌনে চারটায় ফোন বাজল। লাফিয়ে উঠল টুলসা। কিশোরও। মিসেস মরিয়াটি তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। 'বলো?'

কয়েক সেকেণ্ড পর 'থ্যাংকস' বলে রেখে দিলেন।

'রবিন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। বলল, কফি শপে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে পিটাক। রবিন রয়েছে লবিতে। সেখানেই থাকবে।'

'আর কিছু করারও নেই অবশ্য।'

'চোরটা এখন কোথায় আছে জানতে পারলে হত,' মুসা বলল। 'আর মারকাস।'

'মারকাস?' ওর দিকে তাকাল টুলসা। 'সে আবার কে?'

'আরেক ম্যাজিশিয়ান,' কিশোর জানাল ওকে। 'রাফিনো থেকে এসেছে। আমাদের ভূত মহাশয়।'

'ঈশ্বর!' আঁতকে উঠলেন মিসেস মরিয়াটি। 'আরেকজন এসেছে ওই বিচ্ছিরি জায়গাটা থেকে! ওই জায়গাটার নামও যদি না শুনতাম কোনদিন, ভাল হত। এখন তো মনে হচ্ছে, এলিজাবেথের সাথে যদি কোনদিন পরিচয় না হত তাহলেও ভাল হত।'

আবার বাজল ফোন।

কেঁপে উঠলেন মিসেস মরিয়াটি। 'এইবার করেছে!'

রিঙ হচ্ছে।

'ধরুন,' মিসেস মরিয়াটিকে বলল কিশোর। 'আমি রান্নাঘরের এক্সটেনশন থেকে গিয়ে শুনছি।'

ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরোল সে। হল পেরিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বাসন-পেয়ালা পরিষ্কার করছে হ্যারি কোলাস। তার দিকে একবার তাকিয়ে গিয়ে আস্তে করে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।

'আমি ভাল আছি, নানী,' ডন বলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

'কোথায় আছি বলতে পারব না। কি করতে হবে বলছি।'

'বল। জলদি বল। যা করতে বলবি তাই করব।'

'স্যান পেদ্রোতে একটা গুদামঘর আছে,' ডন বলল। 'ওশন বুলভারে। বাইরে সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে দি পেকহ্যাম স্টোরেজ কোম্পানি। লেখাই সার। ভেতরে কিছু নেই। খালি।'

'খালি গুদামঘর, ওশন বুলভার, স্যান পেদ্রো,' মুখস্থ করতে করতে বললেন মিসেস মরিয়াটি। 'দাঁড়া, লিখে নিই।'

'শিয়াভো গ্লাসটা ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। রিমুভ্যাল কোম্পানিকে ডেকে হোক, ভ্যান হায়ারারকে দিয়ে হোক, দিয়ে আসতে হবে আয়নাটা। গুদামঘরে রেখে চলে যাবে ওরা। আর শোনো। শুনছ?'

'বলো।'

'আজ সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে পৌঁছানো চাই।'

'পৌঁছবে।'

'আমি আবার ফোন করব,' ডন বলল। 'লোকটা বলল, আবার করতে পারব। তবে আয়নাটা তার হাতে পৌঁছার পর।'

কেটে গেল লাইন।

তেরো

'এই অসময়ে ভ্যান কোথায় পাই?' গুঙিয়ে উঠলেন মিসেস মরিয়াটি। 'চারটের বেশি বাজে! ইস্, একটা ভ্যান কিনে রাখলেও পারতাম!'

'অসুবিধে নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'চাচাকে ফোন করছি। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে চলে আসবে। আপনার জন্যে খুশি হয়েই কাজটা করবে চাচা। আমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে আয়নাটা পিকআপে তুলে দিতে পারব। সাতটায় স্যান পেদ্রোতে পৌঁছে যাবে আয়না।'

'ওহ্, থ্যাংক ইউ, কিশোর, থ্যাংক ইউ,' অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সোফায় গড়িয়ে পড়লেন মিসেস মরিয়াটি। 'তোমার চাচাকে এখনই ফোন করো। এসে আয়নাটা তুলে নিয়ে যেতে সময় লাগবে। কিছুতেই যাতে দেরি না হয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।'

টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। ডায়াল করতে গিয়েও থেমে গেল। একটা সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে।

ক্রেডলে রেখে দিল আবার রিসিভার।

'কিশোর, সময় নেই আমাদের! দেরি করছ কেন? তোমার চাচাকে ফোন করো?'

'এক সেকেণ্ড,' কিশোর বলল, 'ডন কথা বলার সময় ফোনে একটা ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে। মিউজিক। আপনি শোনেননি?'

'মিউজিক?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিসেস মরিয়াটির। 'আমি···আমি শুধু ডনের কথা শুনেছি। আর মিউজিক যদি শোনাই গিয়ে থাকে, তাতে কি? কিশোর, ফোন করো। ওটাই এখন জরুরী।'

'ছড়া,' কিশোর বলল। 'ছড়াগানের সুর। প্রথমে শুনতে পাইনি। তারপর জোরাল হলো। তারপর আবার মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব বাজাচ্ছিল।'

'আইসক্রীম ম্যান,' বলে উঠল মুসা। আয়নার সামনে ঘোরাঘুরি থেমে গেছে তার। 'দ্য মিডো ফ্রেশ আইসক্রীমওয়ালারা ভ্যান নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় ওসব ছড়া বাজায়।'

টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। 'এটা একটা সূত্র হতে পারে। বলতে পারে কোথায় রাখা হয়েছে ডনকে। ধরে নিতে পারি স্যান পেদ্রোতে নেই সে। ওই শূন্য গুদামঘরটায় নেই। ওখানে ওকে রাখার ঝুঁকি নেবে না কিডন্যাপার। ঠিক চারটের সময় ফোন করেছে ডন। ওই সময়ে মিডো ফ্রেশ আইসক্রীম কোম্পানির কোন ভ্যান ওই জায়গাটার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল যেখান থেকে ফোন করেছে সে। আরও একটা ব্যাপার।' চোখ মুদে ভাবতে লাগল কিশোর। ফোনে যা যা শুনেছে সব মনে করার চেষ্টা করল। 'ঘণ্টার শব্দও শোনা গেছে।' চোখ মেলল সে। 'আইসক্রীম ভ্যানটা যাওয়ার পরে শোনা গেছে ঘণ্টার শব্দ। অনেক জোরাল। অনেকটা বার্গলার অ্যালার্মের মত। সেই সাথে গুমগুম শব্দ।'

'কি সাংঘাতিক স্মরণশক্তি তোমার!' তাজ্জব হয়ে গেলেন মিসেস মরিয়াটি। 'আমি তো কিছুই শুনিনি, ডনের কথা ছাড়া।'

'ও একটা টেপরেকর্ডার,' বন্ধুর প্রশংসা করতে গিয়ে গর্বে ফুলে উঠল মুসার বুক। 'একবার কিছু শুনলেই ছাপ পড়ে যায় মনে, জীবনে আর মোছে না।'

'আইসক্রীম ভ্যান,' বলতে থাকল কিশোর, 'ঘণ্টার শব্দ, গুমগুম। তারমানে একটা রেলওয়ে ক্রসিং! ঠিক, রেলওয়ে ক্রসিংই! ট্রেন আসার আগে ওরকম করে ঘণ্টা বাজে, আলো জ্বলে, ট্রেনের শব্দ হয়। যেখানে ডন রয়েছে তার কাছ দিয়ে চারটের সময় ভ্যানটা যাচ্ছিল, আর জায়গাটা একটা রেল ক্রসিঙের কাছে, যেখান দিয়ে তখন একটা ট্রেন পার হয়েছে।'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে কয়েক ডজন আইসক্রীম ভ্যান আছে,' টুলসা বলল।

'কিন্তু কয়েক ডজন রেল ক্রসিং নেই। ভ্যানগুলোর রেগুলার রুট আছে, নিয়মিত একই পথে যাতায়াত করে। কোম্পানি থেকে নিয়মটা বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমাদের রকি বীচে একটা ভ্যান আসে তিনটের দিকে। বিশ মিনিটের বেশি এদিক ওদিক কোনদিন হয় না। মিডো ফ্রেশের সাথে যোগাযোগ করলে···'

'কিন্তু গুমগুমটা যদি ট্রেনের না হয়?' মিসেস মরিয়াটি বললেন। 'এমন কোন জায়গায়ও তো হতে পারে যেখানে বার্গলার অ্যালার্মই বেজেছিল। বাজতে তো পারে, তাই না? ওই সময় ভ্যানটা যাচ্ছিল পাশ দিয়ে।'

'না,' মানতে পারল না কিশোর। 'কোন একটা জায়গা পার হতে বেশিক্ষণ লাগে না ভ্যানের। কিন্তু গুমগুমটা অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেছে। ট্রেন হলেই সেটা সম্ভব। আশা করছি আয়নাটা কিডন্যাপারদের হাতে পড়ার আগেই ডনের কাছে পৌঁছে যেতে পারব আমরা।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু আমার নাতির জীবন নিয়ে খেলতে দিতে রাজি নই আমি। তোমার চাচাকে টেলিফোন করো, প্লীজ, ট্রাকটা নিয়ে আসুক।'

'নিশ্চয়,' আবার রিসিভার তুলে নিল কিশোর। ডায়াল করল পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। ফোন ধরলেন মেরিচাচী।

'কিশোর? কোথায় তুই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'করছিসটা কি? সেই যে গেলি, সারাটা দিন ধরে, বোরিস বলল…'

'চাচী,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'সব কথা এখন বলার সময় নেই। পরে বলব। চাচা কোথায়?'

চুপ করে রইলেন মেরিচাচী। এই মুহূর্তে তাঁর চেহারাটা কল্পনা করতে পারছে কিশোর। ভুরু কুঁচকে রেখেছেন। উত্তেজিত। তবে বেশি দেরি করলেন না তিনি, স্বামীকে ডাকলেন ফোন ধরার জন্যে।

'চাচা?' কিশোর বলল, 'মিসেস মরিয়াটির বাড়ি থেকে বলছি। সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন তিনি, সাহায্য চান। ট্রাকটা নিয়ে আসতে পারবে এখুনি? বোরিস আর রোভারকেও আনবে। অনেক বড় একটা আয়না দিয়ে আসতে হবে স্যান পেদ্রোতে, সন্ধে সাতটার মধ্যে। ভারি জিনিস। লোকজন না হলে পারা যাবে না।'

'কিশোর, কেসে জড়িয়েছিস নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, চাচা, সময় নেই…'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

চাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মিসেস মরিয়াটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়নাটা জায়গা মত পৌঁছে যাবে, এব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

বুককেসের নিচের তাক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি বের করে এনে টেবিলে রেখে ওল্টাচ্ছে মুসা। বলল, 'মিডো স্ট্রীটের মেইন অফিসটা ম্যাকি স্ট্রীটে, ইউনিয়ন ডিপোর কাছে। ওখানেই কোথাও আটকে রাখা হয়েছে ডনকে, তাই না?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্। গরমকালে অনেক বেশি সময় রাস্তায় ভ্যান রাখে মিডোর লোকেরা। বিকেল চারটের মধ্যেই মেইন অফিসের কাছে যাওয়ার কথা নয় কোন ভ্যানের। ওরা থাকে এমন সব জায়গায় যেখানে বাচ্চাদের ভিড় বেশি। তবে মেইন অফিস পেয়ে ভালই হয়েছে। ডেসপ্যাচ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলে ভ্যানগুলোর রুট জানা যাবে।'

'ফোন না করে বরং নিজেই যাও একবার,' মিসেস মরিয়াটি বললেন।

'টেলিফোনে এসব তথ্য ভাল মত জানা যায় না।' ব্যাগ থেকে আরও কিছু নোট বের করে কিশোরকে দিলেন। 'যাও। আমি আছি। তোমার চাচা এলে আয়নাটা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করব। খুব সাবধানে থাকবে। আয়নাটার মায়া বিন্দুমাত্র করো না। আমি ডনকে নিরাপদে ফেরত চাই, ব্যস।'

সাবধানে থাকবে, কথা দিল কিশোর।

'চলো, আমিও যাই তোমার সাথে,' মুসা বলল। 'সাহায্য লাগতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস মরিয়াটি। 'হ্যাঁ, যাও।'

টুলসা বলল, 'আমিও যাব।'

'না, তোকে যেতে হবে না,' বাধা দিলেন মিসেস মরিয়াটি। 'একজন গিয়ে তো পড়েছে বিপদে, আরও একজনকে পাঠাতে পারি না। ডন ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকেই বেরোতে দেব না তোকে।'

চোদ্দ

লম্বা, নিচু একটা বাড়িতে মিডো কোম্পানির আইসক্রীম কারখানা। পার্কিং লট পেরিয়ে লোডিং প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল কিশোরদের ট্যাক্সি। একটা ভ্যানও চোখে পড়ল না।

'তোমরা যে কেন এসেছ এখানে বুঝতে পারছি না,' ড্রাইভার বলল। 'এখানে তো পাবলিকের কাছে আইসক্রীম বিক্রি করে না ওরা। কিনতে হলে ওদের ভ্যান থেকে কিনতে হবে।'

'আমরা একটা পার্টির জন্যে অর্ডার দিয়েছি,' কিশোর বলল। 'দিতে রাজি হয়েছে ওরা।'

লোডিং প্ল্যাটফর্মের কাছে এনে গাড়ি রাখল ট্যাক্সি ড্রাইভার। পকেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে তাকে দিল কিশোর। 'যান। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

লোডিং বে-তে নামল কিশোর আর মুসা। একজোড়া ডাবল ডোরের একটা খুলে অফিসে ঢুকল। পুরু লেন্সের চশমা পরা একজন মাত্র বয়স্ক মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে সামনে ছড়ানো বড় একটা কাগজের পাতায় নোট লিখছে।

'ওকে, প্যাড,' টেলিফোনে বলল লোকটা, 'দেরি কিছুটা করে ফেলেছ। ঠিক আছে, অসুবিধে হবে না। আটটার আগে স্টেডিয়াম পেরোনোর চেষ্টা করো না। আজ রাতে খেলা আছে। যানবাহনের ভিড়ে আটকা পড়ার মানে হয় না।'

রিসিভার রেখে, নাকের ওপর থেকে চশমা সরিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল সে। 'কি চাই?'

লোকটার পেছনের দেয়ালে ঝোলানো লস অ্যাঞ্জেলেসের বিশাল ম্যাপটা দেখাল কিশোর। সাদা-কালোয় আঁকা ম্যাপ, তাতে লাল, নীল, সবুজ, কমলা, হলুদ, বেগুনি, বাদামী রঙে অনেক রেখা আঁকা রয়েছে। বলল, 'ওগুলো নিশ্চয় ভ্যানের রুট?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'রুটের নানা পয়েন্ট থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করে ভ্যান ড্রাইভাররা?'

'করে। কখন কোথায় রয়েছে, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে এটা জানায় ওরা একটু পর পরই। জানানোর সময় পেরিয়ে গেলেই পুলিশকে খবর দিই আমরা। অনেক অঘটন ঘটে। প্রায়ই ছিনতাইকারীর কবলে পড়তে হয় ভ্যান ড্রাইভারকে, টাকা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তোমরা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'একটা ভ্যানের খোঁজ চাই। আজ বিকেল চারটেয় একটা রেল ক্রসিঙের পাশ দিয়ে গেছে। কোন জায়গার রেল ক্রসিং সেটা?'

ফোন বাজল আবার।

'প্লীজ,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'ধরবেন না। বাজুক। আমাদের জবাব জানাটা ভীষণ জরুরী। আগে বলে নিন।'

রিসিভার তুলে নিল লোকটা। 'মিডো ফ্রেশ।...রোয়ান, একটু ধরো। দুটো ছেলে এসেছে জরুরী কাজে, কথাটা সেরে নিই।'

রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রাখল লোকটা। 'তাড়াতাড়ি করো। তোমাদের সমস্যাটা কি? বড় নোট দিয়ে ভাঙতি নিতে ভুলে গিয়েছিলে? নাকি তোমাদের কাছে টাকা পাওনা আছে?'

'ওসব কিছু না,' কিশোর বলল। 'সব কথা বুঝিয়ে বলার সময়ও নেই এখন। দয়া করে শুধু বলুন, চারটের সময় কোন ভ্যানটা কোন ক্রসিঙের...'

'একজনের জীবন বাঁচাতে হবে,' যোগ করল মুসা।

তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। ছেলেদের মুখ দেখে অনুমান করে নিল, রসিকতা করতে আসেনি ওরা, ব্যাপারটা সিরিয়াস। সামনে বিছানো কাগজটার ওপর থেকে একটা আঙুল ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনতে লাগল। বলল, 'পিউরি ক্রস করেছে লা ব্রিয়ার সান্তা ফে ক্রসিং। কিন্তু সে গেছে তিনটের আগে। তারমানে সে নয়। দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ, এই যে। এটাই হবে। ফ্র্যাঙ্কলিন কাসলার। হ্যামিলটনে একটা ক্রসিং পেরোতে হয় ওকে।' উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ম্যাপে আঙুল রাখল লোকটা, স্যান ফার্নান্দো ভ্যালির একটা জায়গা। 'চারটের দশে ক্রসিঙের কাছের একটা ফিলিং স্টেশন থেকে ফোন করেছিল আমাকে। তারমানে চারটের সময় দক্ষিণে চলেছিল, হ্যামিলটনের এই ক্রসিঙের কাছে ছিল। ওর সাথে কথা বলতে চাও?'

'না,' কিশোর বলল। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

অফিস থেকে দৌড়ে বেরোল দু'জনে। লোডিং প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এসে টান দিয়ে খুলল দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির দরজা।

'কুইক!' গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল কিশোর, কোনদিকে যেতে হবে। 'জলদি করুন!'

জরুরী পরিস্থিতি বুঝতে পারল ড্রাইভার। প্রশ্ন করল না। গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। তার ভেতর দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত চালিয়ে এসে ফ্রিওয়েতে উঠে ছুটল স্যান ফার্নান্দো ভ্যালির দিকে। এখানে যানবাহনের ঝামেলা ততটা নেই বলে গতি কমাতে হলো না। তিরিশ মিনিটের মাথায় উত্তর হ্যামিলটনে পৌঁছে গেল গাড়ি।

'এইবার আস্তে চালান,' ড্রাইভারকে বলল কিশোর। রাস্তার দু'ধারে ভাল করে তাকাতে লাগল সে আর মুসা মিলে। শুরুতে সারি দেয়া ছোট ছোট বাড়ি, তারপরে খোলা জায়গা। এস্টেট এজেন্টরা সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে জায়গাগুলোতে, প্লট, বিক্রির জন্যে। সামনে দেখা গেল রেলওয়ে ক্রসিংটা। অটোম্যাটিক সিগন্যাল রয়েছে, এখন নীরব। ক্রসিঙের কাছে এসে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। লাইনের অন্য পাশে একটা বাড়ি দেখতে পেল কিশোর। একটিমাত্র পুরানো বাড়ি, দেখে মনে হচ্ছে একসময় লেবুর খামার ছিল ওটার আশেপাশে। বাড়িটার পেছনে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা লেবুগাছ, অযত্নে অবহেলায় যেন ধুঁকছে। ঘরেরও রঙটঙ বলতে এখন আর কিছু নেই। জানালার পর্দা কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, সামনের বারান্দার বেশ কিছু তক্তা গায়েব।

'কি করব?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

'এগোন,' বলল কিশোর।

আরও কিছু জমির প্লট পেরিয়ে এল ওরা। পরের ব্লকে আবার শুরু হয়েছে ছোট ছোট বাড়ি। চমৎকার লন রয়েছে ওগুলোর। বাচ্চারা খেলছে। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে চত্বর আর বাগান।

'ডানে মোড় নিয়ে এগোন,' কিশোর বলল।

তা-ই করল ড্রাইভার। কিছুদূর এগিয়ে মোড়ের কাছের একটা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল কিশোরের নির্দেশে। বাগানে পানি দিচ্ছে একজন লোক।

আর এগোনোর পথ নেই। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে যাব?'

'দাঁড়ান, ভেবে নিই।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। তারপর বলল, 'নিশ্চয় ক্রসিঙের কাছের ওই পুরানো বাড়িটাই হবে। ওখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাবে ওয়ার্নিং সিগন্যাল।'

'হ্যাঁ,' মুসাও একমত হলো। 'ওটাই একমাত্র জায়গা।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করতে গেল, 'পুরানো একটা খামার বাড়ি...'

' শুনলই না যেন কিশোর, 'ঢুকব কি করে ওর ভেতরে?'

'কি চাও তোমরা বলো তো? ওখানে কেউ বাস করে না, দেখলেই বোঝা যায়...'

'বাস করে না, কিন্তু এখন লোক আছে ভেতরে। তার চোখ এড়িয়ে ঢুকতে হবে আমাদের। কি করে ঢুকব তা-ও ঠিক করে ফেলেছি।'

ছোট একটা বেকারি ভ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে ওটা। ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থেমে কয়েকবার হর্ন বাজাল। তারপর একটা ঝুড়িতে করে রুটি আর অন্যান্য বেকারি সামগ্রী নিয়ে নামল ড্রাইভার। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। ঝুড়ি থেকে কয়েকটা প্যাকেট বেছে নিয়ে টাকা দিল লোকটাকে।

'রুটি সাপ্লাই করব আমরা!' বলে উঠল কিশোর।

'দারুণ!' মুসা বলল। দেরি করল না আর। গাড়ি থেকে নেমে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটল বেকারি ভ্যানের দিকে।

কিশোরও নামতে যাচ্ছে এই সময় ড্রাইভার বলল, 'আমি কি থাকব? মিটারে পনেরো ডলার হয়ে গেছে কিন্তু...

আরেকটা দশ ডলারের নোট লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'মোট বিশ দিলাম। বাকি পাঁচ ডলার আপনার বকশিশ। যদি দেখেন বেকারির ভ্যানটাতে উঠে পড়েছি আমরা, তাহলে চলে যাবেন, তখন আর দরকার হবে না আপনাকে।'

'আচ্ছা।'

রুটিওয়ালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। তরুণ একজন লোক। বলছে, 'কিন্তু রাস্তা থেকে তো কাউকে তুলি না আমি।'

মুসা বলল, 'আসলে লিফট চাইছি না আমরা। কাছেই একটা বাড়িতে কিছু রুটি-বিস্কুট দিয়ে আসতে হবে।'

রুটির গাড়ির কাছে এসে থামল ট্যাক্সিটা। মুখ বের করে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'না না, ঠিক আছে,' হাত তুলে বলল রুটিওয়ালা। 'নতুন চাকরি তো। গোলমালের ভয় পাচ্ছি।'

'আমরা কোন গোলমাল করব না,' কিশোর বলল। 'আপনার নাম কি?'

'ভিকটর। ভিকটর সোয়ানসন।'

'দেখুন মিস্টার সোয়ানসন...'

'শুধু ভিকি বললেই চলবে। আবার বলছি, এটা আমার নতুন চাকরি। কিছু হলে চাকরিটা খোয়াব। আবার গিয়ে ধর্না দিতে হবে আনএমপ্লয়মেন্ট অফিসে।'

'দিতে হবে না,' কিশোর বলল। 'মিসেস অ্যানিলিন মরিয়াটির হয়ে কাজ করছি আমরা।' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দেখাল লোকটাকে। 'আমাদের ধারণা, মিসেস মরিয়াটির নাতিকে আটকে রাখা হয়েছে ওই বাড়িতে।'

'মিসেস অ্যানিলিন মরিয়াটি?' ভুরু কোঁচকাল ড্রাইভার। 'মনে পড়ছে পত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছি। কিন্তু...তিন গোয়েন্দার নাম শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'প্রচার যাতে কম হয় খেয়াল রাখি আমরা,' কিশোর বলল। 'গোয়েন্দারা যত অপরিচিত থাকে ততই সুবিধে। যাই হোক, আমি কিশোর পাশা। ও আমার সহকারী মুসা আমান। আরেকজন সহকারী আছে, রবিন মিলফোর্ড, বেভারলি হিলে একজন লোকের ওপর নজর রাখতে গেছে।'

'বাপরে!' ট্যাক্সি ড্রাইভারও শুনছে ওদের কথা, 'মনে হচ্ছে একেবারে টেলিভিশনের ফিল্ম দেখছি!'

'আমরা সত্যিই গোয়েন্দা,' দুই ড্রাইভারকেই শুনিয়ে শুনিয়ে কিশোর বলল। 'অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছি আমরা। বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করে দেখতে পারেন। এই কেসে এখনও পুলিশকে খবর দেয়া হয়নি। মিসেস মরিয়াটির ভয়, তাহলে কিডন্যাপাররা তাঁর নাতিকে মেরে ফেলবে।'

এমন ভঙ্গিতে কার্ডটা ওল্টাল রুটিওয়ালা, যেন ওল্টালেই পেছনে দেখতে পাবে অস্বাভাবিক কিছু। নিরাশ হতে হলো তাকে। কিশোরের দিকে তাকাল একবার, তারপর মুসার দিকে।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের,' মুসা বলল। ভয়ানক একটা ভাবনা মাথায় এসেছে তার। 'ডন এখন কেমন আছে সেটাই জানি না! বিকেল চারটেয় যখন ফোন করেছিল, তখন তো ভালই ছিল, কিন্তু তারপর?'

'পুলিশকে...' বলতে গিয়ে বাধা পেল ভিকি।

'বলার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'মিসেস মরিয়াটি যখন চান না, আমিও চাই না। ডনকে আমরাই মুক্ত করে আনব।'

'বেশ,' ভিকি বলল। 'কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছ আমার। মনে হচ্ছে তোমরা সত্যি কথাই বলছ। সাহায্য করতে যদি না যাই এখন...'

আর থাকার দরকার মনে করল না ট্যাক্সি ড্রাইভার। ওদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেল।

'তো আমাকে কি করতে বলো?' জিজ্ঞেস করল ভিকি।

'আপনার ক্যাপ আর জ্যাকেটটা আমাকে দিন,' কিশোর অনুরোধ করল। 'তারপর হ্যামিলটনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যান রেল ক্রসিংটার দিকে। একটা পুরানো বাড়ি আছে, ওটার কাছে থামবেন। আমি গিয়ে কলিংবেল বাজাব।'

'আমি তো বেল বাজাই না,' রুটিওয়ালা বলল। 'গাড়িতে বসেই হর্ন বাজাই, লোকে বুঝে যায়, টাকা নিয়ে কিনতে চলে আসে।'

'যাকে আমরা কিডন্যাপার ভাবছি সে-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে তফাৎটা বুঝতে পারবে না।'

মিনিট দুই পরে হ্যামিলটনের রাস্তা ধরে রওনা হলো বেকারি ভ্যান। পেছনে উঠে বসেছে কিশোর আর মুসা। ড্রাইভারের ক্যাপ আর জ্যাকেট পরছে কিশোর। মুসা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, রুটি, বিস্কুট, কেক, রোলের তাক দেয়া ট্রের মাঝে। বাতাসে সুগন্ধ।

হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি, খেতে ইচ্ছে করছে?'

মুসাও হাসল। 'ইচ্ছে করলে কিনে খেতে পারব। করছে না। সাবধানে যাবে, কিশোর।'

'যাব। ভেব না। যদি ভেতরে ঢুকে না বেরোই...'

'তাহলে আর কি? আমিও ঢুকে পড়ব।'

ওদের কথা কানে যাচ্ছে ভিকির। ঘাড় না ফিরিয়েই বলল সে, 'আমিও যাব।'

পুরানো বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি রাখল সে। 'এটাই তো?'

'হ্যাঁ,' বলে নেমে পড়ল কিশোর। জ্যাকেটটা কিছু ঢলঢলে হয়েছে ওর গায়ে। রুটিওয়ালার স্বাস্থ্য তার চেয়ে ভাল। রুটি বিস্কুটের ঝুড়ি হাতে নিয়ে শিস দিয়ে যেন মনের আনন্দে এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে। সাবধানে উঠল বারান্দায়। পা ফেলার আগে প্রতিটি তক্তায় চাপ দিয়ে দেখে নিচ্ছে ভেঙে পড়বে কিনা। কলিংবেল দেখতে পেল না। তখন জোরে জোরে থাবা দিল দরজায়।

অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়া নেই। বাড়ির ভেতরে কেউ নড়লও না।

আবার থাবা দিল সে। 'ভ্যান অ্যালিস্টিন'স বেকারি। কেউ আছেন?'

সাড়া মিলল না এবারেও। ডানে সরে জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। শূন্য একটা ঘর। ধুলোয় মাখামাখি। একপাশের জানালার নিচেটা ভিজে রয়েছে, বৃষ্টির পানি ঢুকেছিল ওখান দিয়ে। আরও একটা জিনিস চোখে পড়তেই ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। মেঝের ধুলোর ওপর দিয়ে ভারি কিছু ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ, পেছনের ঘরের দিকে চলে গেছে। নোংরা, পরিত্যক্ত সেই ঘরের এক কোণে রয়েছে একটা আধুনিক টেলিফোন সেট, সাদা, ঝকঝকে, নতুন।

ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে নবে মোচড় দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল সে। তালা দেয়া। জানালার কাছে গিয়ে দেখল, পাল্লার হুড়কো খোলা। ধরে টান দিতেই মরচে পড়া কব্জা কিঁচকিঁচ করে উঠল। তবে খুলে গেল।

এখনও কেউ নড়ছে না বাড়ির ভেতর। কোন শব্দ নেই।

জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। এগিয়ে গেল দাগ ধরে ধরে, পেছনের ঘরটার দিকে।

পরের ঘরটা রান্নাঘর, দরজায় দাঁড়িয়েই বুঝতে পারল সেটা। কি ঘর তা নিয়ে এখন মাথাব্যথা নেই ওর, তাকিয়ে রয়েছে মেঝেতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে।

ডন কারনেস! হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। তবে চোখ খোলা। কিশোরকে দেখে সামান্য কুঁচকে গেল চোখের কোণ, সোজা হলো তারপর। আবার কুঁচকাল, এবার আর বিস্ময়ে নয়, হাসার চেষ্টা করছে।

পনেরো

ঘরের মাঝখানে বসে দু'হাতে হাঁটু ডলতে ডলতে ডন বলল, 'পা গেছে। সাড়া আর পাচ্ছি না।' কিশোরের ডাকে ছুটে আসা মুসা আর ভিকিকে দেখে হাসল। 'আপনাদের দেখে খুব ভাল লাগছে। আমি তো ভাবছিলাম শয়তানটা আর আসবেই না। আয়নাটা নিয়ে চলে যাবে। নানীকে ফোন করার পর পরই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। যদি পোড়ো বাড়ির সামনে ওর গাড়ি দেখে কেউ কৌতূহলী হয়ে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়, এই ভয়ে।'

'শয়তানটা কে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'চোরটা না তো?'

'হ্যাঁ, সে-ই। ওর নামই লিও গোয়েরা। আয়নাটা কি জন্যে দরকার বলেনি আমাকে।'

'মিসেস মরিয়াটিকে খবরটা জানানো দরকার,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ডন। টলমল করছে পা। ওভাবেই হাঁটতে হাঁটতে বাইরের ঘরে এসে টেলিফোনের কাছে বসল। ডায়াল করল। এতটাই নীরব হয়ে আছে জায়গাটা, ওপাশে যে রিঙ হচ্ছে তা-ও শুনতে পেল অন্য তিনজন। একবার রিঙ হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে নেয়া হলো। ডন বলল, 'হ্যালো, নানী? আমি, ডন। ভাল আছি।'

ওপাশ থেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা ভেসে এল রিসিভারে।

'বললাম তো আমি ঠিক আছি,' ডন বলল, 'একদম ঠিক। কিশোর আর মুসা

আছে এখানে। ওরাই খুঁজে বের করেছে।'

আরও প্রায় মিনিটখানেক কথা বলে রিসিভারটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রবিন কথা বলবে।'

'রবিন? আমি তো ভেবেছি এখনও বেভারলি হিলে রয়েছে, নজর রাখছে পিটাকের ওপর!' রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। 'রবিন? কি ব্যাপার? পিটাক কোথায়?'

'পালিয়েছে!' তীব্র হতাশা রবিনের কণ্ঠে। 'চারটের দিকে ঘর থেকে বেরোল। পিছু নিলাম। গাড়িতে উঠে চলে গেল। কাছাকাছি একটা ট্যাক্সিও পেলাম না। ফলে আর পিছু নিতে পারলাম না। মিসেস মরিয়াটিকে ফোন করে জানলাম তোমরা ডনকে খুঁজতে গেছ। ওখানে থেকে আর কি করব? চলে এলাম।'

'আয়নাটার কি খবর?'

'মিনিট দুই আগে ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন রাশেদ আংকেল। বোরিস আর রোভারও আছে সাথে। তুমি কোত্থেকে বলছ? ডন সত্যিই ভাল আছে তো? মিসেস মরিয়াটি জিজ্ঞেস করছেন...'

মাঝপথে বাধা পড়ল, থেমে গেল রবিনের কথা। মিসেস মরিয়াটির কণ্ঠ শোনা গেল, 'আমার নাতিকে কে কিডন্যাপ করেছিল?'

'রোগা-পটকা সেই চোরটা,' কিশোর জানাল, 'যে আপনার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল।'

'লিও গোয়েরা?'

'হ্যাঁ, ওর নামই লিও গোয়েরা। ডন বলল স্যান পেদ্রোতে রওনা হয়ে গেছে সে।'

'লাইসেন্স নম্বরটা রাখতে পারিনি,' গুঙিয়ে উঠল ডন। 'আর রাখবই বা কিভাবে? এত্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম...'

'না রাখতে পারলে নেই। যাবে কোথায় ব্যাটা?' ডনকে বলে আবার রিসিভারের মাউথপীসের কাছে মুখ নিয়ে গেল কিশোর, 'মিসেস মরিয়াটি, ডন এখন নিরাপদ। পুলিশকে জানালে স্যান পেদ্রোর গুদামঘরটা গিয়ে ঘিরে ফেলতে পারবে, গোয়েরাকে হয়তো ধরতেও পারবে, তবে তাতে কেবল কিডন্যাপারকেই আটকানো যাবে। রহস্যের কিনারা আর হবে না। জানতে পারব না পিটাক কিংবা মারকাসের সাথে তার যোগাযোগটা কোথায়, কেন এত করে আয়নাটা চাইছে সকলে।'

'আমি সব প্রশ্নের জবাব জানতে চাই,' মিসেস মরিয়াটি বললেন।

'তাহলে আর সময় নষ্ট করা যায় না। আমি আর মুসা সোজা চলে যাচ্ছি গুদামঘরে। রবিনকে বলুন আমাদের সাথে যেন স্যান পেদ্রোতে দেখা করে। এমন কোথাও দাঁড়াতে বলবেন ফ্রিওয়ে থেকে আমরা বেরোলেই যেন দেখতে পায়। ট্যাক্সি নিয়ে যাব আমরা...'

'না, ট্যাক্সি নিয়ে যাবে না!' রেগে গেল ভিকি।

'মানে?' অবাক হলো কিশোর।

'বললাম ট্যাক্সিতে করে যাবে না। যাবে রুটির গাড়িতে করে। তোমাদের

জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছি আমি। বুঝতে পেরেছি তোমরা মিথ্যে বলনি। এখন এর শেষ পর্যন্ত থাকব আমি। কিছুতেই সরাতে পারবে না আমাকে।'

'রুটির গাড়ি! দারুণ হবে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কে ভাবতে পারবে রুটির ভ্যানে করে একদল গোয়েন্দা এসে চড়াও হবে? গোয়েরাও ভাববে না।'

মিসেস মরিয়াটিকে বলল কিশোর, 'রবিনকে বলুন, ভ্যান অ্যালিস্টিন বেকারি কোম্পানির ভ্যানে করে যাচ্ছি আমরা। রবিনকে তুলে নিয়ে গুদামঘরের কাছে চলে যাবে। চোখ রাখব চোরটা কখন আসে। তার কোন সহকারী থেকে থাকলে তাকেও দেখতে পাব। একা একজনের পক্ষে ওই আয়না তুলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লোক লাগবেই গোয়েরার।'

ডন আবার রিসিভারটা নিল। 'নানী, আমিও যাচ্ছি ওদের সাথে।' বলে মিসেস মরিয়াটি নিষেধ করার আগেই লাইন কেটে দিল।

'চল,' মুসা বলল, 'ছ'টা বাজে!'

'স্যান পেদ্রোর কোথায় যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ভিকি।

'ওশন অ্যাভেন্যু,' মুসা বলল। 'সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। পারবেন?'

হাসল ভিকি। 'ক্রীম রোল আর পেস্ট্রিগুলোর বারোটা বাজবে আরকি। বাজুক। কেয়ার করি না। মালিককে বোঝাতে আর অসুবিধে হবে না এখন।'

তাড়াতাড়ি ভ্যানে এসে উঠে বসল ওরা। মুসা আর ডন বসল পেছনে, ট্রের সারির মাঝে, ট্রের গায়ে হেলান দিয়ে। কিশোর বসল সামনে, ড্রাইভারের সীটের পাশে, মেঝেতে। প্যাসেঞ্জার সীটটা যেখানে থাকার কথা সেখানে। এসব গাড়িতে শুধু ড্রাইভারের জন্যেই সীট থাকে, আর লোক নেয়া হয় না, কাজেই সীটেরও প্রয়োজন পড়ে না।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ভিকি। এমন ভঙ্গি করতে লাগল যেন গ্র্যাণ্ড প্রিক্স মোটর রেস প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরি হচ্ছে। রাস্তায় উঠেই একলাফে গতি অনেক বাড়িয়ে দিল সে। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল হলিউডের ফ্রীওয়েতে।

'আর তাড়াতাড়ি করা যায় না?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল মুসা।

'না। স্পীড লিমিটে পৌঁছে গেছি। এর বেশি তুললে...'

'পুলিশে ধরবে। ঠিক আছে, চালান।'

ছ'টা পঁচিশ মিনিটে হারবার ফ্রীওয়েতে পড়ল গাড়ি। স্যান পেদ্রোর দিকে ছুটল এখন সরাসরি। একটু পরেই গতি কমিয়ে ফেলল।

'কি হলো?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গাড়ির ভিড়। তা-ও তো আজ শনিবার বলে কম, অন্য দিন হলে নড়াই যেত না। বসে থাক চুপচাপ। যা করার আমি করছি।'

পেছনে বসে বসে ঘামতে লাগল মুসা। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কিশোর দেখছে, মুসাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে নিজেই সেটা পারছে না ভিকি। কিছুতেই গতি বাড়াতে পারছে না গাড়ির। একবার এপাশে একবার ওপাশে স্টিয়ারিং কেটে বেরিয়ে যেতে চাইছে যানজট থেকে।

অনেক চেষ্টায় অবশেষে বেরিয়ে এল জট থেকে, সামনে ভিড় পাতলা দেখেই

গতি বাড়িয়ে দিয়ে ছুটল।

উপকূলের কাছে যখন পৌঁছল গাড়ি, রোদ মলিন হয়ে এসেছে তখন।

'কুয়াশা পড়বে,' ভিকি বলল। 'কুয়াশায় ঢেকে যাবে বন্দর এলাকা।'

'যাক,' কিশোর বলল। 'কুয়াশার মধ্যে বহুবার কাজ করেছি আমরা।'

'এসে গেছি,' বলে গতি কমাল ভিকি। ওশন অ্যাভেন্যুতে ঢুকল গাড়ি। প্রথম চৌরাস্তাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখানেই কোথাও থাকবে রবিন। 'হর্ন বাজাব?'

'না। অন্য কারও চোখে পড়ে যেতে পারি। ওকে বলাই আছে কি গাড়ি। খুঁজে নিতে পারবে।'

'সাতটা বাজতে দশ!' পেছন থেকে ঘোষণা করার মত করে বলল মুসা।

'তার মানে অনেক আগেই এসেছি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'দশ মিনিট অনেক সময়।'

একটা বাড়ির দরজার পাশ থেকে দৌড়ে এল রবিন। অনুমানেই চিনতে পারল ভিকি। 'ওই যে আসছে তোমাদের বন্ধু।'

মাথা তুলে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর। 'হ্যাঁ, রবিনই।'

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে কিশোর বলল, 'যাও, পেছনে উঠে পড়ো।'

উঠল রবিন। কৈফিয়ত দেয়ার সুরে কিশোরকে বলল, 'পিটারকে হারিয়ে ফেললাম, কাজটা ঠিক হলো না।' ডনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কেমন আছ তুমি? জান উড়িয়ে দিয়েছিলে সবার।'

'জানটা আমারই বেশি উড়েছিল। এত ভয় জীবনে পাইনি।'

'চুপ থাক, এনিয়ে পরে কথা বলব,' কিশোর বলল। ভিকিকে বলল, 'ওশন অ্যাভেন্যু ধরে এগোন। ধীরে চালান। এমন ভান করুন, যেন রুটি বিক্রি করতে এসেছেন। কারও দরকার থাকলে এসে কিনতে পারে।'

যা করতে বলা হল তা-ই করল ভিকি। বলল, 'স্যান পেদ্রোতেও একটা ভ্যান আসে আমাদের। ডকের কাছে ঘোরাঘুরি করে, ওখানেই বিক্রি হয় বেশি। বিশেষ কোন কিছুর প্রতি নজর রাখতে হবে নাকি?'

'পরিত্যক্ত একটা গুদাম, পেকহ্যাম স্টোরেজ কোম্পানির। সাইনবোর্ডই দেখতে পাবেন। ওটার কাছে পৌঁছে ভান করবেন গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, কিছুতেই চালু করতে পারছেন না।'

'আচ্ছা।'

এ সময়টায় নির্জন হয়ে যায় এলাকাটা। লোকজন প্রায় চোখেই পড়ে না। দোকানপাট আর শিপিং অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে পশ্চিমের ফ্রীওয়ের দিকে চলে গেল একটা গাড়ি। ওভারঅল পরা একজন লোক হেঁটে চলেছে, হাতে একটা ভাঁজ করা জ্যাকেট। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। বাড়িগুলো সব নির্জন লাগছে। পিয়ারগুলো নিষ্প্রাণ। তার ওপাশে চোখে পড়ছে জেটি।

'পেয়ে গেছি,' মোলায়েম গলায় বলল ভিকি।

হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে তাকাল কিশোর আর রবিন। ডানে একটা ইঁটের বাড়ি, বয়েসের ভারে জীর্ণ। সাইনবোর্ডের লেখা মলিন হয়ে গেছে, তবে কোনমতে এখনও পড়া যায়। ইয়ার্ডের দুটো ট্রাকের মধ্যে বড়টা দাঁড়িয়ে আছে গুদামঘরের সামনে। রাশেদ পাশাকেও দেখা গেল।

'চাচারা আছে এখনও,' মুসা আর ডনকে জানাল কিশোর।

'তারমানে চোরটা আসেনি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'এগিয়ে যান,' ভিকিকে বলল কিশোর। 'আধব্লক গিয়ে থামুন।'

গুদামঘরের পাশ কাটিয়ে আগে বাড়ল ভিকি। কিছুদূর এগিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

ভ্যানের পেছন দিকে সরে এল কিশোর আর রবিন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। দেখল, গুদামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বোরিস আর রোভার। ট্রাকে উঠল। রাশেদ পাশা উঠলেন ড্রাইভিং সীটে।

'কিডন্যাপারের নির্দেশ মতই সব করা হয়েছে,' কিশোর বলল। 'আপাতত আর কিছু করার নেই আমাদের। বসে বসে কেবল চোখ রাখা।'

পাশের দরজা খুলে বেরোচ্ছে ভিকি। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যান?'

মুচকি হাসল রুটিওয়ালা। চোখ টিপে বলল, 'ইঞ্জিনটা খারাপ হয়ে গেছে তো। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হলে ড্রাইভার কি করে? নেমে গিয়ে বনেট তুলে দেখে গোলমালটা কোথায় হয়েছে। মেরামতের চেষ্টা করে। তার পরেও স্টার্ট হতে না চাইলে দরদর করে ঘামে, চেষ্টা চালিয়ে যায়। সেটাই করতে যাচ্ছি আমি।'

হাসল কিশোর। 'যান। যত বেশি পারেন ঘামার চেষ্টা করুন। ইঞ্জিন যেন সহজে ঠিক না হয়।'

ষোলো

ইঞ্জিন নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে ভিকটর সোয়ানসন। প্লাগ খুলে পরিষ্কার করে লাগাচ্ছে, রেডিয়েটর দেখছে, ব্যাটারি পরীক্ষা করছে। কিন্তু ইঞ্জিনের গোলমালটা যে কোথায় সেটা আর বের করতে পারছে না।

মেঝেতে বসে আছে তিন গোয়েন্দা আর ডন। মাঝে মাঝে মাথা তুলে সাবধানে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে কিশোর কেউ আসছে কিনা। কাউকে চোখে পড়ছে না। মুসাও হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দেখছে আরেকটা দিক।

'কুয়াশা ঘন হচ্ছে,' মুসা বলল। 'অন্ধকারও বাড়বে। এতক্ষণে গুদামে ঢুকে গেছে কিনা চোরটা কে জানে। দেরি করে বেরোলে তখন এত অন্ধকার হয়ে যাবে আর দেখতেই পাব না।'

'ভেতরে ঢুকেছে বলে মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'এই বোকামি নিশ্চয় করবে না। ও ভাল করেই জানে, মিসেস মরিয়াটি পুলিশে খবর দিলে ওরা এসে ঘেরাও করে ফেলবে বাড়িটা, আর বেরোতে পারবে না সে। কাজেই ভাল করে দেখেশুনেই আসবে, পুলিশ আছে কিনা। বলা যায় না, ভিকিকেও সন্দেহ করে বসতে পারে।'

জানালায় আস্তে করে টোকা দিল কয়েকবার কিশোর। ইঙ্গিতটা বুঝে সেখানে এসে দাঁড়াল ভিকি।

'ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা থামান,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'বুঝে গেছেন, আপনি ঠিক করতে পারবেন না। মেকানিক দরকার। তারমানে ফোন করতে হবে আপনাকে। সেই চেষ্টাই করুন। টেলিফোন কোথায় আছে খোঁজার ভান করুন।'

'ঠিকই বলেছ।'

'যান, খুঁজুন। টেলিফোন একটা আমাদের এমনিতেও দরকার হবে। লোকটা এলে পুলিশকে খবর দিতে হতে পারে। মনে হচ্ছে আপনাকে দেখেই কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে ব্যাটা।'

'যাচ্ছি।' রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল ভিকি।

পাঁচ মিনিট কাটল। কিডন্যাপারের দেখা নেই। আরও সময় গেল। হঠাৎ মুসা বলে উঠল, 'এই, দেখ!'

মুসার নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে কিশোরও দেখতে পেল লোকটাকে। একটা কাঠের আড়ত ঘিরে রাখা বেড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোটখাট একজন মানুষ। তাকিয়ে রয়েছে রুটির গাড়িটার দিকে। সন্দেহ করেছে বোঝা যায়।

'ও-ই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?' ডনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মনে তো হচ্ছে। কুয়াশার জন্যে চিনতে পারছি না।'

'শিওর হয়ে যাব মিনিটখানেকের মধ্যেই,' রবিন বলল।

ভ্যানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা।

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'এদিকেই তো আসছে!'

'গোয়েরাই!' বলল ডন। 'কি করব?'

'বসে থাক। চুপচাপ,' কিশোর বলল।

ঠিক এই সময় হাসি হাসি গলায় কথা বলে উঠল ভিকি, 'ইভনিং।'

'বাড়ি ফেরার তাড়া নেই মনে হয় আজ?' অন্য একটা কণ্ঠ বলল।

'শনিবার তো, কিছু বাড়তি পয়সা কামানোর চেষ্টা করছিলাম। গাধামি করেছি। শনিবার রাতে যে স্যান পেদ্রোর এই দুরবস্থা হয় তা কে জানত। বিক্রি তো কিছু করতে পারলামই না, তার ওপর ইঞ্জিনটা গেল বন্ধ হয়ে। কপালে আজ দুঃখ আছে আমার। বসের বকা খেতে হবে। তো, আপনি কি মনে করে? রুটিটুটি লাগবে?'

'রুটি? হ্যাঁ, হলে মন্দ হয় না। আপনাদের রুটি কেমন জানা যাবে। খিদেও পেয়েছে।'

ভ্যানের কোণে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়সড় হয়ে বসল ছেলেরা। মিশে যেতে চাইছে বিস্কুটের ট্রে আর গাড়ির দেয়ালের সঙ্গে। গাড়িতে উঠে ঝুড়িটা খুঁজতে শুরু করল ভিকি। অন্ধকারে খুঁজে পাচ্ছে না।

রবিনের হাতের কাছেই রয়েছে ওটা। তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল ভিকির হাতে। ঘুরে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে কিডন্যাপারের গায়ের সঙ্গেই ধাক্কা খেয়েছিল। দরজা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে ভেতরে উঁকি মারছিল লোকটা। সহজ কণ্ঠে ভিকি বলল, 'সাদা রুটি, রাই, হোল হুইট, পামপারনিকেল, সাওয়ার ডো ফ্রেঞ্চ ব্রেড, কি

লাগবে?'

জোরে জোরে শ্বাস টানল লোকটা। 'মনে হচ্ছে রুটি আর লাগবে না এখন।'

'ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি? ক্রীম কেক?'

'নাহ্। থ্যাংক ইউ। বিরক্ত করলাম।'

'না, আপনার আর কি দোষ? কপালটাই আজ খারাপ আমার। কিছুতেই বেচতে পারলাম না, গাড়িটাও গেল খারাপ হয়ে। টো ট্রাক কতক্ষণে আসে কে জানে। এখন শুধু শুধু বসে থাকতে হবে।'

'লাভের আশা করলে মাঝে মাঝে কষ্ট করতেই হয়,' লোকটা বলল। 'যাই। গুড ইভনিং।'

'থ্যাংকস।'

চলে গেল লোকটা।

দম আটকে বসে ছিল ছেলেরা। নিঃশ্বাস ফেলল আবার। ফিসফিস করে রবিন বলল, 'আরেকটু হলেই ধরা পড়েছিলাম।'

'দারুণ অভিনয় করেছেন আপনি, ভিকি,' কিশোর বলল, 'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছেন।'

'দুই ব্লক দূরে একটা পেট্রোল পাম্প আছে,' ভিকি জানাল। 'টেলিফোন আছে সেখানে।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। রাস্তা পার হতে দেখল কিডন্যাপারকে। দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়াল গুদামের দরজার কাছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে একবার তাকিয়েই দরজা ঠেলে খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'যাব নাকি?' ডন জিজ্ঞেস করল।

'না, আরও পরে,' কিশোর বলল।

আরেকজন লোককে দেখা গেল রাস্তায়। প্রথমজনের চেয়ে লম্বা। ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল গুদামঘরের দিকে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'পিটাকের মত লাগল না?' মুসা বলল।

'ঠিক যা ভেবেছিলাম!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'চল, যাই। দেখি, কি হচ্ছে ওখানটায়। ভিকি, আমরা যাওয়ার পর দশ মিনিট দেরি করবেন। তারপর গিয়ে ফোন করবেন পুলিশকে। যা-ই ঘটুক, পুলিশকে দরকার হবেই।'

'ঠিক আছে।'

পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত গুদামঘরের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা আর ডন। দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল।

'কিছু তো শুনছি না,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'শুধু পানির শব্দ। বাড়িটার ওপাশেই হয়তো সাগর।'

দরজার হাতল টানল সে। নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। ঘরের দেয়াল আর আরেকটা দরজা দেখতে পেল ওরা। ডানে দেয়ালের অনেক উঁচুতে একটা জানালা রয়েছে, কুয়াশায় ঢাকা সন্ধের কালচে ধূসর আলো আসছে ওপথেই। খালি একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা। দরজাটা একটা ডাবল ডোর, ওপরের অংশে

কাচ লাগানো।

পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ধুলো-ময়লা লাগা কাচের ভেতর দিয়ে তাকাল ওপাশে। অনেক ওপরে সিলিঙের স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে, নিচে আবছা অন্ধকার। একটা থামে ঠেস দিয়ে আয়নাটা দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে বোরিস আর রোভার। সেটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিও গোয়েরা।

তার পেছনেই তার চেয়ে লম্বা লোকটা, পরে যে ঢুকেছে, সিনর পিটাক। নীরবে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েরার দিকে। দরজার একটা পাল্লায় আঙুল রেখে সাবধানে চাপ দিল কিশোর। আধ ইঞ্চি ফাঁক হলো দরজা। ভেতরে দেখার জন্যে যথেষ্ট।

আয়নার ফ্রেমে হাত বোলাল গোয়েরা। তারপর ঘুরতে লাগল ওটার চারপাশে। শেষে পকেট থেকে টেনে বের করল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার।

'কি খুঁজছ, শয়তানের চ্যালা?' আচমকা বলে উঠল পিটাক।

ভীষণ চমকে গেল গোয়েরা। হাত থেকে খসে গেল স্ক্রু-ড্রাইভার। তাকিয়ে রইল পিটাকের দিকে।

'নড়বে না, খবরদার,' ধমক দিয়ে বলল পিটাক। 'আমার কাছে পিস্তল আছে। তোমার মত শুয়োরকে গুলি করে মারতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না আমার।'

আগে বাড়ল পিটাক। ওর হাত দেখতে পেল এখন ছেলেরা। সত্যিই একটা পিস্তল আছে। কিডন্যাপারের মাথা সই করে তুলল সেটা।

'সারা জীবনই তো শয়তানী করলে, আর কত?' পিটাক বলল, 'পিলভারেজ মারা গেছে। তার বিধবা স্ত্রীকে জ্বালাতে চাও নাকি?'

'ওই গাধাটাকে? ছোহ্!'

'গাধা তো আসলে তুমি। থাক এখন ওসব আলোচনা। আসল কথা বলো। আয়নাটাতেই ওটা লুকানো আছে, তাই না? এতগুলো বছর ধরে পিলভারেজের উন্নতির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই আয়নার মধ্যে। আর কেউ সেটা ব্যবহার করার আগেই নষ্ট করে দিতে হবে।'

'ওটা আমার,' গোয়েরা বলল। 'এতগুলো বছর আশায় আশায় থেকেছি, পিলভারেজের গোলামি করেছি শুধু ওটার জন্যে। বলেছে, সে মারা গেলেই পাব আমি, শিয়াভো গ্লাসটা আমার হবে। অথচ তার মাথামোটা গর্দভ বৌটা এটা পাচার করে দিল দেশ থেকে। পারল আমি তখন...'

'জেলে ছিলে বলে,' একটা বাক্সের ওপর বসে পড়ল পিটাক। 'বেচারা লিও গোয়েরা! মনিব মারা যাওয়ার পর এতই টাকার খ্যাঁচে পড়ে গেলে তুমি ইংরেজ ট্যুরিস্টদের পকেট মারতে হলো। গোয়েরা, তুমি হেরে গেছ। সব সময়ই হেরেছ তুমি। আয়নাটাও পাবে না। ধ্বংস করে দেয়া হবে দেশের স্বার্থেই।'

'না!' চিৎকার করে বলল গোয়েরা, 'এটা আমার! আমাকে দিয়ে যাওয়া হয়েছে!'

'পিলভারেজ এখন বেঁচে নেই,' পিটাক বলল। 'ও তোমাকে কি কথা দিয়েছিল না দিয়েছিল তা নিয়েও আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি এখন আয়নাটা নষ্ট করব।'

'না!' আবার চিৎকার করে উঠল গোয়েরা। পিস্তলের পরোয়া আর করল না। মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে পিটাকের ওপর। পিস্তলধরা হাতে থাবা মারল।

বিকট শব্দ করে গুলি ফুটল। ইস্পাতের থামে লেগে পিছলে গিয়ে কাঠের দেয়ালে গেঁথে গেল বুলেট। চিৎকার করে হাত ঝাড়া দিয়ে গোয়েরাকে সরাতে চেষ্টা করল পিটাক। পারল না। তার হাত থেকে পিস্তলটা খসিয়েই ছাড়ল গোয়েরা। খটাস করে মেঝেতে পড়ে পিছলে এক দিকে সরে গেল ওটা।

দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন পিস্তলটা ধরার জন্যে। গোয়েরার হাত লেগে আরও সরে গেল ওটা, খোলা ট্র্যাপ ডোর দিয়ে হারিয়ে গেল, ধরতে পারল না সে। টুপ করে একটা শব্দ হলো, পিস্তলটা পানিতে পড়ারই বোধহয়। তার মানে গেল ওটা।

উঠে দাঁড়াল পিটাক। 'গুলি করাই উচিত ছিল তোমাকে। না করে ভুল করেছি। যাই হোক, আয়নাটা তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।' গুদামের ভেতর জঞ্জালের অভাব নেই। মোটা দেখে একটা কাঠের ডাণ্ডা তুলে নিয়ে গিয়ে আয়নাটার সামনে দাঁড়াল সে। 'যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো। কাছে আসার চেষ্টা করলেই আয়নায় বাড়ি মারব আমি।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। বলল, 'আয়নাটা ভাঙার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। দয়া করে যদি জবাব দেন খুশি হব।'

পাঁই করে ঘুরল গোয়েরা। অবাক হয়ে গেছে ছেলেদের দেখে। বিশেষ করে ডন কারনেসকে, যাকে বন্দি করে রেখে এসেছিল পরিত্যক্ত খামারবাড়িতে। চেঁচিয়ে উঠে তেড়ে এল।

'থামুন, থামুন বলছি!' চেঁচিয়ে তাকে হুঁশিয়ার করল মুসা। 'ভাল হবে না...'

থামল না গোয়েরা। ঘুসির প্রতিশোধ নিতে তৈরি হয়েই আছে মুসা। লোকটাকে আর মারার সুযোগ দিল না। দমাদম কয়েকটা ঘুসি মারল নাকেমুখে। আঁউ করে উঠল গোয়েরা। পিছিয়ে গেল তাকে সোজা হওয়ার সুযোগও দিল না সে। এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে আরেক পা সোজা করে চরকির মত পাক খেয়ে কারাতের লাথি চালাল। জায়গামতই লাগল লাথিটা। সহ্য করতে পারল না গোয়েরা। পড়ে গেল। তার বুকের ওপর চেপে বসল মুসা। সুর করে বলল কিশোরের কাছে শেখা বাংলা ছড়াটাঃ বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ। শেষে ইংরেজিতে যোগ করল, 'যদি নড়াচড়া করো তবে।'

ছড়াটার মানে কিছুই বুঝল না গোয়েরা, তবে নড়াচড়া করল না, হুমকিটা আন্দাজ করে নিয়েছে। অবশ্য এত প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর বুকের ওপর মুসা আমানের জগদ্দল পাথরের মত ভারি শরীর নিয়ে নড়ার সাধ্যও নেই তার।

'এইবার,' থ হয়ে থাকা পিটাকের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'আমাদের বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা যে কম নয় এটা নিশ্চয় বোঝা হয়ে গেছে আপনার। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতেই হবে আমাকে। তার আগে এঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে না কেউ।'

সতেরো

মুসার নিচে থেকে হাঁসফাঁস করতে লাগল গোয়েরা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। পিটাকের দিকে তাকিয়ে বার বার একই কথা বলতে লাগল, 'আয়নাটা ভেঙো না! আয়নাটা ভেঙো না! ঠিক আছে, তোমার হলে তোমারই, কিন্তু ভেঙো না। নিয়ে চলে যাও। ভাঙলে আমার নানী হার্টফেল করে মরে যাবে!'

'আরও একটা ব্যাপার ঘটবে,' কিশোর ফোড়ন কাটল। 'ভাঙলে দিয়েগো পিলভারেজের গোপন রহস্যও ফাঁস হয়ে যাবে, তাই না গোয়েরা? মজার ব্যাপার হলো তুমি এখনও জানোই না কি ফাঁস হবে।'

'জানি,' চেঁচিয়ে উঠল গোয়েরা। 'সব সময়ই জানতাম।'

'তবে কোথায় লুকানো আছে জানো না, তাহলে স্ক্রু-ড্রাইভার বের করতে না। সিনর পিটাক, আপনিও জানেন বলে মনে হয় না। জাদুকর শিয়াভোর বংশধর বলে যে গল্প শুনিয়ে এসেছেন আমাদের, সেটাও বানানো।'

'আমি কিছুই বলতে চাই না,' পিটাক বলল।

'আপনাকে খুব বেশি বলতে হবেও না,' কিশোর বলল। 'অনেক কিছুই আমাদের এখন জানা। এই যেমন ধরুন, রাফিনোর প্রেসিডেন্টের আদেশে আপনি কাজ করছেন। শিয়াভোর সাথে আপনার কেন, আপনার দূর সম্পর্কের আত্মীয়দেরও কোন সম্পর্ক কখনও ছিল না। প্রেসিডেন্টের ছেলে আপনি, তাই না?'

বাক্সটার ওপর আবার বসে পড়ল পিটাক। 'তাহলে তুমি...তুমিই ঢুকেছিলে আমার হোটেল রুমে! আমার কাগজপত্র ঘেঁটেছ!'

'না, ও নয়,' মুসা বলল, 'ঢুকেছিল গোয়েরা। আপনাকে বাড়ি মেরেছিল। আমি বাইরেই ছিলাম। আপনার পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছি, গোয়েরাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।'

বান মাছের মত শরীর মোচড়াতে লাগল রোগা-পটকা গোয়েরা। ছাড়া পেলে আবার যেন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে পিটাকের ওপর। 'ওই লোকটা, ভদ্র পোশাক পরা ভদ্রতার মুখোশে ঢাকা লোকটা কেবল ভাল ভাল কথা বলে। দেশের উপকারের কথা বলে। প্রেসিডেন্টের ভাতিজা ও। যে প্রেসিডেন্টের ধারণা তাকে ছাড়া রাফিনোর চলবে না, কোন গতি থাকবে না। আস্ত চোর! প্রেসিডেন্টটা যেমন, তার ভাতিজাটাও তেমন!'

গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'বারো বছর আগে ফাইবার ইলেকশনে জিতলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিকোলাস তাঁকে অসৎ বলে প্রচার করতে লাগলেন। তবে প্রমাণ দিতে পারলেন না। আবার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াবেন ফাইবার। যদি কেউ সেই প্রমাণটা বের করে দেয়? কি ঘটবে তখন?'

'রাফিনোর সর্বনাশ হবে,' পিটাক বলল, 'আর কি হবে!'

'যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ চলে আসতে পারে সিনর পিটাক,' কিশোর বলল। 'আমরা খবর পাঠিয়েছি। ওরা জানতে চাইবে আয়নাটার এত কেন দরকার যার জন্যে কিডন্যাপ করার প্রয়োজন পড়ল। আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারছি.

কেন।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল পিটাক। 'জানো? জানার তো কথা নয়!'

'ব্ল্যাকমেলের ঘটনা, তাই না সিনর পিটাক? এলিজাবেথ পিলভারেজ সহজ সরল মানুষ। তিনি জানতেন না কি করে তাঁর স্বামী এত দ্রুত উন্নতি করে ফেলেছে। তিনি না জানলেও আমরা আন্দাজ করতে পারি। পিলভারেজ জানত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সত্যি। প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেল করে সে।'

ঝুলে পড়ল পিটাকের কাঁধ। 'তোমাদের পুলিশ সে খবর বের করতে পারবে না! আমার চাচা ক্ষমতায় আসার আগে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে রাফিনোবাসীকে। বিদ্রোহ, খুনোখুনি হয়ে যেত। চাচা ক্ষমতায় আসাতে শান্তি পেয়েছে দেশের মানুষ, উন্নতি হয়েছে। চাচার কোন দোষ নেই, কেউ দেখাতে পারবে না। তাকে যারা সাহায্য করছে সবাই ভাল লোক, কেবল পিলভারেজটা বাদে, আস্ত শয়তান!'

'আস্ত ব্ল্যাকমেলার,' শুধরে দিল যেন কিশোর। 'মারা গেছে, আর শয়তানী করতে পারবে না।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পিটাক। 'বেশ, বলছি তোমাকে সব কথা। তবে আয়নার মধ্যে কোথায় লুকানো আছে ওটা জানা থাকলে তুমিও বলবে আমাকে।'

লিও গোয়েরার দিকে তাকাল সে। 'ওই শুয়োরটা, ওটা ছিল দিয়েগো পিলভারেজের চাকর। পকেটমার ছিল, ছিঁচকে চোর। এখন তো শুনলাম কিডন্যাপিংও করেছে। অবাক হইনি শুনে। ওর মত লোকের পক্ষে যে কোন কাজ করা সম্ভব। ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু নেই। দশ বছর ধরে পিলভারেজের গোলামি করেছে, বুঝতেই পারছ মনিবটাও কেমন লোক ছিল। সিনোরা পিলভারেজের মত এত ভাল একজন মহিলা যে কি করে ওই শয়তানটাকে বিয়ে করেছিল ঈশ্বরই জানে। কিছু মহিলা এরকম বোকামি অবশ্য করে। পছন্দে মার খায়। সিনোরা পিলভারেজকেও সারা জীবন ধরে তাঁর বোকামির খেসারত দিতে হয়েছে।'

'বোকা মেয়েমানুষ!' গোয়েরা বলল।

'চুপ!' ধমক লাগাল পিটাক। 'তুমি তো একটা চোর। তুমি তাঁর সমালোচনা করার কে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যৌবনে আমার চাচা বোকা ছিল। ওই বয়েসে মানুষ একটু বোকাই থাকে। স্পেনে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠানো হলো তাকে। দিয়েগো পিলভারেজও তখন স্পেনে পড়তে গেছে। তার কাছে রয়েছে শিয়াভোর আয়নাটা। আয়নাটা ন্যায্য দাম দিয়ে কিনেছে। এর মধ্যে কোন অসাধুতা ছিল না। সম্ভবত ওটাই ছিল তার শেষ ভাল কাজ, এরপর আর ভাল কিছু করেনি। শিয়াভোর এক ছেলে ছিল, তার ছিল এক ছেলে, এবং তার এক ছেলে। এভাবে এক ছেলে এক ছেলে করতে করতে শেষমেষ এক মেয়েতে এসে দাঁড়িয়েছিল! ওই মেয়ে বিয়ে করেনি। তার সাথে যখন পিলভারেজের দেখা হয় তখন বুড়ো হয়ে গেছে মহিলা। সাংঘাতিক গরিব, ভীষণ কষ্ট। থাকত ছোট্ট শহর ক্যাসটিলিতে। তার কাছে ছিল ওই আয়নাটা। টাকার খুব অভাব তখন মহিলার।

'পিলভারেজেরও টাকার কষ্ট। তবে তার বয়েস কম। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিছু টাকা ধার করে মহিলার কাছ থেকে আয়নাটা কিনে নিল সে। মাদ্রিদে পাঠিয়ে

দিল। সমস্ত জায়গায় বলে বেড়াতে লাগল, বিজ্ঞাপন করতে লাগল, তার কাছে আছে জাদুকর শিয়াভোর আয়না। ছড়িয়ে পড়ল ওটার কথা, লোকে আগ্রহী হতে আরম্ভ করল, সত্যিই কি অলৌকিক ক্ষমতা আছে আয়নাটার? পিলভারেজ এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সত্যিই আছে। আকারে ইঙ্গিতে বলেও দিল সে নিজেও আয়নার গবলিনদের জিজ্ঞেস করে তার ভবিষ্যৎ জানতে পেরেছে।

'খুব বেশি দিন এই প্রচার চালাতে হলো না। কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র এসে হাজির তার কাছে, তাদের ভবিষ্যৎ জানতে চায়। পিলভারেজ আয়নাকে জিজ্ঞেস করে তাদের ভবিষ্যৎ বলে দিল। বোকাগুলোও বিশ্বাস করল তার কথা। তারপর ঝড়ে বক মরল, কিছু কিছু কথা সত্যি হয়ে গেল, ফকিরেরও কেরামতি বাড়ল। ওরা বিশ্বাস করে বসল তখন সত্যিই গবলিনদের সাথে কথা হয় পিলভারেজের। ওরাই তখন প্রচার আরম্ভ করে দিল। নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল পিলভারেজের, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়। আস্তে আস্তে শহরের ধনী লোকেরাও আসতে শুরু করল তার কাছে।

'পিলভারেজের ভেতরের শয়তানও মাথা চাড়া দিতে লাগল। লোককে ঠকিয়েই ক্ষান্ত হলো না সে, আরও বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ল। একদিন ধনী এক বুড়ো এল তার কাছে। বড় একটা অসুখ রয়েছে লোকটার। তাকে বলে দিল সে, জাহাজে করে কিছুদিনের জন্যে বেড়িয়ে এলে রোগ সেরে যাবে। তাই করল বুড়ো। কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আরেকবার এক মহিলাকে বলল, তার যত নগদ টাকা আছে সব নিয়ে গিয়ে গির্জার পাদ্রীকে দিয়ে শুদ্ধ করে আনতে হবে, নইলে ওই টাকা থাকবে না। মহিলা ওই টাকা নিয়ে গির্জায় যাওয়ার পথে সেগুলো চুরি হয়ে গেল। এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকল। সব আর বলতে চাই না। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, বেশি বলার দরকার নেই তোমাকে।'

'পুলিশ কি করেছে?' মুসা বলল, 'ধরতে পারল না?'

'তখনও আসলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। এসব শয়তানী শুরু করার আগেই আমার চাচার ওপর চোখ পড়েছে পিলভারেজের। ওই বয়েসেই দেশের প্রতি সাংঘাতিক টান হয়ে গেছে চাচার, রাফিনোর উন্নতি কি করে করা যায় তা নিয়ে ভাবত। যখন-তখন যার-তার সামনে দেশের আলোচনা শুরু করে দিত। পিলভারেজের কাছেও করেছিল। লোকটা যেমন শয়তান ছিল তেমনি ছিল বুদ্ধিমান। বুঝে ফেলেছিল এই লোক কালে বড় কিছু হয়ে যাবে। চাচার ওপর প্রভাব বিস্তারের ফন্দি করল পিলভারেজ। ব্ল্যাকমেল করার প্ল্যান করল।'

'কোন ভাবে নিশ্চয় ফাঁদে আটকে ফেলল আপনার চাচাকে?' রবিন বলল, 'ব্ল্যাকমেলাররা সাধারণত যা করে?'

'হ্যাঁ। একটা সুন্দরী মেয়েকে ধরল পিলভারেজ, এক ধনী প্রভাবশালী লোকের বাড়িতে কাজ করত মেয়েটা। বলল, আয়নায় জানতে পেরেছে মেয়েটাকে ঠকাবে তার মনিব। শুধু তাই নয়, আরও অনেক ক্ষতি করবে ভবিষ্যতে। সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত তার। ঠকবার আগেই আখেরও গুছিয়ে নেয়া উচিত। বলল, একজন লোককে চেনে যে তার মনিবের মূল্যবান অলংকার আর রত্ন অনেক দামে

কিনতে রাজি আছে। লাল কাগজে মুড়ে মেয়েটা যদি অলংকারের বাক্স নিয়ে আসে, বিক্রি করিয়ে দিতে পারবে। রাজি হলো মেয়েটা। যেভাবে যা করতে বলা হলো তাই করল। বাক্সটা নিয়ে গিয়ে দিল সেই লোকটাকে, যার সাথে দেখা করতে বলেছে পিলভারেজ। লোকটা বাক্সটা নিয়ে মেয়েটাকে একটা খাম দিল, তাতে টাকা থাকবে বলে দিয়েছে সে। সেই লোকটা হলো আমার চাচা।'

'একটা চোর!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল গোয়েরা।

'আমার চাচা কিছু জানত না!' চেঁচিয়ে উঠল পিটাক। 'সে ভেবেছিল পিলভারেজের একটা উপকার করছে। সে রকমই বুঝিয়েছে তাকে শয়তানটা। বলেছে তার একটা চিঠি মেয়েটাকে দিয়ে আসতে হবে, বিনিময়ে একটা উপহার দেবে চাচার হাতে মেয়েটা। রাস্তার মোড়ে একটা ফোয়ারার কাছে দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। আগে থেকেই সেখানে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে লুকিয়ে ছিল পিলভারেজ। চিঠি আর বাক্স বিনিময়ের ছবি তুলে ফেলল।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'পুলিশ ওই ছবি দেখলেই বিশ্বাস করবে মেয়েটাকে টাকা দিয়ে চোরাই মাল কিনেছেন আপনার চাচা।'

'তাই তো করবে। যাই হোক, মেয়েটা খাম খুলে দেখল টাকা নেই, আছে সাদা কাগজ। ভয় পেয়ে গেল সে। গহনা না পেয়ে পুলিশে খবর দিল তার মনিব। পুলিশ এলে ভয়ে তাদের কাছে সব কথা বলে দিল মেয়েটা। তখন দেরি হয়ে গেছে। স্পেন থেকে রাফিনোতে রওনা হয়ে গেছে আমার চাচা। কিছুই জানতে পারল না এসবের। পিলভারেজও বুঝতে পেরেছে স্পেনে থাকা আর নিরাপদ নয়, আয়নাটা নিয়ে পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়ল। সাথে রইল সেই গহনাগুলো আর ছবিটা। স্পেনের খবরের কাগজে শিয়াভো গ্লাস নিয়ে তার শয়তানীর খবর ছাপা হলো।'

'রাফিনোতে গিয়ে তারপর আপনার চাচাকে ব্ল্যাকমেল শুরু করল পিলভারেজ?' মুসার প্রশ্ন।

'রাফিনোতে গেল ঠিকই,' পিটাক বলল, 'তবে গিয়েই কিছু করল না। মানুষকে ঠকিয়ে অনেক টাকা করে ফেলেছে সে তখন। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। পটিয়ে পাটিয়ে বিয়ে করল এক ধনী লোকের একমাত্র কন্যাকে, হ্যাঁ, তিনিই সিনোরা এলিজাবেথ। টাকার আর কোন অভাবই রইল না পিলভারেজের। সময় কাটতে লাগল। তারপর, বারো বছর আগে ইলেকশনের সময় যখন একটা বিদ্রোহ হয়ে যাচ্ছিল রাফিনোতে আরেকটু হলেই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পিলভারেজ। চাচার কাছে পাঠিয়ে দিল ফটোগ্রাফের একটা কপি আর পুরানো স্প্যানিশ খবরের কাগজের কাটিঙের ফটোকপি। চাচাকে জানাল একটা অপরাধের সাথে জড়িত ছিল সে, এবং তার প্রমাণ আছে তার কাছে। খবরটা জানাজানি হলে ক্যারিয়ার একেবারে শেষ হয়ে যাবে চাচার। ইলেকশনে কোন দিনই জিততে পারবে না।

'পিলভারেজের ব্ল্যাকমেলের শিকার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ রইল না চাচার। প্রথমে টাকা চাইল পিলভারেজ, দিল চাচা। তারপর ক্ষমতা। তা-ও পেল। একটা বড় বাড়ির মালিক হলো পিলভারেজ। তার পর থেকে প্রতি বছরই ইলেকশনে জেতার দিনটি এলে যে উৎসব হয় তার আগে পুরানো ফটোগ্রাফের

কপি পেতে লাগল চাচা। অপরাধের কথাটা এক বৎসর পর পর মনে করিয়ে দেয় পিলভারেজ।

'শয়তানটা মরার পরে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, কারণ চাচার এই দুঃখের খবর আমিও জানতাম, চাচাই বিশ্বাস করে একদিন বলেছিল। ভাবলাম, ব্ল্যাকমেলের অভিশাপ থেকে বাঁচা গেল। থামবে এবার।

'সিনোরা পিলভারেজের সাথে দেখা করলাম। বেচারি। তার অবস্থা দেখে বড় মায়া লাগছিল। ওরকম একজন ভদ্রমহিলাকে বলতেই মুখে আটকাচ্ছিল যে তাঁর বাড়িটা আমরা সার্চ করতে চাই। আমাকে চিনতেন তিনি, পছন্দ করতেন। দেখেই লিও গোয়েরার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। চোরটা নাকি গিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছে আয়নাটা তিনি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে। নানা আজেবাজে কথা বলেছে। আয়নাটা আবার ফিরিয়ে এনে না দিলে মারবে বলেও শাসিয়েছে।

'বাড়ি আর খুঁজে দেখতে হলো না, যা বোঝার বুঝে ফেললাম। ছবির নেগেটিভ যা আমরা খুঁজছি তা ওই আয়নার মধ্যেই লুকানো আছে। পিলভারেজ গোপন কথা দুনিয়ায় যদি কোন একটি লোকের কাছে বলে গিয়ে থাকে তো সে তার বিশ্বস্ত চাকর লিও গোয়েরা, যে তার সমস্ত শয়তানীর দোসর। গোয়েরার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করলাম। যখন জানলাম, লস অ্যাঞ্জেলেসের প্লেন ধরেছে চোরটা, শিওর হয়ে গেলাম ওই আয়নাতেই আছে জিনিসটা।'

'তখন আপনিও চলে এলেন লস অ্যাঞ্জেলেসে,' কিশোর বলল, 'আয়নাটা মিসেস মরিয়াটির কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করলেন। তিনি যখন কিছুতেই বেচতে রাজি হলেন না, শিয়াভোর বংশধর বলে এক গল্প ফেঁদে বসলেন। তাতেও যখন সুবিধে করতে পারলেন না, তখন ভূত সেজে ভয় দেখানোর জন্যে ভাড়া করলেন মারকাসকে।'

বুকের ওপর ঝুলে পড়ল পিটাকের মাথা। আবার সোজা করল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'সত্যি, আমি দুঃখিত। আয়নাটা হাত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি। কেন, বুঝতেই তো পারছ।'

অনেক কথা বলেছে। কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হলো পিটাক। ছেলেরাও চুপ করে আছে। সাইরেন শোনা গেল।

'ওই যে,' মুসা বলল, 'পুলিশ বোধহয় এসে গেল।'

শঙ্কিত হলো পিটাক। 'পুলিশকে কি বলব? আয়নাটা পরীক্ষা করে দেখতে চাইবে ওরা!'

হেসে উঠল গোয়েরা। একটু বোধহয় ঢিল পড়েছিল মুসার, হাতের ধাক্কায় তাকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল সে। লাফিয়ে উঠে গিয়ে পিটাকের ফেলে দেয়া কাঠটা তুলে নিয়ে ছুটল আয়নাটাকে বাড়ি মেরে ভাঙার জন্যে। 'প্রমাণটা আমার দরকার! কেউ আর...'

আচমকা থমকে দাঁড়াল সে। গবলিন গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে লাঠি ফেলে দিয়ে ছুটে পালাতে গেল। ট্র্যাপডোরটা চোখেই পড়ল না।

ঝপাৎ করে শব্দ হলো পানিতে।

বাইরে অনেক মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল।
গুদামঘরের মেঝের নিচে পানি থেকে শোনা গেল আর্ত চিৎকার।
'নেগেটিভ!' খসখসে হয়ে উঠল পিটাকের কণ্ঠ। 'নেগেটিভটা কোথায়?'
আয়নাটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। নখ দিয়ে খুঁটে নতুন লেবেলটার কোণা তুলল, চিমটি দিয়ে ধরে টেনে তুলে আনল লেবেলটা। ভেতর থেকে বেরোল আরও একটা জিনিস। পিটাকের হাতে দিয়ে বলল, 'নিন, মাইক্রোফিল্ম।'
কিশোরকে ধন্যবাদ দিয়ে কাঁপা হাতে লেবেল আর মাইক্রোফিল্ম দুটোই পকেটে ভরে ফেলল পিটাক। ঠিক এই সময় আলো হাতে ঘরে ঢুকল পুলিশ।
'ডন কারনেস?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল একজন সার্জেন্ট। 'কে ডন কারনেস?'
'আমি,' জবাব দিল ডন।
নিচে আবার শোনা গেল চিৎকার।
কে চিৎকার করছে জেনে নিয়ে ট্র্যাপডোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন পুলিশ। দড়ির বাণ্ডিল খুলে একটা প্রান্ত নামিয়ে দিল নিচে। তুলে আনল বড়শিতে গাঁথা মাছের মত ছটফট করতে থাকা গোয়েরাকে। ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল সে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।
ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল সার্জেন্ট, তারপর ফিরল ডনের দিকে, 'এই লোকই তোমার কিডন্যাপার?'
'হ্যাঁ। ওর নাম লিও গোয়েরা।'
'আর এই লোক?' পিটাককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।
'সিনর পিটাক,' কিশোর বলল। 'আমাদের বন্ধু। সাহায্য করেছে।'
'অমন করছে কেন ও?' গোয়েরার ওপর ঝুঁকে রয়েছে একজন অফিসার। 'ভূত দেখেছে নাকি?'
'ওটা, ওটাকে দেখেছি আমি!' আর্তস্বরে বলল গোয়েরা। 'আয়নার মধ্যে...'
'আয়না?' চোখে কৌতূহল নিয়ে গবলিন গ্লাসটার দিকে তাকাল সার্জেন্ট।
'ওটার মালিক ছিল এক বিখ্যাত জাদুকর,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'মনে করা হয় ওটার ভেতরে ভূত আছে। এই লোকটা ভীষণ ভয় পায় আয়নাটাকে, দেখতে পাচ্ছেন না? এই একটু আগে নাকি ভেতরে একটা ভূত দেখেছে সে।'
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল সার্জেন্ট।
কিশোর বলল, 'দৃষ্টি বিভ্রম। মনে ভয় ছিল, সেই সাথে অল্প আলো। কি দেখতে কি দেখেছে কে জানে।'
আয়নাটার দিকে তাকাল। 'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল পুলিশ অফিসার। ধুলোয় ঢাকা নোংরা গুদামঘরে আয়নাটা দাঁড়িয়ে আছে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে উল্টো দিকের দেয়াল আর মাকড়সার জাল। অতি সাধারণ একটা পুরানো আয়না, ফ্রেমটা যতটা সম্ভব কুৎসিত করা যায় করা হয়েছে।

আঠারো

দুই সপ্তাহ পরে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে গেল তিন গোয়েন্দা। কিশোরের হাতে একটা খাম, সেটা দিল তাঁকে।

কোন প্রশ্ন ছাড়াই খামটা খুললেন পরিচালক। বের করলেন দামী, মাখনরঙা একটা চিঠি লেখার কাগজ। কয়েকটা লাইন লেখা। দ্রুত সেটা পড়ে ফেলে চিঠিটা টেবিলে রাখলেন তিনি। 'তাহলে মিসেস মরিয়াটি আমাকেও দাওয়াত করেছেন, সিনর পিটাকের সম্মানে দেয়া ডিনার পার্টিতে। ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। দাওয়াতের নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

হেসে একটা ফাইল ফোল্ডার মিস্টার ক্রিস্টোফারের দিকে ঠেলে দিল রবিন। 'এর মধ্যে কেসের সমস্ত রিপোর্ট আছে। এই কেসের ব্যাপারে যে আপনি ইনটারেস্টেড হবেন একথা বলেছি সিনর পিটাককে। সব কথা গোপন রাখবেন একথাও বলেছি।'

ফাইলটা খুললেন পরিচালক।

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেরা।

একটিবারের জন্যেও মুখ না তুলে পড়ে গেলেন পরিচালক। শেষ পাতাটা শেষ করে তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। 'ছবিটার কথা শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আয়নার গোপন রহস্য কি, কোথায় লুকানো রয়েছে সেটা?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'সিনর পিটাক যখন বলল একটা ছবির সাহায্যে তার চাচাকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে তখনই বুঝেছি নেগেটিভটা লুকানো রয়েছে কোথাও। আয়নাটা আগেই খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও বাকি রাখিনি, লেবেলগুলোর নিচে ছাড়া। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওখানেই রয়েছে নেগেটিভটা। ছবি আর খবরের কাগজের লেখা মাইক্রোফিল্ম করে ছোট করে নিয়েছিল পিলভারেজ যাতে লুকিয়ে রাখতে সুবিধে হয়। প্রতি বছর একবার করে লেবেলের নিচ থেকে বের করে নিজের বাড়িতেই ডার্করুমে সেটা প্রিন্ট করে পাঠিয়ে দিত প্রেসিডেন্টের কাছে। লেবেল একবার তুললেই দাগ পড়ে যায়, পরে যত যত্ন করেই লাগানো হোক বোঝা যায়ই তোলা হয়েছিল। আমার মনে হয় অনেকগুলো লেবেল কিনে নিয়েছিল পিলভারেজ, কিংবা ছেপে নিয়েছিল।'

'অবাক হচ্ছি ভেবে লিও গোয়েরার মত এরকম একজন লোককে বিশ্বাস করল কি করে পিলভারেজ,' পরিচালক বললেন। 'আর তাকে জানালই বা কেন আয়নার মধ্যে একটা জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

'সেটা বোধহয় কোনদিনই জানতে পারব না,' কিশোর বলল। 'গোয়েরা মুখ খুলছে না। হতে পারে ভজিয়ে-ভাজিয়ে লোভ দেখিয়ে আটকে রেখেছিল ওকে পিলভারেজ। বলেছিল, ওর কথা মত চললে একদিন অনেক টাকার মালিক হতে পারবে, সেই সাথে ক্ষমতা। প্রচণ্ড লোভ দেখিয়েই সম্ভবত তাকে আটকে রেখেছিল পিলভারেজ।'

'একটা মাইক্রোফিল্মের জন্যে এত কিছু। কিন্তু আয়নাতেই রাখতে গেল কেন

পিলভারেজ? ওরকম ছোট একটা জিনিস সহজেই অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা যেত।'

'আয়নাটাকে ঘিরেই তো সব কিছু,' কিশোর বলল, 'হয়তো এটাই কারণ। বলা যায় এক ধরনের ইভ্‌ল্ পোয়েট্রি রচনা করেছিল পিলভারেজ। আয়নার ফাঁকিতে ফেলেই মাদ্রিদের সেই মেয়েটাকে অপরাধ করতে বাধ্য করেছিল। ওই অপরাধের ওপর ভিত্তি করেই ফাঁদে ফেলেছিল প্রেসিডেন্টকে। সব সময় কেবল আয়না আর আয়না, মনে গেড়ে বসেছিল, অবচেতন ভাবে হয়তো তাই আয়নার মধ্যেই মাইক্রোফিল্ম লুকানোর বুদ্ধিটা এসে যায় তার মাথায়।'

'বুদ্ধিটা অবশ্য মন্দ করেনি। এর মধ্যে একটা শৈল্পিক ব্যাপার রয়েছে। যাই হোক, পুলিশ কি বলে এখন?'

'ওদের ধারণা,' জবাবটা দিল মুসা, 'গোয়েরা পাগল। ভাবুক, সেটাই ভাল। তাদের ভুল ভাঙাতে যাচ্ছে না কেউ।'

মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। 'তার মানে বেশ কিছু দিন তাকে আর ছাড়ছে না পুলিশ। এখন বল তো, পিটাকের হোটেল কি করে খুঁজে পেল গোয়েরা? আর একেবারে ঠিক সময়ে গিয়ে গুদামঘরেই বা হাজির হলো কিভাবে পিটাক?'

'সিনর পিটাক আর গোয়েরা সারাক্ষণই একজন আরেকজনের ওপর নজর রাখার চেষ্টা করছিল,' কিশোর বলল। 'দু'জনেরই ভয় ছিল, এই বুঝি অন্যজন আয়নাটা আগে হাতে পেয়ে গেল। মনে হয় মিসেস মরিয়াটির বাড়িতে চোখ রাখার সময়ই পিটাককে দেখে ফেলে গোয়েরা। তারপর তার পিছু নিয়ে দেখে আসে কোন্ হোটেলে উঠেছে। বুঝতে পারে, পিটাক তার পথে বাধার সৃষ্টি হবে, তাই তার ওপর হামলা করে বসে।

'আর গোয়েরা কোথায় আছে সেটা পিটাক বের করে এমন একটা কাজ করে যা আমরা করার সময়ই পাইনি। একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যায় সিলভার লেকে, খোঁজ করে করে বের করে ফেলে গোয়েরার ভাইয়েরা কোথায় থাকে। তারপর তার পিছু নেয়। গিয়ে দেখে আসে স্যান ফার্নান্দো ভ্যালির খামার বাড়িটা। ওটার ব্যাপারে গোয়েরার আগ্রহের কারণ বুঝতে পারেনি তখনও। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গোয়েরাকে খামারবাড়ির কাছে দেখতে পায় সে, তবে ডন যে ভেতরে রয়েছে এটা বুঝতে পারেনি। গোয়েরার গাড়ি দেখে খামারবাড়ির সামনে, গোয়েরা বেরোলে তাকে অনুসরণ করে চলে যায় স্যান পেদ্রোতে।'

'সিনর পিটাকের ভাগ্য ভাল,' পরিচালক বললেন, 'গোয়েরা তাকে খুন করেনি। সেদিন হোটেলে বাড়িটা আরেকটু জোরে লাগলেই মরে যেতে পারত। যাই হোক, মারকাসের কথায় আসা যাক। নামটা আগেও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

হাসল কিশোর। 'মারকাসকে চিনত পিটাক। রাফিনোতে ম্যাজিক দেখাতে দেখেছে। অনেক খেলাই জানে মারকাস, তবে সব চেয়ে ভাল পারে যেটা সেটা হলো নিজেকে মুক্ত করে ফেলা। এসকেপ আর্টিস্ট। মারকাসের ওই খেলা দেখেছে পিটাক। হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে সেই শেকল পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছিল দরজার খিলের সাথে। আটকে রাখা যায়নি মারকাসকে। তিন সেকেণ্ডে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল। সেটা দেখেই পিটাকের মনে হয়েছিল যত তালাই দেয়া থাক

মারকাসকে কোন ঘরে ঢোকা থেকে ঠেকানো যাবে না। মিসেস মরিয়াটির বাড়িতে ঢোকানোর বুদ্ধিটা মাথায় আসে তার।

'সহজেই মারকাসকে খুঁজে বের করে পিটাক, থিয়েট্রিক্যাল এজেন্টদের কাছে খোঁজ নিয়ে। ভাবে, মিসেস মরিয়াটির বাড়িতে ঢুকে আয়নায় ভূত দেখানোর অভিনয়টা করেই বেরিয়ে আসবে। সেটা করলেই ভাল হত। তা না করে বেশি চালাকি করতে গিয়েছিল মারকাস। টেরিয়ানোর বাড়ির নাড়িনক্ষত্র তার চেনা। লাইব্রেরি দিয়ে যে গুপ্তঘরে ঢোকা যায় জানে। কাজেই খাবার দাবার নিয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকে বসেছিল কয়েক দিন থাকার জন্যে। যাতে বেরিয়ে এসে বার বার ভূতের ভয় দেখাতে পারে। অনেক টাকা খেয়েছে পিটাকের কাছ থেকে, তাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল।

'বেচারা মারকাস। দরজাটা পেয়ে গিয়ে আমরা যখন গুপ্তঘরে ঢুকলাম, ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। বুঝতে পেরেছিল, ভূত দেখানোর খেলাটা অত মজার নয়। মিসেস মরিয়াটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঠিক করেছে, এই সব ঝামেলার মধ্যে আর নয়। পুলিশে ধরলে জেলে যেতে হবে। জেলে আটকে থাকার চেয়ে না খেয়ে থাকা অনেক ভাল। বুঝল, ভবিষ্যতে আর করবে না বটে, তবে যা করে ফেলেছে তার জন্যেও শাস্তি মাফ হবে না ধরা পড়লে। সুতরাং পালাল বোর্ডিং হাউস থেকে, আমাদের কিংবা পিটাকের সামনে পড়তে চাইল না আর।

'মিসেস মরিয়াটি অবশ্য মাফ করে দিয়েছেন তাকে। কায়দা করে ভ্যারাইটি আর হলিউড রিপোর্টার পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, মারকাসের কোন ভয় নেই। পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন হবে না আর। মিসেস মরিয়াটির সাথে এসে দেখা করেছে সে। ডিনার পার্টিতে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তাকেও। টেরিয়ানোর পোশাক পরে উধাও হওয়ার খেলাটা দেখাবে আবার।'

'নিশ্চয় সেই গুপ্তদরজা দিয়ে ঢুকে পড়বে,' অনুমান করলেন পরিচালক। 'দরজাটা দেখার লোভ হচ্ছে।'

'দাওয়াতে গেলেই দেখতে পাবেন,' মুসা বলল।

'দেখি।' এক মুহূর্ত ভাবলেন পরিচালক। 'ও, ভিকটর সোয়ানসনের খবর কি? চাকরিটা আছে তো? মালিকের সাথে গোলমাল হয়নি?'

'না। গুদামঘরের কাছে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছে পুলিশকে। খিদে পেয়েছিল অনেকেরই। হাতের কাছে রুটির গাড়ি দেখলে কে আর না খেয়ে থাকে? অনেক দর্শকও হাজির হয়েছিল। তারাও কিনেছে। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে গেছে ভিকি। তার বস্ বরং খুশিই হয়েছেন।' হাসল মুসা। তারপর বলল, 'তবে ভিকি এখন আর চাকরিটা করবে কিনা সেটাই কথা। তার মনে হচ্ছে রুটির ব্যবসা বড়ই সাদামাঠা, তার চেয়ে গোয়েন্দাগিরি অনেক ভাল, অনেক উত্তেজনা। ডিটেকটিভ হওয়ার নেশায় পেয়েছে তাকে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চায়। মিসেস মরিয়াটি কথা দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তিনি করবেন।'

'চমৎকার,' খুশি হলেন পরিচালক। 'শুরুতেই তোমরা বলেছ, ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। তারমানে কোন বই লেখা কিংবা ছবি করা চলবে না এ কাহিনী নিয়ে। তবে তোমরা যদি বলো অন্যভাবে করতে রাজি আছি আমি।

নামধাম সব বদলে দেব, কয়েকজন সম্মানিত ভদ্রলোকের স্বার্থে।'

'নিশ্চয়,' কিশোর বলল।

'দাওয়াতে গেলে আয়নাটা দেখতে পাব তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে লাইব্রেরিতে আর পাবেন না ওটা। সিনোরা পিলভারেজকেও দাওয়াত করা হয়েছে, রাফিনো থেকে আসছেন তিনি। আয়নাটা দুচোখে দেখতে পারেন না, ঘৃণা করেন। সে জন্যেই ওটাকে গুপ্তঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন মিসেস মরিয়াটি। কিছু বলেননি, কিন্তু আমার মনে হয় তিনিও আর ওটাকে পছন্দ করতে পারছেন না। ওই আয়নার জন্যে আরেকটু হলেই ডনকে হারাতে বসেছিলেন। তাছাড়া...'

থেমে গিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'তাছাড়া কি?' তাকে থামতে দিলেন না পরিচালক, 'তিনিও ভয় পান নাকি?'

'না, ঠিক তা নয়। গোয়েরা ওটার মধ্যে ভূত দেখেছে তো...বার বার কসম খেয়ে বলছে ও, ভুল দেখেনি। ওই আয়না ওর চেনা। ওটাকে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অথচ পেয়েছে সেদিন গুদামঘরে। তার মানে সত্যিই কিছু দেখেছে। বিশেষ করে ওই পরিবেশে...ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা, তাই না?' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। 'সত্যিই দেখেছে?'

'দেখেছে,' মুচকি হাসল কিশোর। 'আবছা অন্ধকারে এমন ভেঙচি কেটেছে ভূতটা, জান উড়ে গিয়েছিল বেচারার। লাঠি ফেলে দিয়ে পাগলের মত ছুট লাগিয়েছিল।'

'আর কেউ দেখল না কেন তাহলে? মুসা, রবিন কিংবা ডন?'

'দেখার পরিস্থিতিই ছিল না। সবাই উত্তেজিত, গোয়েরার দিকে চোখ। আয়নার দিকে চোখ একমাত্র তারই ছিল।'

'ভুল বললে,' বুঝে ফেলেছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আরও একজন দেখেছে।'

'হ্যাঁ, স্যার, দেখেছে। ভেঙচিটা তাকেই কাটতে হয়েছে কিনা।' নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল কিশোর।

হা হা করে হেসে উঠলেন পরিচালক।

-ঃশেষঃ-

বানরের মুখোশ

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৯৩

'আপনি বলতে চাইছেন আপনার আঠারো বছরের ছেলে ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে?' বিস্ময় চাপতে পারল না কিশোর। তার পাশে বসা রবিনও অবাক।

মিস্টার ডানিয়েল রেমনের দামী আসবাবে সাজানো অফিসে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। হলিউড থেকে কিছু দূরের ডিয়ারভিলে তাঁর পাথরের আড়ত রয়েছে। ডেস্কের ওপাশে উঁচু পিঠওয়ালা রকিং চেয়ারে নার্ভাস ভঙ্গিতে অল্প অল্প দুলছেন তিনি।

'হ্যাঁ,' কিশোরের কথার জবাব দিলেন রেমন। 'ঠিক তাই ঘটেছে। পঞ্চাশ হাজার ডলারও গেছে, সেই সাথে গেছে পিটার।'

'আমাদেরকে খুঁজে বের করে দিতে বলছেন?'

'বলছি!' টেবিলে কয়েকবার টোকা দিলেন তিনি। 'খুঁজে বের করে বাড়ি ফিরিয়ে আনবে। ওকে বলবে যা চায় তাই পাবে। আমি কথা দিচ্ছি।'

'বাপের সাথে ঝগড়া করেছে মনে হয়,' রবিন বলল।

ওপর দিকে হাত ছুঁড়ে দিলেন রেমন, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বিষণ্ন হয়ে গেল চেহারা, 'পিটার আর আমি, একে অন্যকে কোন দিনই বুঝতে পারিনি। বাপ-ছেলের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকার কথা তা-ও নেই। উদ্ভট সব আইডিয়া মাথায় খেলে তার, আমার মাথায় যেগুলো ঢোকেই না। তবে এইবার বাড়ি ফিরে এলে ওর যা ইচ্ছে করুক, আমি আর বাধা দেব না।'

থেমে গেলেন শিল্পপতি। গলা ধরে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। হঠাৎ করে এতটা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়বেন রেমন, ভাবতে পারেনি। তাঁকে সামলে নেয়ার সময় দিল ওরা।

তারপর রবিন বলল, 'সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা। এখন কিছু সূত্র দরকার। পিটার নিখোঁজ হয়েছে ক'দিন হলো?'

রুমালটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন রেমন। 'দু'মাস।'

'নিশ্চয় এতদিন অনেক খোঁজখবর করেছেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নিশ্চয়ই। কয়েক দিন অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম পিটার ফিরল না, ডিয়ারভিল পুলিশকে জানালাম।'

'কিছু হলো না?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না। কোন হদিসই করতে পারল না। ডিয়ারভিলের পুলিশ চীফ নিকলসন তো বলেই ফেলল, এমন অবাক কাণ্ড আর দেখেনিন। অথচ দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার বলে

নাম আছে তাঁর। অনেক জটিল কেসের কিনারা করেছেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পিটার রেমনের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে কিশোর। কয়েকটা সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মিস্টার রেমনের দিকে ফিরল, 'পুলিশ যা করতে পারেনি সেটা আমরা করতে পারব বিশ্বাস করেন আপনি?'

'না করলে বলতাম না। তোমাদের কথা আমি শুনেছি আগেও। পুলিশ কিছু করতে পারেনি এমন অনেক রহস্যেরই সমাধান করেছ। তাছাড়া দু'জন বিখ্যাত লোক সাংঘাতিক সার্টিফাই করেছে তোমাদের। একজন, চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার, আরেকজন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন।'

আসলে, মিস্টার সাইমনই ওদেরকে পাঠিয়েছেন এখানে। কাজটা তাঁকেই করে দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন রেমন। কিন্তু জরুরী একটা কাজে আটকে পড়ায় কেসটা নিতে পারেননি তিনি, তিন গোয়েন্দাকে রেফার করে দিয়েছেন।

রেমন বলছেন, 'তার পরে আরও একটা ব্যাপার, যেটাকে আমি সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি, তা হলো তোমরা প্রায় পিটারের সম বয়েসী। আমার সাথে ওর একটা জেনারেশন গ্যাপ রয়েছে, যেটা তোমাদের নেই। ওর মতিগতি ভাবসাব তোমরা যতটা বুঝতে পারবে, আমি পারব না। সহজেই ওর ইচ্ছেটা জেনে নিতে পারবে।'

'যদি ওকে খুঁজে পাওয়া যায়,' কিশোর বলল।

আরেক বার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেমন। 'পাবে তোমরা, আমি জানি। ক্রিস্টোফার আর সাইমন, কেউই ফালতু কথা বলার লোক নয়। কিছুতেই হাল ছাড়বে না। টাকা কোন সমস্যা নয়। যত দরকার খরচ করবে। দরকার হলে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে চলে যাও। আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই, ব্যস।'

'দেখি, কি করতে পারি,' রবিন বলল। 'কাজে নামতে হলে কিছু তথ্য দরকার আমাদের।'

'যেমন?'

'ছবি, চিঠি, ডায়েরী···আমাদের কাজের সুবিধে হয় এমন যা কিছু পাওয়া যায়···'

'বুঝতে পারছি কি চাইছ। বেশ, যতটা পারি সাহায্য করব। কাল হুইসপারউডে চলে এসো, আমার বাড়িতে। গ্র্যানিট রক পাহাড়ের ওপরে বাড়িটা। ছোট একটা জলপ্রপাত আছে, তার ধারে। হাইওয়ে ধরে এগোতে থাকবে পশ্চিমে, যতক্ষণ না একটা কাঁটাতারে ঘেরা বাড়ি চোখে পড়ে। ওদিকে ওরকম বেড়া একটাই আছে, চিনতে অসুবিধে হবে না। পিটারের জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখবে কিছু বের করতে পারো কিনা।'

'যাব,' বলে রেমনকে কথা দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। রবিনের পুরানো মডেলের ফোক্স ওয়াগেনে উঠল। ফিরে চলল রকি বীচে।

'কি বুঝলে?' একটা মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এসে রবিন জিজ্ঞেস করল।

'মিস্টার সাইমনের সাথে আলোচনা করতে হবে।'

'রাতে তো তাঁকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, বলেই দিয়েছেন ব্যস্ত থাকবেন। তবে কাল সকালে দেখা হতে পারে।'

পরদিন ভোরে উঠেই তাঁকে টেলিফোন করল রবিন। পাওয়া গেল। তাঁর

বাড়িতে গিয়ে নাস্তা করতে বললেন গোয়েন্দাদেরকে সাইমন।

নাস্তা খেতে খেতে ওদের মুখ থেকে সব কথা শুনলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ভাল রহস্যই পেয়েছ। দুশ্চিন্তা অযথা করছে না ডানিয়েল।'

'আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন?' অনুরোধ করল রবিন।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন সাইমন। মাথা নাড়লেন। 'না। সময় থাকলে কেসটা আমিই নিতাম। পারিনি বলেই তোমাদের পাঠিয়েছি। জাল পাসপোর্টের একটা কেসে জড়িয়ে পড়েছি আমি। আমেরিকান অনেক নাগরিকের পাসপোর্ট চুরি করে নিয়ে গিয়ে জাল করে সেগুলো অন্যের নামে চালিয়ে দিচ্ছে একটা দল, অনেক টাকার ব্যবসা করছে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না ব্যাটাদের। বছর দুই আগে ডিয়ারভিলের পোস্ট অফিসে একটা ডাকাতি হয়েছিল, তাতেও ওই দলের লোকই জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। খেয়েই বেরোতে হবে এখন আমাকে।'

এই সময় ঘরে ঢুকল মিস্টার সাইমনের ভিয়েতনামী হাউসকীপার, নিসান জাং কিম। কিশোরকে বলল, 'তোমার টেলিফোন।'

'কে? চাচী নাকি?'

'না, মুসা।'

টেলিফোন ধরল কিশোর। বলল, 'মুসা? কি খবর? দু'দিন ধরে তোমার কোন খোঁজই পাচ্ছি না?'

সে কথার জবাব না দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল, 'তোমাদের সাথে দেখা হওয়া দরকার। ইয়ার্ডে আসবে তো এখন?'

'না। আমরা এখানে জানলে কি করে?'

'মেরিচাচীকে ফোন করেছিলাম। তা কি খবর? কেসটেস পেয়েছ নাকি? আমাকে লাগবে?'

'আপাতত লাগবে না। এখুনি বেরোচ্ছি আমরা, ডিয়ারভিলে যাব। কাজ আছে।'

'ও।'

'তোমার কাজটা কি জরুরী নাকি?'

'না, অতটা না। রাতে বললেও চলবে। নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, সেটার ব্যাপারেই আলোচনা।'

'নতুন কোন গাড়ি নিশ্চয়?'

'না না, তবে ইঞ্জিনের সম্পর্ক আছে। যাই হোক, দেখা হলেই সব জানতে পারবে। আচ্ছা, রাখলাম।'

রিসিভার রেখে দিয়ে এসে রবিনকে সব বলল কিশোর।

শুনে হাসল রবিন। 'মোটর দিয়ে বানিয়েছে হয়তো কিছু। ইদানীং তো আবিষ্কারের নেশায় পেয়েছে জনাব মুসা আমানকে। নিত্য নতুন হবি।'

রবিনের গাড়িতে করেই ডিয়ারভিলে চলল ওরা। হলিউড ছাড়িয়ে এসে পশ্চিমে মোড় নিল। দুই ঘণ্টা সমতল পথ ধরে চলার পর ঢুকল পাহাড়ী অঞ্চলে। দু'পাশে পাহাড়ের সারি আর বড় বড় খাত। পাহাড় কেটে মানুষের তৈরি একটা গিরিপথের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এক জায়গায় পথটা। যে সে পাহাড় নয়, পাথরের কঠিন

পাহাড় কাটা হয়েছে।

ছোট একটা ম্যাপ কোলের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে কিশোর। আরেকটু এগোনোর পর মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'ওটাই বোধহয় গ্র্যানিট রক। ওই বনটা হুইসপারউড। ওই যে, কাঁটাতারের বেড়া।'

উঁচু উঁচু খুঁটিতে ঘন করে কাঁটাতার লাগিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে।

'বাপরে বাপ,' রবিন বলল, 'কত্তবড় এলাকা নিয়ে বাড়ি। গেট কই?...ও, ওই যে।'

একটা পাইনের জটলা পেরিয়ে এসে লোহার বিশাল গেটের কাছে গাড়ি রাখল সে। একপাশে রয়েছে তামার ঘণ্টা, বাজিয়ে ভেতরের লোক ডাকার জন্যে।

নেমে গিয়ে মস্ত হাতলটা চাপাচাপি করে পাল্লা খোলার চেষ্টা চালাল রবিন। নড়াতেই পারল না। 'তালা দেয়া,' বলল সে। 'লোকজন কোথায়? দারোয়ান নেই, কিছু নেই, পোড়ো বাড়ি নাকি? এক্কেবারে দুর্গ বানিয়ে রেখেছে।'

বেল বাজাল কিশোর। বিকট শব্দ ছড়িয়ে পড়ল গাছপালার ভেতরে, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বিড়বিড় করল সে, 'মানুষজন বোধহয় পছন্দ করে না ওরা।'

'আমরা তো আর এমনি এমনি আসিনি, আসতে বলা হয়েছে আমাদের। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব এভাবে?'

'তো কি করতে চাও?'

'চলো, গেট বেয়ে উঠে ঢুকে পড়ি।'

কিশোরও রাজি। লোহার গেট বেয়ে উঠতে শুরু করল। উঠতে অনেক কষ্ট হলো। তবে পারল। ওপরে উঠে লাফিয়ে নামল ওপাশে।

রবিন নামার সময় চড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। 'এহ্‌হে,' গুঙিয়ে উঠল সে, 'গেল আমার নতুন জ্যাকেটটা।' লাফ দেয়ার সময় লোহার শিকের বল্লমের মত চোখা করে রাখা মাথায় লেগে ছিঁড়েছে।

'কি আর করবে। সেলাই করে নিলেই হবে। এসো।'

বাড়ির দিকে এগোল দু'জনে। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে যেন আকাশের দিকে মাথা তুলে রেখেছে দুর্গের মত দেখতে বিরাট প্রাসাদটা। বাড়ির সদর দরজায়ও কলিং বেলের বোতাম দেখা গেল। একটানা একটা হিসহিস শব্দ কানে আসছে। কিসের শব্দ, কোথা থেকে আসছে। বুঝতে পারল না ওরা।

'দেখা যাক, এখন কি হয়?' বলতে বলতে বোতাম টিপে ধরল কিশোর।

এবার আর অপেক্ষা করতে হলো না, একবার বাজাতেই দরজা খুলে দিল মিস্টার রেমনের খানসামা। 'আমার নাম জনি।' একঘেয়ে স্বরে কথা বলে লোকটা, 'তোমাদের জন্যে বসে আছেন মিস্টার রেমন।...আরে, তোমার জ্যাকেট ছিঁড়ে ফেলেছ দেখছি। দাও দাও, সেলাই করে দেব। খুব ভাল রিপু করতে পারি আমি। আমার জন্যেই তোমাদের কষ্টটা হলো। বেল শুনতে পাইনি। সরি।'

প্রায় জোর করেই রবিনের জ্যাকেটটা খুলে নিল সে। দু'জনকে এগিয়ে দিয়ে গেল রেমনের ঘরে।

গেটে কি ঘটেছে শুনে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলেন তিনি। বললেন, তিনিও ঘণ্টা শুনতে পাননি। 'অবশ্য তোমাদেরকে এত সকালে আশাও করিনি।

আর ঘণ্টাটা কত দূরে দেখেছই তো। দরজা-জানালা বন্ধ থাকলে...'

'থাক থাক, আমরা কিছু মনে করিনি,' ভদ্রতার খাতিরে বলল কিশোর। 'কাজের কথা বলি। কয়েকটা কথা জানা দরকার। আপনার ছেলে দেখতে কেমন?'

ম্যানটেলপিস থেকে একটা ছবি তুলে আনলেন রেমন। 'পিটার নিখোঁজ হওয়ার কয়েক দিন আগে তোলা হয়েছিল এটা।'

ছবিটা ভাল করে দেখল কিশোর আর রবিন। ছিপছিপে এক তরুণ, লম্বা এলোমেলো চুল। চোখে ধাতব চশমা, গোল রিম, বোকা বোকা করে তুলেছে চেহারাটাকে।

'কোন মুদ্রাদোষ আছে?' জানতে চাইল কিশোর, 'কিংবা এমন কোন আচরণ করে যা দেখে তাকে চেনা যাবে?'

'কথা বলার সময় ঘন ঘন মাথা ঝাঁকায়।'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। 'নরম স্বভাবের মানুষ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। কবিতা লিখত।'

'ঝগড়াটা বাধালেন কি করে?'

নাক টানলেন রেমন। 'কয়েকটা হ্যামস্টার নিয়ে। ইঁদুরের মত প্রাণীগুলোকে দেখেছ নিশ্চয়। খাঁচায় ভরে নিয়ে এল। তখন কিছু বললাম না। ওগুলো নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করতে লাগল, শেষে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে জনিকে বললাম ওগুলো ফেলে দিয়ে আসতে।'

'কি কবিতা লিখত, দেখাতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কেবিনেট খুলে একটা ম্যাগাজিন বের করে আনলেন রেমন। 'এটাতে ছাপা হয়েছে। আটান্ন পৃষ্ঠায়। দেখো পড়ে, কিছু বোঝো কিনা। আমার মাথায় কিচ্ছু ঢোকেনি।'

ম্যাগাজিনটা খুলল কিশোর। সে আর রবিন দু'জনেই পড়তে শুরু করল।

কিশোব বলল, 'ভালই তো। প্রতিভা আছে আপনার ছেলের।'

'কিন্তু এই কবিতা পড়ে বোঝা যাবে না সে কোথায় গিয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'ওর ঘরে খোঁজা দরকার।'

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে ওপরতলায় নিয়ে এলেন রেমন। বড় হলঘরের শেষ প্রান্তে আরেকটা ঘর, পিটারের বেডরুম। ওদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো খুঁজে, কিছু বের করতে পারো কিনা।' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আলমারি আর কেবিনেটের ভেতর কিছু পাওয়া গেল না। কবিতার বই অনেক আছে, সেগুলোতেও কিছু মিলল নাম।

হতাশ হয়ে রবিন বলল, 'কিছু তো নেই।'

'টেবিলের ড্রয়ারে থাকতে পারে,' আশা করল কিশোর।

ওপর থেকে নিচে সব ক'টা ড্রয়ার আতিপাতি করে খোঁজা হলো।

'কিচ্ছু নেই,' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'কোন ডায়েরী নেই, চিঠি নেই...কিচ্ছু না।'

রাগ করে ঠেলে নিচের ড্রয়ারটা ঢুকিয়ে দিতে যাবে, খপ করে তার কব্জি চেপে ধরল কিশোর, 'রাখো রাখো, ওটা কি?' রবিনের হাত সরিয়ে দিয়ে নিজেই টেনে পুরো খুলল আবার আধখোলা ড্রয়ারটা। দলামোচড়া করে একটা কাগজ ফেলে

রাখা হয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে খুলে হাত দিয়ে চেপে সমান করল সে। ইংরেজিতে কয়েকটা ছত্র লেখা রয়েছে, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

আমার জীবনটা একটা দেয়ালে ঘেরা নগরী
পালাতেই হবে আমাকে এখান থেকে;
যতক্ষণ আমি আমি থেকে যাব,
জেলখানাই রয়ে যাবে এটা আমার।

কাগজটা ওল্টাল কিশোর। উল্টোপিঠে আরও দু'লাইন লেখাঃ

উপায় একটা অবশ্যই আছে,
কিন্তু সেটা কি আমি জানি না।

রবিন বলল, 'এটা কোন সূত্র হতে পারে। প্রথম চারটে লাইন পড়ে তো মনে হচ্ছে, এখানে সুখ ছিল না পিটারের।'

'এবং তাহলে শেষ দুটো লাইনের মানে, সে এখান থেকে বেরোনোর একটা পথ পেয়েছে।'

ঘরে ঢুকলেন রেমন। কাগজের টুকরোটা তাঁকে দেখিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা পিটারের হাতের লেখা?'

'হ্যাঁ।'

'নিতে পারি? এটা কোন সাংকেতিক মেসেজ হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই। ওকে খুঁজে বের করার জন্যে যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। প্রয়োজন মনে করলে কেসের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত হুইসপারউডে থেকে যেতে পারো। পুরানো আস্তাবলটার ওপরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। ঘোড়া আর এখন নেই, তাই ওটাকেই গেস্টহাউস করা হয়েছে।'

'এখন থাকা লাগবে না,' কিশোর বলল। 'পরে দেখা যাবে।'

আর কিছু দেখার নেই। বেরিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। জ্যাকেটটা রিপু করা হয়ে গেছে। সেটা রবিনকে দিয়ে বলল, 'দেখো, কেমন হলো।'

'আরি, দারুণ তো,' রবিন বলল। 'ছিঁড়েছিল যে বোঝাই যায় না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

ইয়ার্ডে ফিরল দুই গোয়েন্দা। ওঅর্কশপে ঢুকে গরম লাগায় জ্যাকেটটা খুলে দেয়ালের হুকে ঝোলানোর সময় পকেটে চাপ লাগতেই ভেতরে মচমচ করে উঠল কি যেন। হাত ঢোকাল রবিন। বের করে আনল একটা দোমড়ানো কাগজের টুকরো, নোটবুকের ছেঁড়া পাতা।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'লেখা। বেশি তাড়াহুড়ো করে লিখেছে।'

'কি লিখেছে?'

পড়ল রবিন, 'পিটারকে খুঁজো না। ওর জীবনটা ধ্বংস করে দেবে তাহলে।'

দুই

'এ তো হুঁশিয়ারি!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'কে লিখল বলো তো?'

'জনি হতে পারে। জ্যাকেটটা ফেরত দেয়ার আগে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'তাহলে জনির সাথে কথা বলা দরকার। কেন আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরাতে চাইছে জিজ্ঞেস করব।'

'জিজ্ঞেস করলেই বলবে নাকি?' পেছন থেকে বলে উঠলেন রাশেদ পাশা। ওঅর্কশপের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটা কালিঝুলি মাখা ন্যাকড়া, কিছু পরিষ্কার করছিলেন বোধহয়। 'বাইরে থেকে তোদের কথাবার্তা সবই শুনলাম। কিছু না জেনে খানসামাকে দোষ দেয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

'তাকে দোষ দিচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'সন্দেহ করছি। যে ঘটনাটা ঘটেছে তাতে সবার আগে তার ওপরই সন্দেহ পড়ে।'

'কেসটা কি?'

'মানুষ হারিয়েছে,' জবাব দিল রবিন। 'ডিয়ার হিলে বাস করত পিটার রেমন। রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

'ডিয়ার হিল?' নাক কুঁচকালেন রাশেদ পাশা। 'সে তো একশো মাইল। এত দূরে যাওয়া আসা করে তদন্ত করবে কি করে?'

'যাওয়া আসার প্রয়োজন হবে না। হুইসপারউডে মিস্টার রেমনের বাড়িতে আস্তাবলের ওপরে একটা ঘর আছে। আমাদেরকে সেখানে থাকতে বলেছেন।'

মস্ত গোঁফের এক কোণ ধরে টানলেন রাশেদ পাশা। 'শেষমেষ আস্তাবলের ওপর? আরও ভাল একটা জায়গার ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পারতেন মিস্টার রেমন।'

'আর হয়তো নেই,' কিশোর বলল। 'আগে আস্তাবল ছিল, এখন ঘোড়া থাকে না। গেস্টহাউস করেছে যখন ভালই হবে।'

'হুঁ,' বলে আরেকবার গোঁফের কোণ ধরে টান দিলেন রাশেদ পাশা। 'মানুষ হারানোর কেস, কিডন্যাপিংও হতে পারে। তার মানে বড় রকমের বিপদ। সাবধানে থাকবি।'

রাশেদ পাশা চলে গেলেন।

কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। ঠিক করল, রেমনের বাড়িতে থেকেই কেসের তদন্ত করবে। আগামী দিন চলে যাবে হুইসপারউডে।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই ইয়ার্ডে চলে এল রবিন। কিশোরের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি, সে টেবিলেই রয়েছে। এই সময় রাস্তার দিক থেকে কয়েকবার ফট ফট শব্দ শোনা গেল, অনেকটা পিস্তলের গুলি ফোটার আওয়াজের মত।

মেরিচাচী বলে উঠলেন, 'ওই যে, মুসা এল। ওর জেলপির মিসফায়ার।'

আরেকটা গাড়ি কিনেছে মুসা, অবশ্যই পুরানো, আগেরটার চেয়ে বেশি ছাড়া কম না। প্রায় বাতিল অবস্থায় কিনেছিল পানির দামে, নিজেই মেরামত-টেরামত করে সারিয়ে নিয়েছে। ওটার আওয়াজেই পরিচিতজনেরা টের পেয়ে যায়, মুসা আমান যাচ্ছে।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন, আন্টি?' বলতে বলতেই চোখ পড়ল টেবিলের দিকে। হাসিতে বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে সাদা দাঁত। কোমরের বেল্টে হাত বোলাল।

'ভাল,' জবাব দিলেন মেরিচাচী। 'এসো, বসে পড়ো। নাস্তা নিশ্চয় করোনি?'

'করলেই বা কি?' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'এক সকালে পাঁচবার নাস্তা করলেও মুসা আমানের কিছু হবে না। তাছাড়া এত সুন্দর প্যানকেক দেখেছে, জিভের পানি কি আর আটকাতে পারে?'

'না পারুক,' মুসার পক্ষ নিলেন চাচী। 'তোমাদের মত নাকি? কিছু খেতে পারো না। এই বয়েসে না খেলে শরীর টেকে নাকি? মুসা, বসো।'

মুচকি হাসল শুধু কিশোর। কিছু বলল না।

বসে পড়ল মুসা। প্লেটটেটের ধার ধারল না, প্যানকেকের ডিশটাই টেনে নিল। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে একের পর এক কেক উধাও হয়ে যেতে লাগল ডিশ থেকে। খালি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। একটাও আর রইল না। ঢক ঢক করে দুই গেলাস দুধ খেয়ে ঘাঁউ করে ঢেকুর তুলল। তারপর আয়েশ করে হেলান দিল চেয়ারে। 'কেকগুলো খুব ভাল হয়েছে, আন্টি। থ্যাংক ইউ।'

হেসে উঠে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল মুসাকে, 'কাল রাতে না কথা বলতে চেয়েছিলে?'

'আটকে গিয়েছিলাম।'

'কি নিয়ে এত ব্যস্ততা তোমার?'

নাক চুলকাল মুসা। 'গলফ বল স্ক্যাভিনজিং কথাটা শুনেছ কখনও?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কি ওটা? নতুন কোন হবি তোমার?'

'না। দ্রুত বড়লোক হওয়ার একটা উপায়। গলফ কোর্সগুলোতে প্রচুর জলা, ডোবা, লেক আছে। প্রায়ই গিয়ে বল পড়ে পানিতে। স্ক্যাভিনজাররা সেগুলো তুলে বিক্রি করে দেয়। আমিও সেই কাজ শুরু করেছি। চাইলে তোমরাও যোগ দিতে পারো।'

'শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, হাতের কাজ শেষ হোক, যাব তোমার সাথে।'

'আজ বিকেলেই ডিয়ারহিলে যাচ্ছি আমরা,' রবিন বলল।

'সে তো অনেক দেরি,' মুসা বলল। 'এখন তো কোন কাজ নেই?'

চট করে একবার দেখে নিল কিশোর, মেরিচাচী কাছাকাছি আছেন কিনা। নেই। এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো সিংকে ভিজিয়ে রেখে বেরিয়ে গেছেন, নিশ্চয় অন্য কোন কাজে। ওদের কাজ নেই একথা শুনলেই ইয়ার্ডের কাজে লাগিয়ে দেবেন। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'না, নেই।'

'গুড। চলো তাহলে আমার সাথে। আমারও সুবিধে হবে, তোমাদেরও।'

ইয়ার্ডে খেটে মরার চেয়ে মুসার সঙ্গে যাওয়াটা অনেক আকর্ষণীয় মনে হলো কিশোর আর রবিনের কাছে। বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। মুসার জেলপিতে চড়ল।

বুঝিয়ে বলল মুসা, কি করে বল তোলা হয়। 'অনেক অ্যামেচার ডাইভার আর ফ্রগম্যান ডুব দিয়ে নিচ থেকে বল তোলার চেষ্টা করে। তবে তাতে অনেক

অসুবিধে। প্রফেশনালরা তোলে অন্য ভাবে, পানিতে নামেই না তারা। সাকশন পাইপ আর আণ্ডারওয়াটার ভ্যাকিউয়াম ক্লিনারের সাহায্যে তোলে।

'প্রতি বছর প্রায় ছয় কোটি বল তোলা হয় পানি থেকে। বিক্রি হয় পনেরো কোটি ডলারে।'

শিস দিল কিশোর। 'এত!'

'কয়েকটা গলফ কোর্স কেনা যায় এই টাকায়,' রবিন বলল।

'তা তো যায়ই,' মুসা বলল। 'যাই হোক, পনেরো কোটির একটা ভাগ আমিও নিতে চাই। রকি বীচের গলফ কোর্সগুলো থেকে যদি একচেটিয়া তুলে ফেলতে পারি, তাহলেও অনেক টাকা। তোলার লোক এখানেও আছে, তবে আমার সাথে পারবে না।'

'কেন?'

'চলো, গেলেই দেখতে পাবে।'

নিজেদের বাড়িতে ঢুকে গ্যারেজের কাছে এনে গাড়ি রাখল মুসা। নামল তিনজনে। ছোট একটা পিকআপ ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পেছন দিকে রবিন আর কিশোরকে নিয়ে এল সে। বড় একটা বাক্সমত জিনিস পড়ে আছে গাড়িতে, পেট্রল চালিত একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত। বাক্সের এক পাশে অসংখ্য গোল গোল ছিদ্র, এক কোণে লাগানো রয়েছে একটা হোস পাইপ।

'এইটাই আমার বল তোলার যন্ত্র,' মুসা বলল। 'পুরানো ইঞ্জিন কিনে মেরামত করে নিয়েছি। বাক্সটার নকশাও আমি করেছি। হপ্তাখানেক লেগেছে এটা বানাতে। পিকআপটা কয়েক দিনের জন্যে চেয়ে নিয়েছি বাবার কাছ থেকে।'

কিম্ভুত যন্ত্রটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে তাকাতে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কাজ করবে তো এটা?'

'করবে না মানে? চলো না, নিজের চোখেই দেখবে।'

মুসাদের বাড়ির সব চেয়ে কাছে যে গলফ কোর্সটা আছে সেটাতে চলল তিনজনে, পিকআপ নিয়ে। যেতে যেতে মুসা বলল, তার সঙ্গে থাকলে, তাকে বল তোলায় সাহায্য করলে লাভের টাকার ভাগ দিতে রাজি আছে কিশোর আর রবিনকে।

গলফ কোর্সে ঢুকে তিন নম্বর পুকুরটার পাড়ে এনে গাড়ি রাখল মুসা। বাক্সটা তুলে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলল সে, সাহায্য করল অন্য দু'জন। হোস পাইপের সঙ্গে যুক্তই রয়েছে বাক্স আর ইঞ্জিন। বাক্সটা একধরনের ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার, জানাল মুসা। ইঞ্জিন চালু করে দিল।

বাতাসের টানে বাক্সের ভেতরে ঢুকে পড়ল পুকুরের তলার কাদা-পানি, একপাশের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে আরেক পাশের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আবার পুকুরেই পড়তে থাকল। পানির নিচ থেকেও পাইপ বেয়ে ভেসে এল শক্ত জিনিসের খট খট শব্দ।

'ওগুলো গলফ বল!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'ভেতরে ঢুকে আর বেরোতে পারছে না, বাড়ি মারছে বাক্সের গায়ে, তারই শব্দ। ধনী আমরা হয়েই যাব!'

'সত্যি,' রবিন বলল, 'একটা মেশিনই বানিয়েছ বটে। তুমি যে এত বড় বিজ্ঞানী জানতাম না।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পুকুরের তলা ঝাড়ু দিয়ে বাক্সটা টেনে তোলা হলো। বেজায় ভারি। ডাঙায় তুলে বাক্সের একটা দরজা খুলল মুসা। একসঙ্গে ভেতরে উঁকি দিল তিনজনে। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। একটা শব্দই বেরোল কেবল মুসার মুখ থেকে, 'খাইছে!'

রবিন আর কিশোরও অবাক। সত্যিই কাজ করেছে মুসার আবিষ্কৃত মেশিন। কয়েক শো বল ঠাসাঠাসি হয়ে আছে বাক্সের ভেতরে। পানির তলায় থেকে থেকে শ্যাওলা পড়ে গেছে বলগুলোতে, কাদায় মাখামাখি, নষ্ট হয়নি। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করল মুসা। রবিন আর কিশোরের মুখেও হাসি।

নিয়ম মাফিক অর্ধেক বল গলফ কোর্সের মালিককে দিয়ে বাকি বলগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

একটা ট্র্যাফিক লাইট পোস্ট পেরোনোর সময় হঠাৎ শোরগোল শুরু হলো পেছনে। লোকে চেঁচামেচি করতে লাগল, হর্ন বাজাতে লাগল গাড়িগুলো। বাঁশি বাজাল ট্র্যাফিক পুলিশ। আয়নার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'ব্যাপারটা কি? আমাদেরকেই ডাকছে মনে হয়। লাল বাতি তো অমান্য করিনি...'

রবিনের চিৎকারে তার কথায় বাধা পড়ল, 'সর্বনাশ! পিকআপের টেলগেট লাগাতে ভুলে গেছ! সমস্ত রাস্তা বলে ছড়াছড়ি!'

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। পেছনে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এক এলাহি কাণ্ড শুরু হয়েছে। বলে পা দিয়ে উল্টে পড়ছে পথচারী। কেউ কেউ আবার একা পড়ছে না, গায়ের কাছাকাছি থাকা অন্যকে নিয়ে পড়ছে। চাকার নিচে বল পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে গাড়ি। গোলমাল থামাতে চতুর্দিকে ছোটাছুটি করছে ট্র্যাফিক পুলিশ।

'আল্লাহরে!' গাড়ি সাইড করে রাখতে রাখতে ককিয়ে উঠল মুসা, 'ধনী হওয়ার বারোটা বাজল আমার...'

'ধনী হওয়া তো পরের কথা,' কিশোর বলল, 'আগে পুলিশ সামলাও। যে পরিমাণ খেপেছে...'

'কোমরে আজ দড়ি পড়বে আমাদের,' বিড়বিড় করল রবিন।

জানালার কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার, 'বেরোও! জলদি রাস্তা থেকে তোলো ওগুলো। নামো তিনজনে।'

বোকা হয়ে গেছে যেন তিন গোয়েন্দা। চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে এসে বল কুড়াতে শুরু করল। পথের পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল কয়েকটা ছেলে, ওরাও এসে ওদেরকে সাহায্য করল। বলগুলো আবার তোলা হলো পিকআপের পিছনে। টেলগেট ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা কয়েকবার করে টেনেটুনে দেখল মুসা। আর বিপদে পড়তে চায় না। ফিরে এল ড্রাইভিং সীটে।

'ভাগ্যিস টিকেট ধরিয়ে দেয়নি,' বলল সে।

'কেউ জখম হয়নি, তাই রক্ষে,' কিশোর বলল। 'নইলে ঠিকই ধরাত।'

মুসাদের বাড়িতে এসে দেখা গেল ওদের স্কুলের দু'জন বন্ধু মুসার জন্যে বসে আছে। একজন বিল রোজার, আরেকজন টম মার্টিন। বিল খুব বুদ্ধিমান, প্রচুর পড়াশোনা ওর। আর টম রকি বীচেরই একজন কন্ট্রাকটরের ছেলে, প্রচুর টাকার

মালিক ওর বাবা। মুসার মতই খেলাধুলা ভালবাসে, পড়ালেখায়ও মন্দ না।

মুসারা কোথায় গিয়েছিল, পথে কি হয়েছিল, রবিনের মুখে শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল দু'জনে। বিকেলে মুসা আবার বল স্ক্যাভিনজিঙে যাবে শুনলে ওরাও ধরল, সঙ্গে যাবে। রাজি হয়ে গেল মুসা। 'দু'জন সহকারী পেলে ভালই হয়।

রবিনের গাড়ি নিয়ে হুইসপারউডে রওনা হয়ে গেল সে আর কিশোর। পথে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া সেরে নিল।

মিস্টার রেমনের বাড়িতে পৌঁছে ঘন্টা বাজালে এবার ঠিকমতই সাড়া দিল জনি। গেস্টহাউস দেখিয়ে দিলেন রেমন। ভারি সেই হিসহিসে শব্দ, প্রথমবার এসে যেটা শুনেছিল, এখনও একটানা কানে আসছে।

'জলপ্রপাতের শব্দ,' রেমন বললেন। 'সর্বক্ষণ ওরকম ফিসফাস করে। সেই জন্যেই জায়গাটার নাম হয়েছে হুইসপার উড।'

ও, এই ব্যাপার! যাক, রহস্যটার সমাধান হলো।

'আপনার ছেলে কি এই গেস্টহাউসে ঢুকত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঢুকত। মাঝেসাঝে। জনিও বেশ কিছুদিন থেকেছে এখানে। মূল বাড়িটা মেরামতের সময়। ওকে পছন্দ করত পিটার, তাই তার কাছে আসত। নিজের ঘর ঠিক হয়েছে, সেখানে আবার ফিরে গেছে জনি।'

রবিনের জ্যাকেটের পকেটে পাওয়া নোটটার কথা রেমনকে জানিয়ে কিশোর বলল, 'এ ব্যাপারে আমরা জনির সাথে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়! ও কিছু করে থাকলে আমি ওকে ছাড়ব না।'

রেমনের সঙ্গে প্রাসাদে এল আবার দুই গোয়েন্দা। খানসামার মুখোমুখি হলো।

নোটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন। পড়ে মুখ সাদা হয়ে গেল জনির। চোখ বড় বড়। কাঁপা কাঁপা হয়ে গেল নিঃশ্বাস। কাগজটা ভাঁজ করে আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'কোথায় পেলে?'

'আমার জ্যাকেটের পকেটে। কাল রিপু করে আপনি ফিরিয়ে দেয়ার পর।'

ভ্রূকুটি করল জনি। 'আমি ঢোকাইনি।'

'প্রমাণ করতে পারবে সেটা?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন রেমন।

'পারব, স্যার। এই যে দেখুন।' পকেট থেকে একটা বাজারের লিস্ট বের করে দিল জনি। 'এটা আমার লেখা, আপনি জানেন। নোটটার সাথে হাতের লেখাটা মিলিয়ে দেখুন।'

দুটো কাগজ পাশাপাশি রাখল রবিন। কিশোরও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। একটার সঙ্গে আরেকটার লেখা মেলে না।

'মনে হচ্ছে অন্য কারও লেখা,' বিড়বিড় করল রবিন।

'সেই লোকটা কে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'মিস্টার রেমন, আর কে কে থাকে এই বাড়িতে?'

'মালী, হেনরি,' জবাব দিলেন রেমন। 'ওর স্ত্রীও থাকে, রান্নাবান্নাটা সে-ই করে। আমার স্ত্রীর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে, পুব পাশের একটা ঘরে থাকে। প্রায় বেরোয়ই না ওখান থেকে। সব সময় ওর কাছে কাছে থাকে একজন নার্স, মিস ডোরিয়া গিলবার্টসন। ডোরিয়ার সাথে কথা বলতে পারো তোমরা, তবে পিটারের

মায়ের কাছে যেও না। বিরক্ত করো না ওকে।'

কিশোর বলল, 'ঠিক আছে। কর্মচারীদের সবার সাথেই কথা বলব।'

'বেশ। কাল সকাল থেকেই তদন্ত শুরু করে দাও। ছেলেটাকে কিডন্যাপই করল কিনা কে জানে। হয়তো কোথাও বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

গেস্ট হাউসে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

'কোনই সূত্র নেই আমাদের হাতে,' রবিন বলল। 'কি নিয়ে কাজ আরম্ভ করব?'

'ভাবতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'ঠিকমত ভাবতে পারলে কিছু না কিছু বেরিয়ে পড়বেই।'

'এই শোনো, জায়গাটা ভাল লাগছে না আমার। হুইসপারউড জায়গাটাই ভূতুড়ে...'

'মুসার মত তুমিও শুরু করলে দেখি।'

'না, সত্যি, কেন যেন গা ছমছম করে। সারাক্ষণ কারা যেন কথা বলে ফিসফাস করে...'

যেন রবিনের কথার সমর্থনেই একঝলক জোরাল হাওয়া বিলাপ করে গেল পাইনের ফাঁকফোকর দিয়ে। চাঁদের মুখে মেঘ জমতে লাগল। বনের ভেতর ছায়ার খেলা। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে রয়েছে গ্র্যানিটের টিলা, মনে হচ্ছে যেন অতিকায় মানুষেরা কোন রহস্যময় উদ্দেশ্যে ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

রবিন কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কিছুক্ষণ পর সে-ও এসে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ চমকে জেগে গেল দু'জনেই! ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে জানালার কাচ।

তিন

'কিশোর! কি হলো?' লাইট সুইচটা খুঁজতে শুরু করল রবিন।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমেই জানালার কাছে দৌড় দিল কিশোর। চাঁদের ওপর থেকে মেঘ সরে গেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে বনতলে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কই, কাউকে তো দেখছি না। ঢিল মেরেই লুকিয়ে পড়েছে।'

বিছানার পাশের বাতিটা জ্বেলে দিল রবিন। সেই আলোয় দু'জনেই খুঁজতে লাগল কাচ ভাঙার কারণ।

পাথর নয়, বিছানার নিচ থেকে একটা গলফ বল বের করে আনল রবিন। কিশোরকে দেখাল।

'রসিকতা করল নাকি?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'কিন্তু এত রাতে মজা করতে আসবে কে?'

'সেই লোক,' একটা ভুরু উঁচু করে বলল রবিন, 'যার কাছে প্রচুর গলফ বল আছে, এবং যে সাধারণত আমাদের সাথে মজা করে।'

'মুসা? চলো, দেখি।' কিশোরের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল কাজটা মুসা করেছে বলে বিশ্বাস করে না সে।

দ্রুত কাপড় পরে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল দু'জনে। বাইরে বেরিয়ে এল। গেস্টহাউসের চারপাশে একবার চক্কর দিল রবিন। কিশোর খুঁজতে লাগল গাছপালার ছায়া আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে যেখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে মানুষ।

কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এল। রবিন জানাল সে-ও কাউকে দেখেনি। আর কিছু করার নেই। আবার ঘরে ফিরে এল দু'জনে। শুয়ে পড়ল যার যার বিছানায়। বাকি রাতটা নিরাপদেই কাটল।

পরদিন ভোরে ওরা ঘুমিয়েই আছে এই সময় থাবা পড়ল দরজায়। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে খুলে দিল কিশোর। একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

'এসো,' দরজার কাছ থেকে সরে ঢোকার জায়গা করে দিল কিশোর। 'তোমার অপেক্ষাতেই আছি আমরা।'

'কেন?'

'কাল রাতে বনের মধ্যে কি করছিলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মানে?'

'মানে এটা,' গলফ বলটা দেখাল রবিন, 'জানালার কাচ ভেঙে ঘরে ঢুকেছে।'

'ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে?' ভুরু নাচিয়ে বলল মুসা। 'কাল রাতে এদিকে আসিইনি আমি। রকি বীচে ছিলাম, নিজের ঘরে।'

'তাহলে এত সকালে এখানে কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'এসেছি। ডিয়ারভিলেও গলফ বল স্ক্যাভিনজিঙের একটা কন্ট্রাক্ট করেছি। ভাবলাম, ওখানে যাওয়ার আগে তোমাদের সাথে দেখাই করে যাই।'

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'রবিনের মনে হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি তুমি এটা মেরেছ।'

'কোন কারণই নেই মারার।' মুসা বলল। 'দেখি, বলটা।' হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বলল, 'কনডর ব্র্যাণ্ড।'

'কোত্থেকে জোগাড় করা হয়েছে জানার উপায় আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কনডর খুব জনপ্রিয়,' বলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'অনেকেই ব্যবহার করে। বিক্রিও হয় প্রচুর। সে জন্যেই কোত্থেকে এসেছে জানা খুব কঠিন। তবু, যারা বিক্রি করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, গতকাল একটা মাত্র বল কারও কাছে বিক্রি করেছে কিনা।'

'কখন জানতে পারব?'

'কাজ শেষ করে বিকেলে ফেরার পথে জানিয়ে যাব।'

বেরিয়ে গেল মুসা। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে প্রাসাদে চলল কিশোর আর রবিন, নাস্তা খাওয়ার জন্যে। রাতে কি ঘটেছিল রেমনকে জানাল ওরা।

খবরটা শুনে অবাক হলেন রেমন। বললেন, 'জনির ওপর থেকে সন্দেহ যায়নি আমার।'

'কেন?'

'পিটারের সাথে খাতির ছিল ওর, অনেক সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে।'

'আপনার চেয়ে বেশি খাতির?'

'অনেক বেশি। আমি এটা ওটা করতে বললাম তো, সেজন্যে আমার কাছে ঘেঁষত না পিটার। আমি বলতাম ফুটবল খেলতে, ও গিয়ে লিখতে বসত কবিতা। মোট কথা আমি যেটা পছন্দ করতাম না, আমার ছেলের ছিল সেটাই পছন্দ। আর সেগুলো জনিরও পছন্দ। আমার বিশ্বাস, পিটারের মন জয় করার জন্যেই এরকম আচরণ করত সে। তারপর ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে ফেলেছে।'

খানসামাকে দোষারোপ করার আগে আরও ভালমত খোঁজ নেয়া উচিত, কিশোর বলল। সে আর রবিন মিলে আলোচনা করে ঠিক করল বাড়ির অন্যদেরও হাতের লেখা জোগাড় করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল রবিন, মালীর বৌয়ের সাথে কথা বলার জন্যে। কায়দা করে মহিলাকে দিয়ে কিছু একটা লিখিয়ে আনবে।

কিশোর গেল বাগানে। মালীর সঙ্গে কথা বলতে। ফুলের আলোচনা করতে করতে লেখা জোগাড় করবে কোনভাবে। মিস্টার রেমন গেলেন স্ত্রীর ঘরে, নার্সের লেখা আনতে।

একটা বিশেষ খাবার কি করে তৈরি করতে হয়, বাবুর্চির কাছ থেকে লিখিয়ে আনল রবিন। কিশোর মালীকে দিয়ে লেখাল, গোলাপ ভাল জন্মাতে হলে কি ভাবে চাষ করতে হয়। মিসেস রেমনের জন্যে কিছু জরুরী জিনিস আনা লাগবে, তালিকাটা ডোরিয়াকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এলেন মিস্টার রেমন। সবগুলোই মিলিয়ে দেখা হলো, কোনটাই মিলল না নোটটার সঙ্গে।

হতাশ দেখাল কিশোরকে। 'নাহ্, লাভ হলো না। লেখাকে প্রাধান্য দিলে সবাইকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়।'

'আমি ওকে এখনও সন্দেহ করি,' রেমন বললেন।

'অবশ্য,' রবিন বলল, 'জনির সহকারী থাকতে পারে।'

'দাঁড়াও, ডেকে আনি,' একটা বোতাম টিপে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ঘন্টা বাজালেন রেমন।

খানসামা এল।

কিশোর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জনি, নোটটা যে আপনি লেখেননি এখনও সে কথাই বলবেন, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। আমি নির্দোষ।'

'যদি লাই ডিটেকক্টরের সাহায্য নিই, আপনি টেস্ট দিতে প্রস্তুত?'

সামান্য কেঁপে উঠল খানসামার চোখের পাতা। পরক্ষণেই সামলে নিল সে। 'যা ইচ্ছে করতে পারেন। আমি রাজি।'

রবিন ঠিক করল, 'ডিয়ারভিল পুলিশ স্টেশনে গিয়ে রকি বীচ থানায় ফোন করে ইয়ান ফ্লেচারকে চাইবে। তাঁকে দিয়ে বলিয়ে ডিয়ারভিল থানা থেকে একটা পলিগ্রাফ চেয়ে আনবে। সন্দেহভাজনদের এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় তারা সত্যি কথা বলছে কিনা জানার জন্যে।

কিশোর আর রেমন দু'জনেই একমত হলেন, তাই করা উচিত।

চলে গেল রবিন। ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এল একটা পোর্টেবল পলিগ্রাফ মেশিন নিয়ে।

চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে রইল জনি। ওর শরীরের সাথে যোগ করে দেয়া হলো যন্ত্রটা। পালস রেট আর ব্লাডপ্রেশার মেপে গ্রাফে সংকেত পাঠাবে ওটা, ফলে শরীরের ভেতরের প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া যাবে। প্রশ্ন শুরু করল রবিন, 'জনি, আমার জ্যাকেটে পাওয়া নোটটা আপনি লিখেছেন?'

'না।'

'কে লিখেছে জানেন?'

'না।'

'পিটার এখন কোথায় জানেন?'

'না।'

গ্রাফের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কাঁটাটা একই জায়গায় রয়েছে, পরিবর্তন নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল রবিন, নির্দ্বিধায় জবাব দিয়ে গেল জনি। অবশেষে রবিন বলল, 'সত্যি কথাই বলছে মনে হয়।'

খুবই নিরাশ মনে হলো রেমনকে। খানসামাকে বেরিয়ে যেতে বললেন। সতর্ক করে দিলেন, বাড়ির সীমানা ছেড়ে যাতে না যায়।

'যাবে বলে মনে হয় না,' জনি বেরিয়ে গেলে কিশোর বলল। 'লোকটা সৎই।'

'তাহলে অসৎ কে এখানে?' রেমন বললেন, 'কে লিখল ওই নোট?'

রবিন বলল, 'কিশোর, আমাদের মানতেই হবে ভেতরের কেউই করেছে কাজটা। সূত্র বলতে এখন একমাত্র এই নোটটাই আছে আমাদের হাতে। এটা ধরেই এগিয়ে যেতে হবে।'

'এক কাজ করা যাক। যন্ত্রটা যখন আনাই হয়েছে, সবাইকেই টেস্ট করা যাক।'

সবাইকে ডেকে আনালেন রেমন। নোটটার কথা ওদেরকে বলল কিশোর। শুনে কেউই তেমন অবাক হলো না। তবে কেউই স্বীকার করল না লিখেছে। 'পলিগ্রাফ টেস্ট করাব না' বলেও আপত্তি করল না কেউ। বরং নার্স ডোরিয়া বলল, তাকে আগে টেস্ট করা হোক। কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি যাতে মিসেস রেমনের কাছে যেতে পারে।

একে একে সবাইকে টেস্ট করা হলো। কোন ফল হলো না। জনির বেলায় যা ঘটেছিল এখনও সেই একই ব্যাপার।

নীরবে যন্ত্রটা আবার খুলে নিয়ে গোছগাছ করে বাক্সে ভরতে লাগল দু'জনে। চিন্তিত। তদন্তের শুরুতে যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। একটুও এগোতে পারেনি।

গম্ভীর হয়ে ছিলেন মিস্টার রেমন, ওরা তাকাতেই এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। যেন ওদের ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করলেন। বললেন, 'এবার কি করবে?'

'সময় লাগবে বুঝতে পারছি,' কিশোর জবাব দিল। 'সব প্রশ্নেরই জবাব আছে। কোনটা বের করা সহজ কোনটা কঠিন। তবে বের হবেই। এই রহস্যের সমাধান আমরা করেই ছাড়ব।'

'তাড়াতাড়ি করতে পারলেই ভাল হয়। তোমাদের যে সুনাম শুনেছি, সেটা বজায় থাকবে আশা করছি।'

বেরিয়ে গেলেন রেমন।

যন্ত্রটা ফেরত দিতে চাইল দুই গোয়েন্দা। এবার কিশোরও চলল সঙ্গে চীফ নিকলসনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসার জন্যে।

পলিগ্রাফটা ফেরত দিল ওরা। চীফ নিকলসন ওদেরকে সাহায্য করতে চাইলেন। ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর বলল, প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাবে।

আবার ফিরে এল ওরা হুইসপারউডে। ছোট একটা ঝোপের পরিচর্যা করছে মালী। সেখানে নিয়ে গিয়ে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। 'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে।'

'করো,' বলে সেদিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল রবিন।

গাড়ি থেকে নামল দু'জনে। এগোল মালীর দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে গাছের গোড়ায় মাটি ঠাসছে লোকটা। সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকাল। প্রশ্ন ফুটল দৃষ্টিতে।

সোজা তার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার হেনরি, পিটারের নিখোঁজের ব্যাপারে কি ধারণা আপনার? মানে, কেমন লাগছে?'

গাছের গোড়ায় আরও কিছু মাটি ফেলল লোকটা। নির্বিকার স্বরে বলল, 'আমি এখানকার কর্মচারী। আমার লাগা না লাগায় কি এসে যায়?'

'কর্মচারী হোন আর যাই হোন, থাকেন তো এখানেই। নিশ্চয় অনেক কিছু চোখে পড়ে। পিটার কি করত না করত কিছুই দেখেননি একথা বলতে পারবেন না!'

'আমার কাজ ফুলগাছের যত্ন করা। পিটারের গভার্নেস ছিলাম না। ওর ওপর নজর রাখার জন্যে নিয়োগও করা হয়নি আমাকে যে সারাক্ষণ দরজার আড়ালে থেকে তাকিয়ে থাকব।'

এই সময় রান্নাঘরের স্ক্রীনডোর খুলে গেল। বেরিয়ে এল মালীর বৌ। ভোঁতা স্বরে বলল, 'ঘর থেকে তোমাদের সব কথাই শুনেছি।' স্বামীকে দেখিয়ে বলল, 'ও তো কিছু বলছে না, আমি বলছি, শোনো। পিটার এখান থেকে চলে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি।'

'কেন?'

'সে কথা তোমাকে আমি বলছি না।'

'ওকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন না,' অন্য ভাবে মহিলার পেট থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করল রবিন।

'ও কোথায় আছে জানি না। জানলেও বলতাম না,' কর্কশ হয়ে উঠল মহিলার কণ্ঠ। 'আচ্ছা, এত আগ্রহ কেন তোমাদের? নিজেদের চরকায় তেল দিতে পারো না? ছেলেটা অবুঝ নয়। পালিয়ে যখন গেছেই, নিশ্চয় তার কোন কারণ আছে।'

খোয়া বিছানো পথে জুতোর শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন। দৌড়ে আসছে মুসা। ভীষণ উত্তেজিত। কাছে এসে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই শোনো, অনেক খবর জেনে এসেছি!'

চার

টেনে মুসাকে মালী আর তার বৌয়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কি জেনেছ? আস্তে বলো।'

এখানে কারা কনডর বিক্রি করে জেনেছি।'

'কারা?'

'অলিম্পিক হেলথ ক্লাব। ম্যানেজারের নাম এরিক জুনেকার। তাকেই জিজ্ঞেস করেছি। এখানে একমাত্র ওরাই কনডর বিক্রি করে। আর কারও কাছে নেই।'

'তার মানে,' রবিন বলল, 'তারই কোন কাস্টোমারের কাছে বলটা বিক্রি করেছে, যেটা আমাদের জানালা দিয়ে ছোঁড়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা,' মুসা বলল।

'যাক, একটা সূত্র অন্তত পাওয়া গেল। অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে গিয়ে এখন খোঁজ করব, কার কার কাছে বল বিক্রি করে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কাজটা মুসার জন্যেই সহজ হবে। বল বিক্রি করতে নিয়ে গেলে কথায় কথায় অনেক কিছু জেনে নিতে পারবে। মুসা, অলিম্পিকের গ্রাউণ্ডে নিশ্চয় পুকুর বা লেক আছে? তোলার অনুমতি নিতে পারবে?'

'তা পারব। তবে দুটো চুক্তি হাতে আছে। ওগুলোর কাজ শেষ না করে আরেকটা থেকে তোলা যাবে না। চলি। কাজ করিগে।'

মুসা চলে গেলে আবার মালীর বৌয়ের সঙ্গে কথা শুরু করল কিশোর, 'মিসেস হেনরি, পিটারের পালিয়ে যাওয়ার কারণ আছে বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন আপনি?'

'এখানে সে অশান্তিতে ছিল। সে যা করতে চাইত, সব কিছুতেই বাধা, নিজের ইচ্ছেমত কিছুই করতে পারত না।'

'যেমন?'

'ওই হ্যামস্টারগুলোর কথাই ধরো। ওগুলো তো কারও কোন ক্ষতি করছিল না। বরং বেচারা ছেলেটা আনন্দে ছিল ওগুলোকে নিয়ে। ফেলে দিয়ে আসার কি মানে হয়?'

উঠে দাঁড়াল হেনরি। ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করো, অ্যানি! এত কথা বলতে কে বলেছে?'

'মিথ্যে তো আর বলছেন না,' রবিন বলল, 'তাছাড়া কোন গোপন কথাও ফাঁস করছেন না।'

'পিটারের ব্যাপারে মিস্টার রেমন যদি কিছু বলতে চান তোমাদের, বলতে পারেন,' মালী বলল, 'কিন্তু আমরা তাঁর কর্মচারী। আমাদের বলা সাজে না।' বৌয়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'চাকরিটা খেতে চাও নাকি?' মহিলার হাত ধরে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল সে, স্ক্রীনডোরটা লাগিয়ে দিল।

রবিনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর। ফিরে এল গেস্ট হাউসে।

'সবাইকে তো জিজ্ঞেস করা হলো,' কিশোর বলল, 'একমাত্র মিসেস রেমন

বাদে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো মূল্যবান সূত্র পেয়ে যেতে পারি।'

'মিস্টার রেমন সেটাকে ভালভাবে নেবেন না। যেতে হলে চুরি করে যেতে হবে, গোপনে, রেমনের চোখ এড়িয়ে।'

'তাই যাব। রাত হোক।'

অন্ধকার নামার পর বেরোল দুই গোয়েন্দা। পা টিপে টিপে এগোল প্রাসাদের দিকে। ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে, গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় এসে পৌঁছল বাড়ির পুবধারের অংশে। ছুরির মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা জানালার ছিটকানি খুলে ফেলল কিশোর। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল দু'জনে।

হলওয়ের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। কাউকে চোখে পড়ল না। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল মিসেস রেমনের ঘরের সামনে, মিস্টার রেমন যেটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

দরজায় আলতো টোকা দিল কিশোর।

খুলে দিল নার্স ডোরিয়া। 'কি চাই?'

মোলায়েম গলায় কিশোর বলল, 'মিসেস রেমনের সাথে কথা বলব।'

'অসম্ভব! কারও সাথেই কথা বলেন না মিসেস রেমন। দেখাও করেন না।' দরজাটা লাগিয়ে দিতে গেল নার্স। কিন্তু তার আগেই পাল্লার ওপাশে একটা পা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রবিন।

কিশোরও ঢুকল। শোবার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে কিশোর ডাকল, 'মিসেস রেমন, আমরা আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'পিটারের ব্যাপারে,' যোগ করল রবিন। 'জরুরী।'

পিছে পিছে এল নার্স। বেরিয়ে যেতে বলছে ওদেরকে। কানেই তুলল না দুই গোয়েন্দা। যেন শুনতেই পায়নি। সাড়া দিলেন না মিসেস রেমন। দরজার কাছে পৌঁছে গেল কিশোর আর রবিন। পেছনে নার্স। ভেতরে উঁকি দিয়েই স্থির হয়ে গেল ওরা।

বিছানা খালি।

ঘরে ঢুকল কিশোর আর রবিন। খুঁজতে শুরু করল। কোথাও পাওয়া গেল না মহিলাকে। একটা খোলা জানালা দেখাল রবিন। দু'জনে এসে দাঁড়াল তার কাছে। জানালার ফ্রেমে বাঁধা দড়ির সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, 'এদিক দিয়েই পালিয়েছেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কাউকে চোখে পড়ল না নিচে কোথাও। নার্সের দিকে ফিরে বলল, 'আপনার রোগী বেশ ভাল দড়াবাজিকর।'

'সব তোমাদের দোষ!' রেগে উঠল ডোরিয়া। 'তোমাদের ডাকাডাকিতেই নিশ্চয় ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর কোন ক্ষতি হলে তোমরা দায়ী থাকবে বলে দিলাম!' দরজার দিকে হাত তুলে ধমক দিয়ে বলল সে, 'যাও, বেরোও এখন!'

'যাচ্ছি,' শীতল গলায় বলল কিশোর, 'তবে আবার আসব।'

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে রবিনকে বলল সে, 'মিস্টার রেমনকে জানানো দরকার যে তাঁর স্ত্রী পালিয়েছেন।'

'বলার আগে আমরাই একবার খোঁজ করে দেখি না কেন? এখন গিয়ে বললে হয়তো আমাদের দোষই দেবেন তিনি। নার্স তো সব কিছু আমাদের ঘাড়েই

চাপাবে।'

'তা অবশ্য ভুল বলোনি। চলো তাহলে, আগে খুঁজেই দেখি।'

যে পথে ঢুকেছিল সেখান দিয়েই বেরিয়ে এল ছেলেরা। দু'জনে দু'দিকে যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে এই সময় তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। নারীকণ্ঠে একটি মাত্র ডাক শোনা গেল, 'পিটার!'

চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কোনখান থেকে এল?'

'প্রপাতের দিক থেকে! চলো!'

দৌড় দিল কিশোর। খোলা জায়গা পেরিয়ে এসে ঢুকল ঝোপের ভেতর। দু'হাতে ডালপাতা সরিয়ে এগোতে লাগল। পেছনে রয়েছে রবিন। যতই এগোচ্ছে জোরাল হচ্ছে পানি পড়ার শব্দ।

কিছুদুর এগোনোর পর সামনে একটা সরু গিরিখাত পড়ল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল খাতের পাথুরে কিনারা থেকে পানি ঝরে পড়ছে নিচে। যেখানটাতে পড়ছে সেখানে প্রবল ঘূর্ণি, ফেনায় ফেনায় সাদা। খাত থেকে বেরিয়ে গেছে একটা নালা, গ্র্যানিট রকের পাশ দিয়ে এগিয়েছে। সেটা ধরে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে পানি, তীব্র স্রোতা পাহাড়ী নদীর সৃষ্টি করেছে।

সরাসরি হেঁটে এগোনোর উপায় নেই। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল দুই গোয়েন্দা। যে কোন মুহূর্তে পিছলে কিংবা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। সাবধান থাকতে হচ্ছে সেজন্যে। রবিনকে হুঁশিয়ার করে দিল কিশোর, 'ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। দেখে পা ফেলো।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন। প্রপাতের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বলল, 'দেখো দেখো!'

প্রপাতের কিনারে বড় একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নারীমূর্তি, এই পরিবেশে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। মুখটা ওপর দিকে তোলা। শরীর টানটান। বহুদূরে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন।

চোখে এসে পড়ছে পানির কণা। ভাল করে দেখার জন্যে সেগুলো মুছে নিল দু'জনে। কিন্তু ওই মুহূর্তে জোর বাতাসে মহিলার গলার স্কার্ফের প্রান্ত উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর মুখে ফেলল, ঢেকে দিল চেহারা, চেনার জো রইল না আর।

দৃশ্যটা স্তব্ধ করে দিয়েছে কিশোরকে। বলল, 'রবিন, নিশ্চয় মিসেস রেমন। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।'

পাথুরে তরাইয়ে পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়েই এগোতে হলো ওদের। রবিন এখন আগে আগে রয়েছে। এসব পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ গতি তার। পাহাড় বাইতে ওস্তাদ; পাহাড়ে চড়ার নেশা। কয়েক বছর আগে পাহাড়ে চড়তে গিয়েই পা ভেঙেছিল সে, যেটা এখনও মাঝে মাঝে ভোগায়

আচমকা পা ফসকাল কিশোর। বাতাস খামচে ধরে যেন তাল সামলানোর চেষ্টা করল। পারল না। ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে।

চোখের পলকে তাকে গিলে নিল যেন ঘূর্ণি। তাথৈ ঢেউ কর্কের মত লোফালুফি শুরু করল তাকে নিয়ে। মূল পাকের মধ্যে পড়েনি, তাহলে তলিয়ে যেত, কিনারের দিকে পড়েছে। স্রোতের টান থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

পাথরে ঠুকে গেল মাথা। অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু।

চিৎকার শুনেই পিছে তাকিয়েছে রবিন। কিশোরকে পড়তে দেখেছে। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না, তারপর দেখল পানিতে কিশোরের মাথা একবার ডুবছে একবার ভাসছে। ভেসে যাচ্ছে স্রোতের দিকে। নিজে পড়ে যাওয়ার পরোয়া করল না আর রবিন। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটল কিশোরকে তোলার জন্যে। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে যেন পাহাড়েই জন্ম হয়েছে তার, পাহাড়ী ছাগল। তার এখন একটাই ভাবনা, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে কিশোর, তাকে উদ্ধার করতে হবে। সামনে নিচু আরেকটা জায়গায় ঝড়ে পড়ছে পানি, যেখানটায় পড়ছে সেখানে যেন দাঁত বের করে আছে অসংখ্য পাথরের ধারাল চোখা মাথা।

স্রোতের মুখে কিশোর পৌছার আগেই পৌছে গেল রবিন। উবু হয়ে বসে রইল কিশোরের আসার অপেক্ষায়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খপ করে চেপে ধরল শার্টের কলার। টেনে ওপরে তুলে আনল কিশোরকে, নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এল।

কিশোরকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তার মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করল সে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল কিশোরের। চোখ মেলল আরও পরে। রবিনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

হাসি ফুটল রবিনের মুখে। রসিকতা করে বলল, 'সাঁতার কাটতে যাওয়ার আর সময় পেলে না।'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। কি মনে হতেই উঠে বসল। 'ওই মহিলা...এখনও আছে?'

এতক্ষণে মনে পড়ল রবিনের। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। কিশোরও তাকাল। কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে চাঁদের মুখ। পাহাড়ের আনাচেকানাচে এখন ঘন ছায়া। মহিলা যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেও এখন অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'মনে হয় চলে গেছেন,' রবিন বলল। 'এখন আর তাঁকে খুঁজতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। এভাবে ঝুঁকি নেয়াটাও ঠিক না। এরপর দু'জনেই হয়তো পড়ব পানিতে।'

'তা ঠিক। চলো, প্রাসাদে। এতক্ষণে হয়তো ফিরেছেন মিসেস রেমন।'

ফিরে চলল ওরা। বাড়ির পুবধারে আসতেই চোখ পড়ল লনের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে কে যেন।

'মেয়েলোক!' কিশোর বলল।

'নিশ্চয় মিসেস রেমন,' বলেই ছুটল রবিন। কিশোর দৌড় দিল তার পিছে। পানিতে পড়ে আর মাথায় বাড়ি খেয়ে অনেকটাই কাহিল হয়ে গেছে সে। বেশি জোরে দৌড়াতে পারছে না। তবে হাল ছাড়ল না। ওরা লনে পৌছতে পৌছতে জানালার নিচে পৌছে গেল মূর্তিটা। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'আরি কাণ্ড দেখেছ!' অবাক হয়ে বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' ক্লান্তস্বরে বলল কিশোর, 'রীতিমত অ্যাথলেট। রোগী মনেই হয় না।'

'এই, ওটা কি?' বলতে বলতেই গিয়ে নিচু হয়ে জিনিসটা তুলে নিল রবিন।

একবার দেখেই পকেটে ভরল, পরে ভাল করে দেখার জন্যে।

ডেকেও ফেরানো গেল না মহিলাকে।

সাংঘাতিক ক্লান্ত লাগছে কিশোরের। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠার তো সামর্থ্য নেইই, জানালা ডিঙিয়ে আবার ঘরে ঢুকে মিসেস রেমনের সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করল না। ঘরে ফিরে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল।

গেস্টহাউসে পৌঁছে কাপড় ছেড়েই সোজা বিছানায়। তারপরই ঘুম।

দু'হাতের ওপর মাথা রেখে বিছানায় চিত হয়ে আছে রবিন। ভাবছে। কেস তো নয় যেন এক জটিল ধাঁধা। বিড়বিড় করে আনমনেই বলল, 'নার্স ডোরিয়াই মিসেস রেমনকে ঘর থেকে বেরোতে সাহায্য করেনি তো? কোথায় গিয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় জানে।'

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রবিন।

জোরে জোরে থাবা পড়ল দরজায়। চমকে গেল রবিন। লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘড়ি দেখল, আটটা বাজে। কিশোরও উঠে বসেছে। চোখ ডলছে। জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে অমন করছে?'

বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল রবিন। জনি দাঁড়িয়ে আছে। রবিনের নাকের কাছে একটা কেব্‌লগ্রাম নেড়ে বলল, 'সকালে এসেছে এটা। এখন আমরা জানি পিটার কোথায় আছে!'

পাঁচ

খানসামার হাত থেকে কাগজটা প্রায় কেড়ে নিয়ে পড়ল রবিন, 'সাহায্য চাই। এক্সেলশিয়র গ্রাও পারাতে আসতে হবে। জবাব দিতে হবে না। শুধু আসতে হবে। পিটার।'

জনি বলল, 'পিটার নিশ্চয় হোটেলে আছে।'

'কোথায় ওটা?' পুরোপুরি জেগে আছে কিশোর।

'ব্রাজিলের বেলিম থেকে পাঠানো হয়েছে কেবলটা আমাজান নদীর পাড়ে।'

'আজব জায়গায় চলে গেছে। ওখানে কেন?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। 'ঠিক আছে, এখুনি মিস্টার রেমনের সাথে কথা বলব।'

'তিনি তোমাদের জন্যেই বসে আছেন।'

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। প্রাসাদে চলে এল। স্বস্তি দেখা যাচ্ছে মিস্টার রেমনের চেহারায়। ওদেরকে দেখেই যেন কলকল করে উঠলেন, 'এটাই ঘটবে আমি জানতাম। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে পিটার। বুঝতে পেরেছে, যা কিছু করেছিল ওসবের কোন অর্থ নেই। তাই আবার বাড়ি ফিরতে চাইছে। রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।'

'তার মানে আমাদের কাজ শেষ?' রবিনের প্রশ্ন।

'মোটেও না। বরং শুরু। ব্রাজিলে গিয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে এসো। কেবলগ্রাম পড়েই বোঝা যায় কোন বিপদে পড়েছে সে। সেটা থেকে বের করে আনতে হবে ওকে। এমনও হতে পারে, শুধু হোটেলের বিল দিতে পারছে না বলেই

আটকে রয়েছে সে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়াল ডলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'তা না হয় গেলাম। যাওয়ার আগে মিসেস রেমনের সাথে একবার দেখা করতে চাই। কথা আছে।'

ভ্রূকুটি করলেন রেমন। 'আগে হলে মানা করতাম। এখন করব না। পিটারের খবরটা তাকে খুশিই করবে। যাও। তবে খুব তাড়াতাড়ি কথা শেষ করবে। তোমাদেরকে প্লেনে তুলে দিয়ে তারপর আমি নিশ্চিন্ত।'

মিসেস রেমনের ঘরের দরজায় এসে টোকা দিল কিশোর। খুলে দিল ডোরিয়া। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। গত রাতের কথা কি মিস্টার রেমনকে বলে দিয়েছে? মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তবে আগের রাতের মত আর ঢুকতেও বাধা দিল না। নীরবে হাত নেড়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করল।

একটা আর্মচেয়ারে বসে আছেন মিসেস রেমন। কাঁধে একটা শাল জড়ানো। কোলের কাছ থেকে পায়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে একটা চাদর। একপাশে কাত করে রেখেছেন মাথা, চোখ আধবোজা। যেন দুনিয়ার কোন খবরই নেই।

কিশোরের সন্দেহ হলো, ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে মহিলাকে। বলল, 'মিসেস রেমন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি আপনাকে।'

চোখ মেললেন মহিলা। 'কি কথা?'

'কাল রাতে প্রপাতের কাছে একজন মহিলাকে দেখেছি। আপনার মতই মনে হয়েছে।'

'আমি না!'

'সেই মহিলা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আবার আপনার ঘরেই ঢুকেছে,' রবিন বলল। 'আপনি না হলে আর কে?'

তীক্ষ্ণ হলো মিসেস রেমনের কণ্ঠ, 'আমি কি জানি! আমি জানি না! অন্ধকারে নিশ্চয় ভুল করেছ তোমরা।'

'কাল রাতে অনেক বড় চাঁদ ছিল আকাশে,' বলল কিশোর। 'উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছিল। প্রচুর আলো।'

'কি হয়েছে বুঝতে পারছি। প্রপাতের কাছে প্রায়ই ভুল দেখে মানুষ, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে। তোমাদের মনে হয়েছে তোমরা একজন মহিলাকে দেখেছ। সেটা চোখের ভুল।'

একটা ইজি চেয়ার থেকে দোমড়ানো একটা স্কার্ফ তুলে নিল রবিন। পকেট থেকে বের করল গতরাতে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা, কাপড়ের টুকরো। স্কার্ফের একটা জায়গা ছেঁড়া, টুকরোটা খাপে খাপে মিলে যায় ওখানে। তার মানে এটারই টুকরো।

ভীষণ চমকে গেলেন মিসেস রেমন। টুকরোটা কোথায় পেয়েছে রবিন বলতেই নেতিয়ে পড়লেন তিনি চেয়ারে।

'বেহুঁশ হয়ে গেলেন মনে হয়!' প্রায় ছুটে গিয়ে মিসেস রেমনের দু'হাত তুলে নিয়ে তালুতে তালু ঘষতে শুরু করল কিশোর। রবিন মালিশ করে দিতে লাগল ঘাড়। দৌড়ে এল ডোরিয়া, পানির গেলাস নিয়ে।

গোঙাতে আরম্ভ করলেন মিসেস রেমন। চোখ মেলে তাকালেন। ঘোলাটে দৃষ্টি, যেন কোথায় রয়েছেন বুঝতে পারছেন না। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে উঠে বসলেন। কাঁধের শালটা খসে গিয়েছিল, তুলে আবার জায়গামত জড়িয়ে দিল রবিন।

ঝাঁঝাল কণ্ঠে ডোরিয়া বলল, 'অনেক হয়েছে। তোমাদের যন্ত্রণা সহ্য করার অবস্থা নেই মিসেস রেমনের। চোরপুলিশ খেলাটা অন্য কোথাও গিয়ে চালাওগে, যাও।'

'তা যাব, শীঘ্রিই চলে যাব,' রবিন বলল। 'ব্র্যাজিলে যাচ্ছি আমরা, পিটারকে ফিরিয়ে আনার জন্যে, সে কথাই বলতে এসেছিলাম।'

পিটারের নাম শুনেই দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন মিসেস রেমন, 'না না, পিটার ব্র্যাজিলে যায়নি! এখানেই আছে!'

'তাই নাকি?' কথাটা ধরল কিশোর। 'কোথায়? সব কথা খুলে বলুন, প্লীজ।'

মলিন একটা হাসি ফুটল কেবল মিসেস রেমনের ঠোঁটে। চুপ হয়ে গেলেন। আর কিছু বলার ইচ্ছে নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। ভেবেছিল ওরা বেরোলেই দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দেবে নার্স। সে রকম কিছু তো করলই না, বরং ওদের পিছু পিছু এল কথা বলার জন্যে।

'মিসেস রেমনের কথায় নিশ্চিত অবাক হয়েছ তোমরা,' বলল সে।

'অবাক হবারই কথা, তাই না?' রবিন বলল।

তার সাথে সুর মেলাল কিশোর, 'পিটার এখানেই আছে বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি?'

'নানা রকম উদ্ভট জিনিসে বিশ্বাস করেন তিনি। অলৌকিক ক্ষমতা, ধ্যানে বসে ত্রিকাশ ঘুরে আসা, এইসব আরকি,' নার্স বলল। 'তাঁর বিশ্বাস, একজন লোক একই সঙ্গে দুই জায়গায় থাকতে পারে।'

'তাই,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

বাইরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। প্রাসাদ থেকে সরে এসে ফিরে তাকাল মিসেস রেমনের ঘরের দিকে। জানালায় একটা মুখ দেখতে পেল। মিসেস রেমন। ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে অনুনয়, যেন কিছু বলতে চাইছেন, দৃষ্টি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন কিছু।

'মহিলার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' রবিন বলল। 'মানসিক রোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই। একারণেই কোন কিছু চিন্তাভাবনা না করেই প্রপাতের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন ছেলেকে খুঁজতে।'

গেস্টহাউসে ফিরে এসে দেখল মুসা বসে আছে। আধ ঘণ্টা পর এসে হাজির হল বিল আর টম। ডিয়ারভিলে বল তোলার জন্যে ওদের সাহায্য চেয়েছে মুসা। লাভের একটা অংশ অবশ্যই ওদেরকে দেয়া হবে। কিশোর আর রবিন অন্য কাজে ব্যস্ত, তাই বল তোলায় ওদের সাহায্য আর পাচ্ছে না সে। সে নিজেও কয়েকটা চুক্তি সই করে ফেলেছে, অনেক টাকা খাটিয়ে বসে আছে, সেগুলো না তোলা পর্যন্ত আর কোন কাজে মন দিতে পারছে না।

পিটারের কেসটা নিয়ে মুসার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল কিশোর আর

রবিন। এ ব্যাপারে বিল আর টমেরও প্রচুর আগ্রহ, তাই তারাও যোগ দিল আলোচনায়। ওদের নিরুৎসাহিত করল না কিশোর। তেমনি জরুরী কিংবা গোপন কথা বলছে না এখন।

'কাজেই আমাকে আর রবিনকে ব্র্যাজিল যেতে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'ইতিমধ্যে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, মুসা। রেমনের বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে।'

'অত্তবড় বাড়ির ওপর একা নজর রাখি কি করে?' মুসা বলল।

গাল চুলকাল কিশোর। বিল আর টমের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল। বলল, 'এই, গোয়েন্দাগিরি করবে।'

তিন গোয়েন্দার খ্যাতি স্কুলের অনেক ছেলেরই ঈর্ষার কারণ, অনেকেই গোয়েন্দা হতে চায়, টম আর বিলও তার ব্যতিক্রম নয়। সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করল না। রাজি হয়ে গেল।

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের সাহায্য নেবে…'

'তার পরেও, এত বড় বাড়ির ওপর বাইরে থেকে নজর রাখা খুব কঠিন।'

'আরেক কাজ করতে পারো তোমরা। মিস্টার রেমনকে গিয়ে ধরলে তোমাদেরকে গেস্টহাউসে থাকতে দিতে রাজিও হয়ে যেতে পারেন তিনি। এখানে থেকেই তখন বল তুলতে যেতে পারবে। যখন কাজ থাকবে না বাড়িটার ওপর নজর রাখতে পারবে। তিনজন আছ, তেমন বুঝলে পালা করেও পাহারা দিতে পারো।'

'হুঁ, দেখি।' হাসি ফুটল মুসার মুখে, 'পারলে ভালই হত। হোটেলে থাকার টাকাটা বেঁচে যেত আমাদের।' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই, চল, মিস্টার রেমনের সাথে এখনই দেখা করে আসি।'

নিজের পরিচয় দিয়ে ইচ্ছের কথাটা মিস্টার রেমনকে জানাল মুসা।

খুশিই হলেন তিনি, বোঝা গেল। বললেন, 'থাকলে মন্দ হয় না। কয়েকজন লোক থাকলে জোর বাড়বে আমাদের। কোন কিছু ঘটার আশঙ্কা করছি না অবশ্য, তবু…'

প্লেনের টিকেট কেটে এল কিশোর আর রবিন। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে রওনা হলো রকি বীচে, অভিভাবকদের জানাতে যে ওরা ব্র্যাজিলে যাচ্ছে। রবিনের বাবা-মা বিশেষ আপত্তি করলেন না যখন শুনলেন কিশোরের সঙ্গে যাচ্ছে। তবে মেরিচাচী খুঁতখুঁত করতে লাগলেন কিশোরের সঙ্গে। বললেন, 'বেশি দিন থাকবি না তো?'

'আরে না না,' কিশোর বলল। 'তিন-চার দিন লাগবে আর কি।'

'বোয়া কনস্ট্রিকটর কিংবা পিরানহার পেটে হজম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এমনও হতে পারে আমাজানের গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললি, আর জাগুয়ারে এসে ঘাড় মটকাল। বলা তো যায় না কিছুই। ওখানকার জংলীরাও যা শয়তান, বিদেশী দেখলেই তো খেয়ে ফেলে। বিষাক্ত তীর মেরে তোদেরকে মেরে ফেলল, তখন কি হবে?'

'দেখো, চাচী, আমাজানে নতুন যাইনি আমরা। অনেক বড় অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছি. মরিনি তো…'

'সে জন্যেই তো এত ভয়। সেবার তো প্রায় মরতে মরতে ফিরেছিস···'

'চাচী, এবার জঙ্গলে যাচ্ছি না আমরা, যাচ্ছি বেলিমে। সেটা আধুনিক শহর।'

'শহর হোক আর যাই হোক, আমাজান এলাকা, ওখানে বিপদ থাকবেই। যা, তোর ইচ্ছে, তবে বিপদে পড়লে বুঝবি। তখন মনে হবে আমার কথা।' গটমট করে চলে গেলেন চাচী।

শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর। যাওয়াই না বন্ধ হয়ে যায়। বাঁচালেন রাশেদ পাশা। তিনি মেরিচাচীকে বোঝাতে লাগলেন।

সেদিন বিকেলেই প্লেনে চাপল কিশোর আর রবিন।

ভাল জায়গায় সীট পড়েছে ওদের। যে সারিতে বসেছে, তার একেবারে শুরুতে দুটো আসন। জানালার পাশের সীটটায় বসেছেন একজন কালো চুল ব্র্যাজিলিয়ান ভদ্রলোক। বয়েস চল্লিশের ওপর, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন। আলাপ জমাতেও ওস্তাদ। বললেন, 'এই প্লেনে অনেক সময় থাকতে হবে। একা একা মুখ বুজে থাকতে ভাল লাগবে না। পরিচয়টা সেরে নিলে কথা বলতে পারব। আমার নাম ডেংগু পারভি।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বেলিম শহরটা কেমন বলুন তো?'

'খুব রোমান্টিক,' পারভি বললেন। 'আমাজনের মুখের কাছে। পুরানো অনেক বাড়িঘর আছে, ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি। দেখার আছে অনেক কিছু। ভার-ও-পেসো মার্কেটটাও অবশ্যই দেখতে যাবে। এই পর্তুগীজ নামের মানে হলো ভারের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আজব নাম, তাই না?' হাসলেন তিনি।

জানা গেল, ডেংগু পারভি বুনো জন্তুজানোয়ারের ব্যবসা করেন। 'আমাজনের জঙ্গলের বড় বড় সাপ আর জাগুয়ারের খুব চাহিদা দুনিয়ার চিড়িয়াখানাগুলোতে। জংলীদের কাছ থেকে ওসব কিনে নিয়ে চালান দিই আমি। লস অ্যাঞ্জেলেসের চিড়িয়াখানায় আমার দেয়া জানোয়ার অনেক দেখতে পাবে।'

'ও,' রবিন বলল। 'আপনার সাথে আমাদের এই একটা ব্যাপারে মিলে যাচ্ছে। আমরাও মাঝে মাঝে বুনো জানোয়ারের ব্যবসা করে থাকি। আমাজন থেকে একবার অনেক জানোয়ার ধরে এনেছিলাম।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী মনে হলো পারভিকে। 'এবারও কি সেই উদ্দেশ্যেই যাচ্ছ?'

'না,' কিশোর জবাব দিল, 'এবার বেলিমে যাচ্ছি, একজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে।'

'থাকাটাকার জায়গা ঠিক করেছ?'

'না করে কি আর অত দূরে যাওয়া যায়? একসেলশিয়র গ্রাও পারা হোটেলে থাকব।'

'তাই?' সন্দেহ দেখা দিল পারভির চোখে।

'কি ব্যাপার?'

'না, কিছু না। হোটেলটার অনেক দুর্নাম রয়েছে তো, তাই ভাবছি। একদল গুণ্ডাপাণ্ডা চালায় ওটা।'

হাসল কিশোর। 'যে খুশি চালাক। আমরা টাকা দেব, থাকব, ব্যস। কাস্টোমারের সাথে অহেতুক গোলমাল করে হোটেল বন্ধ করে দেয়ার ইচ্ছে নিশ্চয় গুণ্ডাপাণ্ডাদেরও নেই।'

মাথা দুলিয়ে পারভি বললেন, 'তা বটে। যাই হোক, বিপদে পড়লে কিংবা কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে একটা খবর দিতে ভুলো না।' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলেন তিনি, 'এই নাও আমার ঠিকানা।'

'থ্যাঙ্কস,' বলে কার্ডটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।

সীটে হেলান দিল তিনজনেই। খানিক পরেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন পারভি। রবিনের চোখও জড়িয়ে এল। কিশোর তাকিয়েই রয়েছে পারভির মুখের দিকে।

হঠাৎ চোখ মেললেন জানোয়ার ব্যবসায়ী। কিশোরের চোখে চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখছ?'

'না, কিছু না,' বলল কিশোর। 'আপনার গায়ে একটা দাগ দেখছি। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করেছিলেন নাকি!'

দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে গেল পারভির। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাসলেন। 'কেন জিজ্ঞেস করছ একথা?'

'না, এমনি,' বলল কিশোর। আর কিছু বললেন না পারভি। আবার চোখ মুদলেন।

আরও অনেক পরে, সকালের উজ্জ্বল রোদে বেলিমে নামার জন্যে প্রস্তুত হলো বিমান। জানালা দিয়ে শহরটা দেখতে পেল ছেলেরা। ঝলমলে রঙের যেন মেলা বসেছে। রঙের ছড়াছড়ি। ঘরবাড়িগুলোতেও উজ্জ্বল রঙ করা। লাল, সবুজ কিংবা হলুদ রঙ করা হয়েছে টালির ছাতগুলোতে। ছোটবড় নানা ধরনের বোট আর জাহাজ বন্দরে নোঙর করা।

বিমান থেকে নেমে এসে গোয়েন্দারা দেখল, কার্গো কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পারভি। অনেক বড় একটা বাক্স এনেছেন তিনি, সেটা নামানোর অপেক্ষায় আছেন।

নামানো হলো। তারপুলিনে ঢাকা ওটা।

'ভেতরে নিশ্চয় জানোয়ার আছে,' রবিন অনুমান করল।

'থাকতে পারে,' কিশোর বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, জানোয়ার ব্যবসায়ী যখন। হয়তো আমেরিকা থেকে বেলিমের জন্যে কুগার নিয়ে এসেছেন।'

পাসপোর্ট কন্ট্রোলে এসে নিয়মমাফিক সব কাজ সারা হলে ওদের ব্যাগগুলো হাতে পেল কিশোর আর রবিন। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এল একসেলশিয়র গ্রাণ্ড পারা হোটেলে। গালভরা নাম শুনে ওরা ভেবেছিল অনেক বড় হোটেল হবে, কিন্তু আসলে ছোট।

ডেস্কে খোঁজ নিলে ক্লার্ক জানাল, 'পিটার রেমন হোটেলে নেই।'

'বেরিয়েছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'না, চলে গেছে।'

'চলে গেছে!'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

'না। ঠিকানা রেখে যায়নি।'

'আশ্চর্য!'

'ঘরে আমাদের জন্যে কোন মেসেজ রেখে যেতে পারেন,' রবিন বলল কিশোরকে। ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করল, 'যে ঘরে ছিল সেটা একবার দেখতে পারব?'

শ্রাগ করল ক্লার্ক। 'খালিই আছে। ইচ্ছে হলে যাও। দুশো পঁচিশ নম্বর। দরজা খোলাই পাবে।'

ডেস্কের কাছে মালপত্র রেখে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। লিফটে করে উঠে এল ওপরে। ঘরটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। দরজা খোলা, তালায় চাবি ঢোকানো রয়েছে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

'ভালমত খোঁজো,' রবিনকে বলল কিশোর।

ড্রেসার, ডেস্ক, নাইট টেবিল খুঁজে কিছু পেল না। কাগজ ফেলার ঝুড়িতেও দেখল কিশোর, নেই কিছু। আলমারি খুলল গিয়ে রবিন। ডাকল কিশোরকে, 'দেখে যাও!'

চামড়ার একটা জ্যাকেট বের করে আনল সে। ডিয়ারভিল শহরের লেবেল লাগানো রয়েছে। পকেটগুলোতে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। একটা সিগারেট লাইটার পেল। হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে একসময় কৌতূহলী হয়ে টিপ দিল আগুন জ্বালানোর জন্যে।

সাধারণ লাইটারের মতই ওপরটা খুলে গেল, কিন্তু আগুন জ্বলার বদলে ঝট করে বেরিয়ে এল একটা লুকানো সুচ। রবিনের বুড়ো আঙুলে বিঁধল। উহ্ করে হাত থেকে ছেড়ে দিল সে। পাথর হয়ে রইল একটা সেকেণ্ড, তারপর টলে উঠল কাটা কলাগাছের মত।

ছয়

দৌড়ে এল কিশোর। ধরে ফেলল রবিনকে। মেঝেতেই শুইয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রবিন? কি হয়েছে?'

জবাব দিল না রবিন। চোখ বোজা। চেহারা ফ্যাকাসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'ডাক্তার দরকার,' ভেবেই লাফিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। দরজার দিকে ছুটল। পুরানো মডেলের নব ধরে মোচড় দিল। ঘুরল না ওটা। আরও কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার শুরু করল। কেউ সাড়া দিল না।

বিছানার পাশে টেলিফোনটার ওপর চোখ পড়ল তার। ছুটে এল ওটার কাছে। ডেস্কের কেউ ধরল না টেলিফোন, জবাব মিলল না। মরিয়া হয়ে জানালার বাইরে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে দেখল সে। মাটি তিরিশ ফুট নিচে। অতখানি লাফিয়ে নামা সম্ভব না। একটা দড়ি হলে পারা যায়।

ঘরে দড়ি নেই। আর কোন উপায় না দেখে বিছানার চাদর তুলে নিয়ে টান

দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে একটার মাথা আরেকটার মাথায় বেঁধে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করল। জানালার সঙ্গে বেঁধে নামতে যাবে এমন সময় খুট করে শব্দ করে খুলে গেল দরজা।

ফিরে তাকাল কিশোর।

ঘরে ঢুকলেন ডেংগু পারভি। কিশোরের হাতে চাদর ছেঁড়া, মাটিতে শুয়ে আছে রবিন, দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাতে লাগলেন। বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

কিশোর বলল, 'একজন ডাক্তার দরকার। বিষ ঢুকেছে রবিনের শরীরে।'

আরও অবাক হলেন পারভি। তবে আর প্রশ্ন করলেন না, দৌড়ে গেলেন টেলিফোনের কাছে। ডেস্ক থেকে সাড়া মিলল। হোটেলের ডাক্তারকে জলদি নিয়ে আসতে বললেন তিনি।

রিসিভার রাখতেই কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ঢুকলেন কি করে? এলেনই বা কেন?'

'দরজার তালায় চাবিটা ঢোকানো দেখলাম। ঢুকতে অসুবিধে হলো না। এসেছিলাম জিজ্ঞেস করতে, নতুন এসেছ শহরে, কিছু লাগবে কিনা। কাছাকাছিই থাকি আমি। ক্লার্ক বলল তোমরা এঘরে এসেছ। বিষ ঢুকল কি করে?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। রবিনের পাশে বসে পড়লেন। নাড়ি দেখলেন। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'হলো কি করে এরকম?'

লাইটারটা দেখিয়ে বলল কিশোর, কিভাবে বিষ ঢুকেছে রবিনের শরীরে। লাইটারটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখলেন ডাক্তার। তারপর ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ আর ওষুধ বের করে ইঞ্জেকশন দিলেন রবিনকে।

'সেরে যাবে,' বললেন তিনি। 'তেমন মারাত্মক কিছু না।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে পারভির। 'তোমাদের পিছে কে লাগল?'

'বেলিমের কেউ একজন আমাদের পছন্দ করতে পারেনি; চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'অচেনা শহরে আপনার মত একজন বন্ধু পেয়ে ভাল হলো।'

'আমিও তোমাদের জন্যে কিছু করতে পেরে খুশি। যদি আমার পরামর্শ নাও, তাহলে বলব, এখনও সময় আছে। এই হোটেলে থেকো না। অন্য কোথাও চলে যাও।'

'দেখি, তাই বোধহয় করতে হবে। রবিন আগে ভাল হয়ে নিক।'

ওরা কথা বলতে বলতেই জ্ঞান ফিরল রবিনের। ডাক্তার আবার তাকে পরীক্ষা করে বললেন বিপদমুক্ত হয়ে গেছে।

উঠে বসল রবিন। কাঁপছে। কিছুক্ষণ ওভাবে বসে থেকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথা ঘুরে উঠতেই বসে পড়ল আবার। কয়েক মিনিট জিরিয়ে আবার উঠল। টলছে শরীর, তবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল। 'নাহ্, এবার পারছি। আর পড়ব না।'

ডাক্তার চলে গেলেন।

পারভি বললেন, 'ভাল কথা, যাকে খুঁজতে এসেছিলে. মানে তোমাদের বন্ধু, সে

কোথায়?'

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা আসার আগেই নাকি চলে গেছে।'

'অবাক কাণ্ড! চলে গেল এভাবে? নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে।'

'মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো করে যেতে হয়েছে,' রবিন বলল। 'জ্যাকেট ফেলে গেছে ভুলে।'

'ওটার পকেটে ওর লাইটারটা ছিল,' যোগ করল কিশোর, 'অবশ্য যদি জিনিসটা ওর হয়ে থাকে।'

দরজা খুলে উঁকি দিল একজন বয়, তাকে ডেকে ভেতরে আনলেন পারডি। বললেন, 'এর আগে এই ঘরে যে ছিল তার সম্পর্কে কিছু জানো?'

'জানি, স্যার,' বয় বলল। 'খুব ধনী এক আমেরিকান, আমারই বয়েসী হবে। নাম পিটার রেমন।'

'ওর কি হয়েছে বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কোথায় গেছে কিছু বলে গেছে?'

'না। দু'জন লোকের সাথে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে বলতে পারব না।'

'লোকগুলোকে চেনো?'

'একজনকে চিনি, মানে দেখেছি। অনেক বার। ভার-ও-পেসো মার্কেটে। তবে ওর নামও জানি না, কি কাজ করে তা-ও জানি না।'

আরও কিছু প্রশ্ন করল কিশোর। আর কোন তথ্য দিতে পারল না ছেলেটা। ওকে যেতে বলল সে।

'তোমরা যেতে চাইলে,' পারডি প্রস্তাব দিলেন, 'খুশি হয়েই তোমাদেরকে ভার-ও-পেসো মার্কেটে নিয়ে যেতে পারি, তোমাদের বন্ধুকে খুঁজতে।'

'তাহলে তো খুব ভালই হয়।'

ওই হোটেলেই দু'জনের জন্যে একটা ঘর ভাড়া নিল কিশোর, তারপর বেলিম ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ল ব্র্যাজিলিয়ান জানোয়ার ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

রাস্তায় পথচারীর ভিড়, ওদের পাশ কাটিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছে, সবাই ব্যস্ত। গাড়িও আছে প্রচুর, তবে বেশির ভাগই পুরানো, ঝরঝরে। নারকেল তেল তৈরি হচ্ছে কারখানায়, তার গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

নাক কুঁচকে ছেলেদেরকে শ্বাস নিতে দেখে হেসে বললেন পারডি, 'নারকেল তেলের বিরাট ব্যবসা রয়েছে এখানে। রপ্তানী করা হয়। ওই ট্রাকগুলো দেখছ? বস্তার ভেতর নারকেল বোঝাই।'

ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেলে ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে তিনজনেই লাঞ্চ সেরে নিল। তারপর আবার ঘুরতে শুরু করল মার্কেটের ভেতর। দুই পাশে দোকানের সারি, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ। নানা রকম পণ্যে বোঝাই দোকানপাট। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল, স্যাণ্ডেল, আর সস্তা রঙচঙে জিনিসের দোকানই বেশি।

খদ্দেরও আছে প্রচুর। দোকানিরা দাম হাঁকছে, খদ্দেররা দর কষাকষি করছে, অনেক সময় নিয়ে জিনিস কিনছে। পর্তুগীজ ভাষায় চলছে কথাবার্তা।

একটা দোকান দেখা গেল, জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড়, চামড়া, এমনকি জীবন্ত জানোয়ারও বিক্রি করে। সেদিকে হাত তুলে হেসে বলল রবিন, 'কিশোর, দেখো, কি

জিনিস। কিনবে নাকি? পাইথনের বাচ্চা, অ্যালিগেটরের দাঁত...'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'ভুডু শিখে নিয়ে ওই দোকান থেকে সরঞ্জাম কিনে চলে যাব আমেরিকায়। প্রথমেই ভুডুর ক্ষমতা ফলাব চাচীর ওপর, যাতে মন নরম হয়ে যায়, অহেতুক আর আমাদের খাটিয়ে না মারে।'

শেষে আরেকটা অদ্ভুত দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পর্তুগীজ ভাষায় দোকানের নামটাও অদ্ভুত, মানে করলে দাঁড়ায় ডাইনীবিদ্যার আখড়া। ভেতরে ছোটখাট, ছুঁচোমুখো এক বুড়ো বসে বসে বিক্রি করছে আজব সব জিনিস, পাথরের পুরানো ছোট মূর্তি, মোমের মূর্তি যার মধ্যে ইচ্ছে করলে ভুডুর সুচ ঢোকানো যায়, জাদু করার জন্যে নানা রকম উদ্ভট সরঞ্জাম।

লোকটার সঙ্গে পর্তুগীজে কথা বললেন পারভি। ছেলেদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'ভুডুর একটা অনুষ্ঠান হবে। আমাদেরকে থাকতে বলছে গামু। ধ্যানে বসে সে নাকি বলে দিতে পারবে তোমাদের বন্ধু কোথায় আছে।'

বুড়োর নাম গামু, ওঝা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, ভাঙা আর ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

পারভিকে বলল কিশোর, 'ওকে বলুন, ওসব ধ্যানফ্যান আমরা বিশ্বাস করি না।'

পারভি হাসলেন। 'বিশ্বাস করবে না আমিও জানি। তবে অনুষ্ঠানটা সত্যিই মজার, উপভোগ করবে বলতে পারি। এরকম সুযোগ সব সময় পাবে না। রাজি হয়ে যাও।'

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে কিশোর বলল, 'বেশ।'

ওঝার সঙ্গে আবার পর্তুগীজে কথা বললেন পারভি।

বাউ করল লোকটা। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দোকানের ভেতর দিয়ে। নানা রকম জিনিস গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে, এই যেমন সাপের শুকনো চামড়া, বুনো গাছগাছড়ার ডাল, পাতা, শেকড়। দোকানের পেছনের ছোট একটা দরজার কাছে এসে থামল লোকটা। খুলে ভেতরে ঢুকল। কিশোররাও ঢুকল তার পেছনে। পাথরের সরু ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে।

মোলায়েম স্বরে আনমনেই বিড়বিড় করে কি বলছে গামু। দেয়ালে ঝোলানো একটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে আগুন ধরাল। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। বাতাস শীতল, ভেজা ভেজা। দেয়ালের গা সেঁতসেঁতে। লণ্ঠনের ঘোলাটে হলুদ কাঁপা কাঁপা আলোয় অন্ধকার তো কাটছেই না, বরং যেন জমাট বাঁধছে আরও। ভূতুড়ে, রহস্যময়, গা ছমছমে পরিবেশ।

ভারি একটা কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভাষায় কথা বলল বুড়ো। ছেলেদেরকে সেটা অনুবাদ করে শোনালেন পারভি, 'রাস্তার অনেক নিচে মাটির তলার একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অনেক উটকো লোক এসে বিরক্ত করে, বিশেষ করে পুলিশ, তাদের ভয়েই এখানে অনুষ্ঠান করা হয়। যাতে বাধাটাধা না পড়ে।'

পুলিশ! অস্বস্তির শিহরণ যেন শিরশির করে নেমে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে। এ কোথায় নিয়ে আসা হলো ওদের?

কালো একটা চাবি বের করে তালায় ঢোকাল গামু। কিট করে খুলে গেল তালা। বিশাল একটা ঘর, ভ্যাপসা গন্ধ। ধুলোয় ঢাকা অসংখ্য থাম ধরে রেখেছে ছাতটাকে।

পাথরের মেঝেতে গোল হয়ে বসে আছে জনাকুড়ি স্থানীয় লোক। পরনে ঢলঢলে সাদা আলখেল্লা। মাটির একটা জগ ঘুরে বেড়াচ্ছে হাত থেকে হাতে। যার হাতে যাচ্ছে সে-ই লম্বা একটা চুমুক দিয়ে তুলে দিচ্ছে পাশের লোকটির হাতে।

ফিসফিস করে রবিন আর কিশোরকে বললেন পারভি, 'ম্যাকুমবার জগতে প্রবেশ করলে তোমরা।'

'ম্যাকুমবা?' রবিন অবাক। 'সেটা আবার কি?'

'ভুডুরই একটা অঙ্গ। এই লোকগুলোর বিশ্বাস, জাদুনাচের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া কিংবা দেহ ছেড়ে যাওয়া আত্মাদের আবার ডেকে আনতে পারবে। যে কোন একজনের নর্তকের ওপর ভর করবে আত্মা।'

'কিন্তু এখন তো নাচছে না,' কিশোর বলল।

'তৈরি হচ্ছে দেখছ না। পবিত্র পানীয় খাচ্ছে ওরা। ভয়াবহ স্বাদ। খেয়ে দেখেছি একবার।'

মাধ্যম, অর্থাৎ কার ওপর প্রেতাত্মা ভর করবে বোঝা গেল। ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল লোকটা। সুর করে শ্লোক বলতে লাগল অন্যেরা, তালে তালে তালি বাজাতে লাগল।

'এটা ওদের পবিত্র সঙ্গীত,' পারভি বললেন ছেলেদেরকে। 'এই শ্লোক বলে বলে মৃতের দুনিয়ার সাথে জীবিত মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করছে।'

আবছা আলোতে কিম্ভুত লাগছে চেহারাগুলোকে। কালো চোখে আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে, যেন জ্বলছে ওগুলো। জোরাল হতে লাগল সঙ্গীত, বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল। চড়া হচ্ছে সুর, উঁচু পর্দায় উঠে যাচ্ছে ক্রমেই।

হঠাৎ কিশোরদের কাছের লোকটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল। একের পর এক লাফিয়ে উঠতে লাগল অন্যেরা, একই ভাবে লাফাতে লাগল। মাঝে মাঝে পা ঠুকছে মেঝেতে, যে ভাবে খুশি হাত নেড়ে চলেছে। একটা দিকে বিশেষ খেয়াল রেখেছে, চক্রটা যাতে না ভাঙে।

গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল ওরা।

নিজের অজান্তেই সেদিকে এগিয়ে চলল কিশোর। ম্যাকুমবা নর্তকদের বড় বড় চোখ যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে। অদৃশ্য এক চুম্বক বুঝি টেনে নিয়ে চলেছে ওকে, চক্রের ভেতরে ঢোকার জন্যে টানছে। এড়াতে পারল না সেই আকর্ষণ। ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঘুরছে চক্রটা। গতি বাড়ছে।

আচমকা একটা চিৎকারে ঘোর কেটে গেল কিশোরের। গলা চেপে ধরে মেঝেতে পড়ে গেছে একটা লোক। অন্যেরাও চেঁচাতে শুরু করল। উদ্দাম হয়ে উঠল নাচ। পাগলের মত লাফাচ্ছে।

চারপাশে তাকাল কিশোর। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। ছুটে গেল দু'জন লোকের দিকে। রবিন আর পারভিকে খুঁজছে। কই, না তো, এরা নয়! হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ওদেরকে কোথাও না দেখে।

মাথা গরম করো না, নিজেকে ধমক দিল কিশোর। আরেকবার খুঁজল রবিনকে। ছুটে চলল চক্রের পাশ দিয়ে। পুরো চক্রটা ঘুরে আবার ফিরে এল যেখান থেকে শুরু করেছিল। নেই! কোথাও নেই রবিন আর পারভি! গেল কোথায়? বেরিয়ে গেল?

দরজার দিকে তাকাল সে। কিন্তু কোথায় দরজা? যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেই পথটা চোখে পড়ছে না এখন। বুকের দুরুদুরু বেড়ে গেল। একদল খেপা ভূতুড়ে বিশ্বাসী মানুষের মাঝে আটকা পড়েছে সে।

সাত

সর্পিল গতিতে যেন এগিয়ে আসতে লাগল কিশোরের দিকে অসংখ্য হাত। ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কি? তাকে কি ম্যাকুমবা অনুষ্ঠানের বলি করা হলো?

'পালাতে হবে! পালাতে হবে!' একটাই চিন্তা এখন ঘুরতে লাগল তার মাথায়। 'কিছুতেই খেপাগুলোর হাতে আটকা পড়া চলবে না!' সরে গেল চক্রের ধারে। ছুটে এল একটা হাত, তাকে ধরার জন্যে। কিছুতেই ধরতে দেবে না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। আঘাত করার জন্যে তৈরি হলো। জুডো আর কারাতের যত বিদ্যে শিখেছে সব প্র্যাকটিস করবে এখানে। এই মুহূর্তে একটা লোকের জন্যে বড় আফসোস হতে লাগল তার। মুসা আমান। এই বিপদে মুসা থাকলে অনেক সাহায্য করতে পারত।

'থামো, কিশোর,' নিচু গলায় কথা বলে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ, 'আমি রবিন।'

'রবিন!' স্তব্ধ হয়ে গেল যেন কিশোর। ওই ভূতুড়ে আলোয় এখনও অপরিচিত লাগছে রবিনকে।

'হ্যা। চিনতে পারছ না তো?' হেসে উঠল সে। 'এই পোশাকটা পরতে বলা হয়েছে আমাকে। এই যে ইনি,' পাশের মানুষটাকে দেখাল সে, 'মিস্টার পরভি।'

'এই অবস্থা কেন?'

'মিস্টার পারভি বললেন, 'চলো, নাচে যোগ দিই। মনে হলো, দিয়েই দেখি না কেমন লাগে। তাছাড়া দেখলাম তুমি ঢুকলে, তাই রাজি হয়ে গেলাম।'

কিছুটা কৈফিয়তের সুরেই পারভি বললেন, 'আমি ভাবলাম, এখানে ঢুকলে হয়তো পিটার রেমনের কথা কিছু জানতে পারব।'

'পাগল! এই খেপাগুলোর মধ্যে ঢুকে পিটারের কথা?' মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'চলুন, পালাই এখান থেকে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যাব।'

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যেন নর্তকরা। ওদের শ্লোক বলা এখন চিৎকারে রূপ নিয়েছে। শরীর মোচড়ানো বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে।

চক্র থেকে সরে গিয়ে পোশাক খুলছে রবিন আর পারভি, এই সময় গামুকে আসতে দেখল কিশোর। ওদেরকে ইশারায় সঙ্গে যেতে বলল বুড়ো, তারপর চক্রের পাশ দিয়ে এগোল। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল চক্রের কাছ থেকে।

মাতাল হয়ে গেছে যেন নর্তকেরা, কোন দিকে খেয়াল নেই, এমনকি কিশোরের

দিকেও না। এইই সুযোগ। চট করে একটা ফাঁক গলে বেরিয়ে পড়ল সে। দ্রুত হেঁটে চলে এল রবিন আর পারভির কাছে। দেরি করল না ওরা। গামুর পেছন পেছন চলল।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক পাথরের চাঙড়। সেটা সরাতে কিশোদেরকে অনুরোধ করল গামু।

ঠেলতে লাগল ওরা। বেজায় ভারি। অনেক কসরৎ করে পাথরটা সরাতে একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল ওরা।

হামাগুড়ি দিয়েই পৌছল একটা সিঁড়ির গোড়ায়। যেটা দিয়ে নেমেছিল সেটা নয়, আরেকটা। তাড়াহুড়া করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, দোকানের ভেতর। নিচের অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, ফলে চোখের সামনে হাত নিয়ে এসে আলো সওয়ানোর চেষ্টা করতে হলো।

কি নিয়ে যেন আলোচনা শুরু করল দুই ব্র্যাজিলিয়ান। রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর, সরে এল একপাশে যাতে পারভি ওদের কথা শুনতে না পারেন।

'বাঁচলাম, বুঝলে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে নরক থেকে বেরোলাম।'

'আমার কিন্তু মজাই লাগল,' হেসে বলল রবিন। 'তবে কয়েকটা ব্যাপারে কেমন যেন খটকা লাগছে। কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছি না। আমরা এখানে আসার পর থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। বেখাপ্পা।'

'এর একটাই মানে,' রবিনের কথা সমর্থন করে কিশোর বলল, 'আমাদের পেছনে লেগেছে কেউ। ডেংগু পারভিকেও এখন সন্দেহ হচ্ছে। আমাদের ব্যাপারে তাঁর এত আগ্রহ কেন?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে না। কিছু কিছু লোক থাকেই ওরকম, গায়ে পড়ে এসে সাহায্য করতে চায়।'

'তা থাকে। তবে এই লোকটাকে সেরকম লাগছে না। এরকম একটা জায়গায় আনতে গেল কেন আমাদের? ভুডুতে যে সে-ও বিশ্বাস করে না বোঝাই তো গেল।'

'হতে পারে অনুষ্ঠানটা দেখাতেই নিয়ে এসেছে আমাদের। বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা মজা পাব ভেবে।'

'আরও অনেক প্রশ্ন আছে, বুঝলে। একেবারে ঠিক সময়ে এসে হোটেলের ঘরে হাজির হয়ে যাওয়াটাও রহস্যময়। বলল, দরজা খোলা পেয়েছে। কিন্তু পারভি ঢোকার আগে আমি বেরোনোর চেষ্টা করেছিলাম। আটকানো ছিল। কিছুতেই খুলতে পারিনি। আমরা ঢোকার পর পরই তালা লাগিয়ে দিয়েছিল কেউ।'

'মানে?'

কিশোরের মনে পড়ল, রবিন অনেক কিছুই জানে না, বেহুঁশ হয়ে ছিল সে। হোটেলের ঘরে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল। 'ডাক্তারের জন্যে ফোন করলাম, কেউ ধরল না। কিন্তু পারভি করতেই সাথে সাথে ধরল।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। অন্য ফোন নিয়ে হয়তো ব্যস্ত ছিল তখন ক্লার্ক।'

'তাহলে তালা লাগানোর ব্যাপারটাকে কি বলবে?'

'আটকে গিয়েছিল হয়তো।'

'তারপর বেলবয় ঢুকল, তাকে তো কেউ ডাকেনি? বড় বেশি কাকতালীয় হয়ে

যাচ্ছে না?'

'কাজ ছিল বলেই ঢুকেছিল। একটা ট্রে আর দুটো গেলাস দেখেছিলাম ড্রেসারের ওপর। ওগুলো নিয়ে যেতেও আসতে পারে।'

আরেকবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তা পারে। তবে প্রতিটি ঘটনা সন্দেহজনক...'

হাত তুলে ওদেরকে ডাকলেন এই সময় পারভি। ওরা কাছে গেলে বললেন, 'পিটারকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে আন্দাজ করেছে গামু। দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছে আমাজন ধরে ম্যানাউয়ের দিকে চলেছে তোমাদের বন্ধু।'

'ম্যানাউ?' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর।

'হ্যাঁ। এখান থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে নিগ্রো নদীটা যেখানে আমাজনের সাথে মিলেছে সেখানকার একটা বন্দরের নাম ম্যানাউ।'

'ফালতু কথা!' রবিনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

ওরা যে বিশ্বাস করছে না আঁচ করতে পারল গামু। হেসে কিছু বলল।

পারভি অনুবাদ করে দিলেন, 'গামু বলছে ওর দিব্যচক্ষে দেখার ক্ষমতার ওপর আমাদের আস্থা রাখা উচিত। নইলে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে পিটারের। ওকে পেতে চাইলে ম্যানাউতেই যেতে হবে তোমাদের।'

'ঠিক আছে, ভেবে দেখব,' দায়সারা জবাব দিল কিশোর। 'যদি যাইই...'

পেছনে একটা খসখস শব্দে বাধা পড়ল তার কথায়। রোমশ কয়েকটা আঙুল পর্দা সরাল, তারই শব্দ। অনেকটা মানুষের মুখের মতই দেখতে একটা মুখ উঁকি দিল ফাঁকে। কিশোর আর রবিন দেখল, একটা হাউলার মাংকি, চকচকে কালো রোম, কুৎসিত চেহারা, মুখভঙ্গি ভয়ংকর।

এক পলকের জন্যে বানরটার মুখ দেখতে পেল দু'জনে। পরক্ষণেই পর্দার আড়ালে সরে গেল ওটা।

'আপনার পোষা বানর, তাই না?' গামুকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

অনুবাদ করে গামুকে শোনালেন পারভি। গোয়েন্দাদেরকে অবাক করে দিয়ে রেগে গেল বুড়ো। জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। গড়গড় করে কিছু পর্তুগীজ শব্দ উগড়ে দিল যেন।

পারভি জানালেন, 'সে বলছে পোষা তো দূরের কথা তার দোকানের কাছাকাছিই কোন বানর নেই।'

'কিন্তু আমরা যে দেখলাম?' কিশোরের প্রশ্ন।

'গামু বলছে ওটা তোমাদের চোখের ভুল।'

'ওর দিব্যচক্ষের মতই,' রেগে গেল রবিন।

হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দেয়ার জন্যেই যেন পারভি বললেন, 'হবে হয়তো। যা বললে একথাটা গামুকে বলা যাবে না, রেগে গিয়ে কি করে বসে কে জানে। ওঝাদের মেজাজ-মর্জি এমনিতেই ভাল থাকে না, আর বেলিমের এরা তো সব চেয়ে বদমেজাজী।'

'আপনি ভয় করছেন গামু আমাদের অভিশাপ দেবে?'

কথা বাড়ানোর মধ্যে গেল না আর কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের

এখন হোটেলে ফেরা উচিত।'

বাধা দিলেন পারভি, 'না, ওখানে আর যেয়ো না তোমরা। কিছু মনে না করলে আমার বাড়িতেই চলো। নিজের বাড়ি মনে করেই থাকতে পারবে যতদিন বেলিমে থাকবে।'

কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তেমন প্রয়োজন পড়লে নিশ্চয় যাব। তবে এখনও কোন অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া হোটেলে থাকলে শহরের একেবারে মাঝখানে থাকতে পারব, আমাদের বন্ধুকে খুঁজতে সুবিধে হবে।'

'ঠিক,' কিশোরের সঙ্গে সুর মেলাল রবিন।

পারভি আর গামুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। হোটেলে ফিরে এল। ডেস্ক ক্লার্ক বলল, 'পিটার রেমন ফিরে এসেছে।'

'এখানেই আছে?' উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না। জ্যাকেটটা নিয়ে আবার চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে ঠিকানা দিয়ে গেছে এবার?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বলল ম্যানাউতে যাবে। কিছুক্ষণ বসতে বলেছিলাম, বসল না। বলল তাড়াহুড়ো আছে। ম্যানাউতে কোথায় যাবে বলেনি।'

নিজেদের ঘরে উঠে এল দু'জনে। দরজা বন্ধ করেই রবিন বলে উঠল, 'কিশোর, গামু ঠিকই বলেছে। আশ্চর্য!'

কিশোর বলল, এর মধ্যে কোন রকম জালিয়াতি আছে। রবিন মানতে পারল না সে কথা। তর্ক শুরু করল। সে শুনেছে, ভুডু ওঝাদের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষ করে দিব্যচক্ষে দেখার ব্যাপারটা। তর্কের মধ্যে গেল না কিশোর, বরং কেসটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করতে বসল।

'আরেকটা রহস্য এসে এখন যোগ হয়েছে,' বলল সে, 'বানর রহস্য। ঠিক দেখেছ তুমি?'

'তাকিয়েই তো ছিলাম ওটার দিকে। দেখব না কেন?'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। বাতাস দিয়ে গাল ফুলিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়ল। 'পারভি আমাদের বোকা বানাতে চেয়েছে।'

'ওই লোকটাকে নিয়ে অহেতুক ভাবছ তুমি। লোক খারাপ বলে মনে হয় না আমার। আচ্ছা, আরেক কাজ করলেই তো পারি আমরা। মিস্টার সাইমনকে বলতে পারি। লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্রাজিলিয়ান এমব্যাসিতে গিয়ে ডেংগু পারভির ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে আমাদের জানাবেন। সন্দেহজনক কিছু থাকলে বেরিয়ে পড়বে।'

'ঠিক বলেছ। আজই কেবল পাঠাব।'

'ম্যানাউয়ের ব্যাপারে কি ঠিক করলে?'

'ওটাই এখন আমাদের একমাত্র সূত্র। যাওয়াই উচিত। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের। একটা কেবল লিখে ফেলো না।'

ক্লার্ককে ফোন করে একটা কেবলগ্রামের ফর্ম আনাল রবিন। লিখতে বসলঃ ডেংগু পারভির খবর জানতে চাই। ব্র্যাজিল এমব্যাসিতে খোঁজ করুন, প্লীজ। আমরা ম্যানাউ যাচ্ছি পিটারকে খুঁজতে। রবিন।

কেবলটা কিশোরও পড়ে ও-কে করে দিল। রবিন বলল, 'এখনই পোস্ট করে দিয়ে আসি। সব কিছুতে যে রকম সন্দেহ দেখা যাচ্ছে, বেলবয়কেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'এখনই যেতে চাও? বেশ, চলো। খিদেও পেয়েছে।'

হোটেলের কাছেই একটা ছোট রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে নিল ওরা। তারপর গিয়ে কেবলটা পোস্ট করে দিয়ে এল। ঘরে এয়ারকুলার নেই। আগুন হয়ে আছে যেন ঘর, এত গরম।

জানালা-দরজা সব বন্ধ। জানালার দিকে এগোতে এগোতে কিশোর বলল, 'খুলে রাখা উচিত। নইলে শ্বাস নিতে পারব না।'

শাওয়ারের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শরীর কিছুটা শীতল করে এল ওরা। শোয়ার আগে বিছানার পাশের টেবিলটায় একটা টর্চ রেখে দিল কিশোর, রাতে জরুরী দরকার পড়লে ব্যবহারের জন্যে। যা অবস্থা এখানে, বিদ্যুতের ওপরও পুরো ভরসা রাখতে পারছে না।

গরমে গভীর ঘুম হলো না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেই থাকল ওরা। ঘামে ভিজে যাচ্ছে চাদর। হঠাৎ পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে অদ্ভুত শব্দ। ওদের খুলে রাখা কাপড়ের ওপর একটা মূর্তিকে ঝুঁকতে দেখতে পেল আবছা ভাবে।

'চোর!' রবিন ভাবল।

আস্তে করে টর্চের জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। তুলে নিয়ে মূর্তিটার দিকে করেই সুইচ টিপে দিল। চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ওরই একটা শার্ট হাতে তুলে নিয়েছে বানরটা। কুৎসিত নাকটা কুঁচকে ফেলেছে, উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে প্রায় বুজে গেছে চোখের পাতা। ভেঙচি কাটছে। বেরিয়ে পড়েছে মারাত্মক শ্বদন্ত।

আট

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে বানরটাকে ধরতে ছুটে গেল দু'জনে। রোমশ একটা পা চেপে ধরল রবিন, ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল বানরটা। লাফিয়ে সরে গেল। জানালার কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকাল, তারপর প্রায় ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

জানালার কাছে ছুটে গেল কিশোর আর রবিন। দেখল, ফায়ার এসকেপ বেয়ে স্বচ্ছন্দে নেমে যাচ্ছে বানরটা। লেজটাকেও হাতের মত ব্যবহার করছে। কিছুদূর নেমে ফায়ার এসকেপ থেকে সরে গিয়ে কার্নিসের একটা কোণা ধরে ফেলল, তারপর জানালার পাল্লা ধরে ধরে সহজেই নিচে নেমে ছুটে চলে গেল হোটেলের কোণের দিকে।

'জঘন্য চেহারা,' গলা কাঁপছে রবিনের। 'তুমি সাক্ষি না থাকলে বিশ্বাসই করতাম না আমি। ভাবতাম, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'একেবারেই বাস্তব।' খুলে রাখা কাপড়গুলো দেখতে লাগল কিশোর কিছু খোয়া গেছে কিনা। দেখে হতাশ ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালাল। 'সব গেছে। টাকার ব্যাগ,

চাবির রিঙ, পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র।'

তাড়াতাড়ি এসে নিজের শার্ট-প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। 'গেছে! আমারগুলোও নেই!'

বিছানায় বসল কিশোর। 'রবিন, সাংঘাতিক চোর ওই বানরটা। মানুষ অত সহজে কাজটা করতে পারত না।'

'হয়তো কোন মানুষ চোরেই বানরটাকে দিয়ে ওকাজ করিয়েছে।'

'আমিও সে কথাই ভাবছি।'

চুপ হয়ে গেল দু'জনে। কতটা বিপদে পড়েছে আন্দাজ করতে পারছে।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা। টাকা নেই, পাসপোর্ট নেই, কিচ্ছু নেই। কি করব?'

'আমেরিকান কনসুলেটের কাছে যাব। তারপর পারভিকে ফোন করে আমাদের দুরবস্থার কথা জানাব। আসলে, ওর কাছাকাছি থেকে দেখতে চাই এসবে জড়িত আছে কিনা সে। খোলাখুলি সব জানালে ভাববে আমরা ওকে সন্দেহ করছি না, ভুল করে বসতে পারে, আর তাহলেই সূত্র পেয়ে যাব আমরা।'

'এই পরিস্থিতিতেও কেসের কথা ভাবছ!'

'এসেছি যে কাজে তার কথা না ভেবে কি করব?'

সকাল ন'টায় ডেস্কে ফোন করে ডেংগু পারভির সঙ্গে লাইন দেয়ার অনুরোধ করল কিশোর। কয়েক সেকেণ্ড পর রিসিভারে ভেসে এল ব্র্যাজিলিয়ানের কণ্ঠস্বর। চুরির খবর জানাল কিশোর।

'কোন চিন্তা নেই,' অভয় দিলেন পারভি। 'চলে এসো আমার এখানে। ট্যাক্সি নিয়ে আসবে, ভাড়ার কথা ভেব না। এখানে নাস্তা খাবে। চাকরকে সব নির্দেশ দিয়ে রাখছি আমি।'

আমন্ত্রণ রক্ষা না করে উপায় নেই। পারভির ওখানে যেতেই হবে, তবে তার আগে কনসুলেটের ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। এমব্যাসির একজন কর্মচারী ওদেরকে কিছু টাকা ধার দিলেন, টাকার জন্যে বাড়িতে কেবল করার ব্যবস্থা করলেন, আর কাগজপত্রও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করে দেয়ার ব্যাপারে কথা দিলেন।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার এসে ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল বেলিমের শহরতলীতে, পারভির বাড়িতে। বিশাল রেসিডেনশিয়াল এলাকা। অনেক বড় বড় বাড়ি, ছড়ানো লন। অনেক বাড়িতেই দেখা গেল মেয়েরা বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছে কিংবা জানালার কাচ মুছছে। বাগানে কাজ করছে মালীরা।

'সুন্দর এলাকা।' রবিন মন্তব্য করল, 'এরকম দেশেও ধনীদের কোন কষ্ট নেই, আরামে আছে। ধনীরা সব জায়গায়ই আরামে থাকে।'

সব চেয়ে সুন্দর বাড়িগুলোর একটা পারভির বাড়ি। লোহার বিরাট গেটের ওপাশ থেকে চলে গেছে লম্বা পথ। দু'ধারে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফুলের বাগান। ঝলমলে রঙ। মস্ত একটা বাড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। দরজা খুলে দিল চাকর। পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলল বাড়ির পেছন দিকে।

বড় একটা সুইমিং পুলের পাশে চেয়ারে বসে আছেন পারভি। পুলের কয়েক ফুট দূর থেকে তিন দিকেই রয়েছে ঘন ঝোপঝাড়, একটা পাশ অর্থাৎ বাড়ির দিকটা কেবল খোলা।

উঠে দাঁড়ালেন পারভি। 'তোমরা এসেছ, খুব খুশি হয়েছি।' হাত নেড়ে দুটো চেয়ার দেখিয়ে ওদেরকে বসতে ইশারা করলেন তিনি।

কিশোর লক্ষ করল, পুলের পশ্চিম ধারে পাতা হয়েছে টেবিলটা। রোদ লাগে। সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসল সে আর রবিন।

আরেকজন চাকর নাস্তা নিয়ে এল। অনেক বেলা হয়েছে। খিদেও পেয়েছে দু'জনের। প্রায় গপগপ করে খেতে শুরু করল। খেতে খেতেই চুরির ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা চলল। ফোনে সব বলা যায়নি পারভিকে, শুনে এখন তাজ্জব হয়ে গেলেন তিনি। ন্যাপকিনটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিলেন। 'এখুনি পুলিশকে জানাচ্ছি সব।'

'আমরা যাব আপনার সাথে।'

'দরকার নেই। তোমরা থাকো। বিশ্রাম করো। ইচ্ছে হলে পুলেও নামতে পারো। খালি গায়ে নামতে না চাও, স্যুট পরে নেবে। সব আছে বাড়িতে।'

ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হাঁটতে শুরু করলেন পারভি। কাছেই পার্ক করে রাখা হালকা নীল রঙের একটা স্পোর্টস কারে উঠে চলে গেলেন।

রোদের মধ্যে অলস ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বসে রইল দুই গোয়েন্দা। ওরকম বসে থাকতে আর কত ভাল লাগে। শেষে রবিন বলল, 'এর চেয়ে পানিতে নামা ভাল। কি বলো?'

'এগুলো আগে সরানো দরকার,' টেবিলে রাখা খাবারগুলো দেখাল কিশোর। অনেক বেশি দেয়া হয়েছে। ওরা খাওয়ার পরেও প্রচুর রয়ে গেছে। 'নষ্ট করে লাভ নেই।'

বেল বাজিয়ে চাকরদের ডাকল সে। কয়েকবার বাজিয়েও কারও সাড়া না পেয়ে শেষে উঠে বাড়ির ভেতরে দেখতে গেল কি হয়েছে। শূন্য বাড়ি। কেউ নেই। বারান্দায় কিংবা সামনের বাগানেও কাউকে দেখা গেল না। রবিনও এসে দাঁড়াল তার পাশে। 'কি হয়েছে?'

'সব উধাও।'

'হয়তো ওদের ছুটি হয়ে গেছে। একবেলাই কাজ করে দিয়ে যায়। অত কথা না ভেবে চলো পানিতে নামি।'

'ওরকম একবেলা কাজ করে চলে যাবে? হতেই পারে না। যারা ঠিকা কাজ করে তারাও দিন শেষ হওয়ার আগে ছুটি পায় না।' অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'ডেংগু পারভি কোন একটা খেলা খেলছে।'

'সেটা কী জানতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাদের।'

ঘরে এসে ঢুকল দু'জনে। সাঁতারের পোশাক খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। একটা নিয়ে পরে ফেলল রবিন। কিশোরও পরতে লাগল আরেকটা। চিন্তিত। চাকরদের উধাও হওয়া নিয়ে ভাবছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল রোদ বেড়েছে। সুইমিং পুলের পানিতে যেন ঠিকরে এসে চোখে লাগছে রোদের উজ্জ্বল ঝিলিক।

ডাইভিং বোর্ডে উঠে পেছন করে দাঁড়াল রবিন, উল্টো করে ডাইভ দেয়ার জন্যে।

রোদ বাঁচাতে কপালের ওপর হাত নিয়ে এসেছে কিশোর। পানির দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। কানে এসে যেন বাড়ি মারল মেরিচাচীর বহুবার বলা একটা হুঁশিয়ারিঃ যে-কোন কিছুতে ঝাঁপ দেয়ার আগে ভাল করে দেখে নেবে।

দ্রুত পুলের কিনারে চলে এল সে। নুয়ে তাকিয়ে দেখল ছোট একটা মাছ, বড় জোর আট ইঞ্চি লম্বা। মুখটা ভোঁতা, বিশাল চোয়াল, হাঁ করলে অনেকখানি ঝুলে যায়, নীলচে রূপালি শরীর, পাখনায় লালের ছোঁয়া।

চিৎকার করে উঠল সে, 'রবিন, খবরদার, থামো!'

আর একটা মুহূর্ত দেরি হলেই লাফ দিয়ে ফেলেছিল রবিন। সামলাতে অনেক কসরৎ করতে হলো। ঝুঁকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'নেমে এসো। দেখে যাও।'

ডাইভিং বোর্ড থেকে নামল রবিন। কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকাল পানির দিকে।

একটা নয়, অনেকগুলো মাছ দেখা গেল। ধক করে উঠল রবিনের বুক। 'কিশোর, পিরানহার মত লাগছে!'

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। আনমনে মাথা নাড়ল শুধু।

'দাঁড়াও, দেখছি,' বলে টেবিলের কাছে চলে গেল রবিন। মাংসের প্লেটটা নিয়ে এল। একটুকরো মাংস তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পানিতে। পানি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে টুকরোটাকে ছেঁকে ধরল মাছের ঝাঁক। নিমেষে নেই হয়ে গেল ওটা, যেন ছিলই না কখনও।

কেঁপে উঠল রবিন।

পিরানহাই! সময়মত কিশোরের চোখে না পড়লে এতক্ষণে কি দশা হত তার ভেবে হাত-পা অসাড় হয়ে আসতে চাইল।

'মালিক সহ গোলামেরা কেন গায়েব হয়ে গেছে বুঝতে পারছি এখন,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'আমাদেরকে খুন করার প্ল্যান করেছিল ওরা। একই সাথে লাশ লুকানোরও ব্যবস্থা। হাড়গুলো কেবল পড়ে থাকত পুলের তলায়। কেউ কোন দিন খুঁজে পেত না আমাদের। তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার, এত ছায়া থাকতে রোদের মধ্যে টেবিল পেতেছে কেন? নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কারণটা হলো, রোদ দেখলে সেদিকে পিঠ দিয়ে বসব আমরা, সুইমিং পুলের দিকে নজর পড়বে না। আর যদি রোদের দিকে মুখ করে বসি সূর্যের জন্যে পানিতে মাছ দেখতে পাব না।'

পুলের কিনারেই বসে পড়ল রবিন। যেন জোর নেই গায়ে। 'আমার অসুস্থ লাগছে!'

'দাঁড়াও, ওরা যেমন শয়তানী করতে চেয়েছে, আমরাও একটা করি,' বলেই বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর। ফিরে চেয়ে দেখল বসেই আছে রবিন। ডাকল, 'কই, এসো।'

রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলল সে। শুয়োর আর ভেড়ার মাংসে বোঝাই। 'নিশ্চয় পার্টিটার্টির কথা ভাবছে আমাদের প্রিয় ডেংগু পারভি। শিক্ষা দেব একটা। রবিন,

ধরো, একা পারব না আমি।'

ট্রেতে করে মাংসগুলো নিয়ে পুলের পাড়ে চলে এল দু'জনে। পানিতে ছুঁড়ে ফেলল সব। 'করুক,' কিশোর বলল, 'পিরানহারাই পার্টি করুক।'

অনেক মাংস। আস্ত শুয়োর আর ভেড়াকে কয়েক টুকরো করে কেটে ভরে রাখা হয়েছিল ফ্রিজে। হাড়সহই রয়েছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল পিরানহার ঝাঁক। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল যেন পানি। পিরানহারা হাঙরের মত মাংস ছিঁড়ে খায় না, ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে আলগোছে কেটে নিয়ে গিলে ফেলে। ভয়ংকর দৃশ্য। শিউরে উঠল দু'জনেই। কল্পনায় দেখতে পেল, ওদের ওপরই চড়াও হয়েছে ভয়াবহ জীবগুলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এত মাংস সব সাফ করে ফেলল রাক্ষুসে মাছের দল। ঝকঝকে হাড়গুলো কেবল পড়ে থাকল পুলের তলায়।

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। উবু হয়ে বসে পাতা ফাঁক করে তাকাল দু'জনে। সাবধানে পুলের দিকে হেঁটে আসছে দুই চাকর।

কিনারে দাঁড়িয়ে একজন হেসে উঠে হাত তুলে দেখাল পানিতে। যেন এক মস্ত রসিকতা। হহ্ হহ্ করে হাসল আরেকজন।

'ব্যাটারা ভাবছে,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন, 'আমাদের হাড়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বেশিক্ষণ ভাববে না। ওরা বুঝে ফেলার আগেই পালাতে হবে। এসো।'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে কয়েক কদম এগোতে না এগোতেই শেকড়ে পা বেধে দড়াম করে পড়ে গেল রবিন। থমকে দাঁড়াল কিশোর। ওকে উঠতে সাহায্য করল। কিন্তু শব্দটা শুনে ফেলেছে চাকরেরা। ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল।

ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা, পেছনের বেড়ার দিকে। পৌঁছে দেখল, তাড়াহুড়ো করে ওই বেড়া বেয়ে উঠে ডিঙানো অসম্ভব, তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। বেরোনোর উপায় খুঁজতে লাগল এদিক-ওদিক তাকিয়ে। একটা গাছ দেখতে পেল, বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা ডাল বেরিয়ে গেছে বেড়ার ওপর দিয়ে। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না সে, গাছ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

ছুটে আসছে লোকগুলো। দেখে ফেলল গোয়েন্দাদেরকে। চেঁচামেচি শুরু করল। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল আরও।

ডালের ওপর উঠে বসেছে। লাফিয়ে বেড়ার বাইরে পড়তে পারবে এখন। নিচে তাকাল। রবিনও উঠছে। পৌঁছে গেছে লোকগুলো। একজন হাত বাড়িয়ে দিল রবিনের পা ধরার জন্যে। ফসকে গেল অল্পের জন্যে।

লাফিয়ে নামল কিশোর। তার পর পরই লাফ দিল রবিন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'ব্যাটারা ছাড়বে না! ধরতে আসবে আমাদের!'

একটা গলিতে পড়েছে ওরা। দৌড় দিল মোড়ের দিকে। একেবারেই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মোড় ঘুরতেই একটা বাড়ি চোখে পড়ল। সেদিকে হাত তুলে কিশোর বলল,

'ওটাতে ঢুকব।'

গেটের কাছে সাইনবোর্ড লেখা রয়েছেঃ বিবোলায়োটেকা।

'লাইব্রেরি,' বলল কিশোর। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা খেয়ালই নেই। ফিরেও তাকাল না। সোজা ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে এতক্ষণে চোখ পড়ল পোশাকের ওপর। বলল, 'হায় হায়, এ কি পরে এলাম!'

রিসিপশন ডেস্কে বসে রয়েছে কালো চুলওয়ালা সুন্দরী এক মেয়ে। সুইম স্যুট পরা দুই গোয়েন্দার ওপর নজর পড়তেই বড় বড় হয়ে গেল চোখ। অনেকেই বসে বই আর খবরের কাগজ পড়ছে, একে একে তাদের চোখগুলোও ঘুরে গেল ওদের দিকে।

মেয়েটার কাছে গিয়ে কিশোর বলল, 'বিপদে পড়েছি আমরা, সেজন্যেই এই পোশাকে পালিয়েছি। সাহায্য করবে? আমরা বিদেশী।'

ভাঙা ইংরেজিতে মেয়েটা বলল, 'দাঁড়াও। পুলিশকে খবর দিচ্ছি।'

বইয়ের তাকের একপাশে চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসল দুই গোয়েন্দা, এই পরিবেশে সুইম স্যুট পরে সহজ হতে পারছে না। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশ এল। দু'জনকে গাড়িতে করে নিয়ে গেল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। পুলিশের চীফ, ক্যাপ্টেন ভ্যাকোয়ারো ইংরেজি ভালই বলতে পারেন।

যা যা ঘটেছে বলে গেল দুই গোয়েন্দা। কয়েকজন পুলিশ ঘিরে বসেছে ওদেরকে। তাদের মাঝে যারা ইংরেজি জানে, তারা ওদের গল্প শুনে থেকে থেকে অবিশ্বাসী হাসি হাসল। শেষমেষ হো হো করে হেসে উঠল একজন লেফটেন্যান্ট, 'আমেরিকানরা রসিকতা খুব পছন্দ করে।'

'ডেংগু পারভি কখনও ওরকম করতে পারে না,' চীফ বললেন। 'তিনি একজন ভাল লোক। সম্মানিত লোক।'

'তাহলে কাউকে পাঠান,' রাগ করে বলল কিশোর, 'সুইমিং পুলটা গিয়ে দেখে আসুক।'

থমকে গেলেন চীফ। ভুরু কোঁচকালেন। ভাবলেন। কথাটা পছন্দ হলো তাঁর। তদন্ত করে আসার জন্যে লোক পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে দু'জন অফিসার জানাল, পারভির পুলে পিরানহার চিহ্নও নেই।

হাঁ হয়ে গেল গোয়েন্দারা। ধসে পড়ল যেন কিশোর। 'নিশ্চয় মাছ আর হাড়গুলো সরিয়ে ফেলেছে চাকরেরা!' গলায় জোর নেই তার। কিংবা দুই অফিসার ঘুষ খেয়েছে। তবে একথা আর বলল না।

ধমক দিয়ে চীফ বললেন, 'বিদেশী বলে এবার ছেড়ে দিলাম। খবরদার, পুলিশের সাথে আর মজা করতে আসবে না। ওই স্যুটগুলো খোলো, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কয়েদীদের ফেলে যাওয়া জামাকাপড়ে দেখি তোমাদের মাপের কিছু মেলে কিনা।'

কিছুই করার নেই আর, বলার নেই। চুপ করে বসে রইল দুই গোয়েন্দা। কাপড় পাওয়া গেল। সেগুলো পরে বেরিয়ে এল থানা থেকে। হোটেলে ফিরে চলল।

গ্রাও পারা হোটেলের লবিতে ঢুকেই রবিনের হাত আঁকড়ে ধরল কিশোর।

ফিসফিস করে বলল, 'ডেস্কের কাছে দেখো, ও কে!'

'ডেংগু পারভি!'

সাংঘাতিক রেগে গেছেন ব্র্যাজিলিয়ান জানোয়ার ব্যবসায়ী। মুখ লাল, রীতিমত কাঁপছেন। টেবিলে কিল মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কোন কথা শুনতে চাই না আমি! জলদি বলো, ছেলেদুটো কোথায়?'

'স্যার, সত্যি বলছি,' মিনমিন করে বলল ক্লার্ক, 'আমি জানি না।'

হাত বাড়িয়ে কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে চেয়ার থেকে তুলে ফেললেন পারভি, 'কোথায় গেছে? কোনখানে গেলে পাব? নিশ্চয় ওদের কাছ থেকেও টাকা খেয়েছ!'

'বিশ্বাস করুন স্যার, আমি জানি না...,' কথা আটকে গেল বেচারা ক্লার্কের।

লোকটাকে চেয়ারে আবার প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরলেন পারভি।

চট করে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ভাবছে, দেখে ফেলেনি তো ওদেরকে খুনে লোকটা?

নয়

না, দেখেনি। পারভি তাকিয়েছে দরজায় দাঁড়ানো একজন লোকের দিকে। হাত নেড়ে তাকে দাঁড়াতে বলে আরও কিছুক্ষণ ধমক-ধামক দিল ক্লার্ককে। তারপর যখন বুঝল লোকটা সত্যিই কিছু জানে না তখন ঘুরে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। দাঁড়ানো লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

কপালের ঘাম মুছে কিশোর বলল, 'আরেকটু হলেই দেখে ফেলেছিল।'

'চলো, পালাই। ক্লার্ক দেখলেও বিপদে পড়ব।'

'হ্যাঁ। আমাদের স্যুটকেসগুলো নিতে হবে।'

'ঘরে ঢুকব কি করে? চাবি চাইতে গেলেই তো...'

'তাই তো!' গাল চুলকাল রবিন। নিজেদের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারছে। টাকা নেই পয়সা নেই, ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই, পরনের কাপড়গুলোও অন্যের। 'কি করব তাহলে এখন?'

'কয়েক ব্লক দূরে রাস্তার মাথায় একটা পার্ক দেখেছি। ওখানেই গিয়ে বসে থাকব। ওখানে খোঁজার কথা ভাববে না পারভি। বাড়ি থেকে টাকা না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে কোনমতে কাটাতে হবে।'

একটা লোকও দেখা গেল না পার্কে। এই সময়ে হয়তো সবাই ব্যস্ত থাকে, এখানে আসার সময় পায় না, কিংবা আসার কথা ভাবেই না। ভালই হলো ওদের জন্যে। ছড়ানো ডালপাতাওয়ালা একটা গাছের নিচে বেঞ্চে আরাম করে বসল। কাছাকাছি শোনার কেউ নেই, তাই কথা বলতেও অসুবিধে নেই।

'একা একা এত কিছু করতে পারবে না পারভি,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় অনেক লোকজন আছে, দল আছে। সে হলো দলের সর্দার।'

একমত হলো কিশোর। 'আর সেই দলটা পিটারকে কিডন্যাপ করেছে, ব্যাংক

থেকে তোলা তার টাকাগুলো কেড়ে নিয়েছে, এখন তার বাবার কাছ থেকে আরও টাকা আদায়ের জন্যে তাকে আটকে রেখেছে।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, এর মধ্যে ম্যানাউটা আসছে কোত্থেকে? নিশ্চয় আমাদেরকে বেলিম থেকে সরাতে চেয়েছিল। গিয়ে খামোকা খোঁজাখুঁজি করে মরতাম আমরা।'

'কিংবা সত্যিই হয়তো পিটারকে ম্যানাউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, আমাদের যাওয়াই উচিত। মিস্টার রেমন বলেছেন না, দুনিয়ার যেখানেই থাকুক আমার ছেলেকে খুঁজে বের করো তোমরা।'

'তা বটে।'

'কিন্তু যাব কি করে? বোট ভাড়া করে গেলে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। এতদিন নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না কিডন্যাপাররা।'

'প্লেনে যেতে হবে।'

'এয়ারপোর্টের ওপর নিশ্চয় নজর থাকবে পারভির। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না দেখাতে পারলে বিদেশীদের কাছে কেউ প্লেন ভাড়া দিতেও রাজি হবে না।'

'কনসুলেটের কাছে যাওয়া দরকার। তাঁর কাছে পরামর্শ পাওয়া যাবে। এমনিতেও ওখানে যেতে হবে আমাদের, টাকা এল কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে। এতক্ষণে চলে আসার কথা।'

'তাহলে আর বসে আছি কেন?'

রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। আমেরিকান কনসুলেট বেশি দূরে না, হেঁটেই পৌঁছতে পারবে।

অফিসে ঢুকতেই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ওদেরকে যিনি সাহায্য করেছিলেন। দেখেই হেসে বললেন, 'এসেছ। টাকা এসে গেছে। তোমাদের আগের পাসপোর্ট ক্যানসেল করে দিয়েছি। শীঘ্রি নতুন কাগজপত্র পেয়ে যাবে।'

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর জানতে চাইল, ম্যানাউতে কিভাবে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, সুবিধে হবে। একটা ফোন করলেন তিনি। পর্তুগীজে কিছুক্ষণ কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। 'হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টে চলে যাও। কডি হোয়েরটা নামে একজন পাইলট তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। ছোট একটা প্লেন আছে ওর। ম্যানাউতে নিয়ে যাবে।'

ভদ্রলোককে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন।

টাকা পেয়ে গেছে, আর অসুবিধে নেই। ট্যাক্সি ডাকল ওরা। এয়ারপোর্টে পৌঁছে সহজেই খুঁজে বের করল পাইলটকে, কিংবা বলা যায় পাইলটই ওদেরকে চিনে নিল। তেইশ-চব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক, ভাল ইংরেজি বলতে পারে।

ওদের সঙ্গে হাত মেলাল কডি। কত টাকা লাগবে বলল। আগাম দিয়ে দিল কিশোর। উঠে বসল বিমানে।

শহরের ওপর একবার চক্কর দিয়ে আমাজনের উজানে উড়ে চলল বিমান। পেছনে দ্রুত হারিয়ে গেল পূর্ব উপকূল। নদীর দুই পাশে এখন ঘন জঙ্গল, ছড়ানো

বিশাল সবুজ কার্পেটের মত লাগছে। অসীম অনন্ত বনভূমি, যেন এর শেষ নেই।

বনের ভেতরে অগুনতি নদী আর খাল, এঁকেবেঁকে এসে পড়েছে মূল নদীতে।

উড়ে চলেছে বিমান, চলেছে তো চলেছেই, যেন দুনিয়ায় আর কিছুই নেই নিচের ওই সবুজ বন আর জালের মত বিছিয়ে থাকা নদী আর খাল ছাড়া।

পথে দুইবার দুই জায়গায় নামতে হলো বিমানটাকে, তেল নেয়ার জন্যে। ছেলেদের যখন মনে হতে লাগল ম্যানাউ আর আসবেই না তখনই দেখা গেল শহরটা।

নদীতে শত শত ক্যানু দেখা গেল। ফল আর শাকসব্জি বোঝাই করে বাজারে নিয়ে চলেছে স্থানীয় অধিবাসীরা। নানা জাতের নানা আকারের বাড়ি রয়েছে শহরটাতে। আদিবাসীদের কুঁড়ে থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিকদের বাংলো, এমনকি আধুনিক বহুতল অট্টালিকা, সবই আছে।

একটা বাড়ি তো চট করে চোখে পড়ে যায়। সাদা আর লাল মার্বেল পাথরে তৈরি। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'জঙ্গলগুলোর মধ্যে এই বাড়ি তৈরি করল কারা?'

'পুরানো অপেরা হাউস ওটা,' কডি বলল। 'রবার চাষীদের রমরমা ব্যবসা ছিল একসময় এখানে। ম্যানাউকে হেডকোয়ার্টার করেছিল তারা। সুখে থাকার জন্যে সব কিছু করেছিল এখানে, অপেরা হাউসও বানিয়েছিল।'

'তার পর থেকেই ব্যবসা খারাপ হতে আরম্ভ করেছিল ওদের, জানি,' কিশোর বলল।

'হয়েছে তার কারণ, ওদের রবারের মান খারাপ। ইস্ট ইণ্ডিজের রবার বাজারে আসতেই ব্র্যাজিলের রবারের দাম কমতে লাগল। পোটলাপাটলি গুছিয়ে একে একে কেটে পড়তে লাগল রবার চাষীরা। এখন তো ম্যানাউ একটা ভূতুড়ে শহর। আগের কিছুই নেই আর।'

'এখানকার লোকেরা তাহলে বাঁচে কি করে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'ট্যুরিস্ট ব্যবসা। ম্যানাউ একটা ফ্রী পোর্ট। এখানে ডিউটি ছাড়াই অনেক জিনিস কেনা যায়। সেই লোভেই বহু লোক এসে ভিড় করে এখানে। আমি তো যতবার এসেছি কোনবারেই মানুষ ছাড়া দেখিনি।'

এয়ারপোর্ট টাওয়ার থেকে রেডিওতে মেসেজ এলঃ নামার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করো। শহরের ওপরে চক্কর দিতে থাকল কডি। ফুয়েল গজ শো করছে তেল আর বেশি নেই, যে কোন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেতে পারে। এখনই নামতে না পারলে বিপদ হবে।

'এই দেরি করানোর মানে বুঝতে পারছি না,' উদ্বিগ্ন হয়ে কডি বলল। 'শেষে অনুমতি ছাড়াই না নামতে বাধ্য হই।'

'কিশোর,' বিড়বিড় করল রবিন, 'ডেংগু পারভিন্সের শয়তানী না তো?'

শূন্যের কোঠায় নেমে এল ফুয়েল গজের কাঁটা। তেল একেবারে শেষ। জোর করেই নামার জন্যে তৈরি হলো কডি। এই সময় কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে অনুমতি পাওয়া গেল।

অয়েল লাইন আর কারবুরেটরে যেটুকু তেল অবশিষ্ট রয়েছে সেটা দিয়েই

কোনমতে নামল কডি। রানওয়েতে দৌড়ে এসে বিমানটা থামার সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। হাত নেড়ে পাইলট বলল, 'আর এক ফোঁটা তেলও নেই।'

শেষ পর্যন্ত যে কোন বিপদে পড়তে হয়নি তাতেই খুশি ছেলেরা। পাইলটকে ধন্যবাদ আর গুডবাই জানিয়ে এয়ারপোর্টেরই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ট্যাক্সি নিল। একটা হোটেলে নিয়ে যেতে বলল। শহরের মাঝখানের একটা হোটেলে ওদেরকে নিয়ে চলল ড্রাইভার। ঘর ভাড়া দিয়ে, মালপত্র রেখে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরোল। হোটেলে হোটেলে খুঁজতে লাগল পিটারকে। কেউই কোন খোঁজ দিতে পারল না। হোটেলগুলো শেষ করে রুমিংহাউসগুলোর দিকে নজর দিল ওরা। সেদিন কোন কাজ হলো না। পরদিন গিয়ে একটা খবর পাওয়া গেল।

ছোট একটা রুমিংহাউসের মালিক হফম্যান নামে এক জার্মান জানাল, 'হ্যাঁ, পিটার রেমন ছিল এখানে। গতকাল কিছু না জানিয়ে চলে গেছে। ওর ঘরে একটা কাগজ পেয়েছি। দেখো তোমাদের কোন কাজে লাগে কিনা।'

কাগজের টুকরোটা হাতে নিল কিশোর। ময়লা, দোমড়ানো, দলামোচড়া করে গোল করে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল বোধহয়। দ্রুতহাতে লেখা রয়েছেঃ ম্যানাউ হারবারে আরজেনটাইন ফ্রেইটারের পাশে ছোট একটা বোটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। ওরা বলছে, আমাজনের আরও উজানে নিয়ে যাওয়া হবে। সাহায্য চাই। পিটার রেমন। তারিখ লেখা রয়েছে মে'র ৭ তারিখ।

হালকা শিস দিল রবিন। লেখাটা সে-ও পড়েছে। বলল, 'কিশোর, একটা মূল্যবান সূত্র।'

'একটা গোলমাল আছে,' কিশোর অতটা আশাবাদী হতে পারছে না।

'কি?'

'তারিখটা দেখো। সাতের পেট কাটা। ইউরোপিয়ানরা এরকম করে লেখে। আমেরিকানরা ভুলেও লেখে না। আরেকটা ব্যাপার। আজকে মে'র ৭ তারিখ। হফম্যান বলছে পিটার চলে গেছে গতকাল। তারমানে মিথ্যে বলেছে। পারডির দলেরই লোক সে। ওই ব্যাটা নিজেই নোটটা লিখেছে। ইউরোপিয়ান তো, ভুলে সাতের পেট কেটে দিয়েছে, খেয়াল করেনি। আমাদেরকে ভাঁওতা দেয়ার চেষ্টা করেছে।'

ওদের ইংরেজি বোধহয় বুঝতে পারছে না লোকটা। বোকার মত ওদের দিকে তার তাকিয়ে থাকা দেখেই অনুমান করা যায়।

রবিন বলল, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। ওদের চালাকির জবাব চালাকি দিয়েই দেব আমরাও। ওরা চাইছে, পিটারকে খোঁজার জন্যে ওদের বোটে গিয়ে উঠি আমরা। ধরে নিয়ে গিয়ে তখন আমাজনের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, চালান করে দেবে পিরানহার পেটে। আমরা বোটের মধ্যে যাব না, বাইরে থেকে ওদের আলোচনা শুনব।'

'লিসেনিং ডিভাইস?' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'ভাল কথা মনে করেছ। এখন এখানে ওই জিনিস পেলেই হয়।'

ওরা যে কিছুই সন্দেহ করেনি এটা বোঝানোর জন্যে হফম্যানকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। একটা দোকানে পেয়ে গেল যা খুঁজছে। গোটানো খানিকটা তারের একমাথায় একটা ইয়ারফোন লাগানো। আরেক মাথায় লাগানো রয়েছে একটা ধাতব গোলক। খুব মৃদু শব্দও ধরে ফেলতে পারে ওটা, শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার। যন্ত্রটার রেঞ্জও অনেক বেশি।

রাতের অপেক্ষায় রইল ওরা। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এগোল বন্দরের দিকে। নোঙর করে রাখা জাহাজ আর বোটের আলো যেন তালে তালে নাচছে। আসলে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে বোট, সেই সাথে আলোগুলোও ওঠা নামা করছে, দূর থেকে মনে হয় যেন আলোর সারির নাচ।

আরজেনটাইন ফ্রেইটার জাহাজটা অনেক বড়। বন্দরের একজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল। ওটার পাশে একটা ছোট বোট বাঁধা রয়েছে। কিশোর বলল, 'মনে হয় ওটাই।'

'দাও,' হাত বাড়াল রবিন, 'সেরে আসি।'

রিসিভার হাতে নিয়ে অন্ধকারে কয়েকটা বাক্সের আড়ালে বসল কিশোর। কাপড় খুলে নিঃশব্দে পানিতে নেমে গেল রবিন। সাঁতরে এগোল বোটের দিকে। বোটের কাছে পৌঁছে সাবধানে মাথা উঁচু করে তাকাল এদিক ওদিক। কেউ দেখছে কিনা দেখল। তারপর যন্ত্রটা লাগিয়ে দিল একটা পোর্টহোলে।

ডুবসাঁতার দিয়ে নিঃশব্দেই আবার ফিরে এল সে। কুকুরের মত গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরানোর চেষ্টা করল গা থেকে। কিশোরের পাশে বসতে বসতে বলল, 'লাগিয়ে দিয়ে এলাম।'

রিসিভারের সুইচ অন করে দিয়ে বসে আছে কিশোর। কোন কথা নেই বোটের ভেতরে। তবে কি লোক নেই?

গা শুকিয়ে নিয়ে জামাকাপড় পরছে রবিন, এই সময় নিচু গলায় কিশোর বলে উঠল, 'ওই যে, আসছে।'

ফিরে তাকাল রবিন। দু'জন লোককে দেখতে পেল, তক্তার সিঁড়ি বেয়ে বোটে নেমে যাচ্ছে। বন্দরের আবছা আলো পড়ল ওদের গায়ে, তাতেই চিনতে অসুবিধে হলো না, একজন ডেংগু পারভি, আরেকজন রুমিংহাউসের জার্মান মালিক হফম্যান।

ওদেরকে দেখে ছায়ার মত এসে ডেকে উদয় হলো তৃতীয় আরেকজন লোক। বোটেই ছিল এতক্ষণ, বোধহয় লুকিয়ে ছিল, রবিনকে যে দেখেনি এইই ভাগ্য।

তিনজনেই নিচে চলে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই জীবন্ত হয়ে উঠল কিশোরের হাতের রিসিভার।

ডেংগুর কণ্ঠ শোনা গেল, ইংরেজিতে বলছে, 'যা যা বলেছি সব মনে আছে তো?'

'আছে,' হফম্যান জবাব দিল।

'বলো তো শুনি, কি কি করতে হবে? ভুল করে বসলে সব ভেস্তে যাবে।'

'ভুল হবে না, সিনর পারভি। ছেলেদুটো বোটে উঠলেই ওদেরকে ধরতে হবে। নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে হবে নদীর এমন কোথাও যেখানে পিরানহা আছে, সাফ করে ফেলে।'

'হ্যাঁ। কোন ভুল যেন না হয়। পিয়েটো একা পারবে?'

কিশোররা বুঝতে পারল, তৃতীয় লোকটার কথা বলছে পারভি।

'পারবে না মানে? দু'হাতে দুটো জাগুয়ার ধরে আটকে রাখতে পারে সে, আর ওরা তো মানুষ, ছেলেমানুষ। তাছাড়া পিস্তল আছে ওর কাছে। তেমন বুঝলে গুলি করে মেরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে পিরানহার মুখে। লাশের চিহ্নও খুঁজে পাবে না কেউ।'

'বেশ,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল পারভি, 'ঠিকমত কাজ হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে। বাকি টাকা দিয়ে দেব। তবে আবারও বলছি; কোন ভুল যেন না হয়। এত কষ্ট করে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে শেষে...'

'হবে না, সিনর। বুদ্ধিটা ভালই করেছিলেন। এতদূরে ব্র্যাজিলে ওদেরকে টেনে এনে। যার খোঁজে এসেছে সে তো রয়ে গেছে তার জায়গায়, খামোকা বোকা ছেলেগুলো...হাহ্ হাহ্ হা!'

আর কোন কথা হলো না।

বোট থেকে বেরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল আবার পারভি আর হফম্যান।

রিসিভারের সুইচ অফ করে দিয়ে কিশোর বলল, 'হয়েছে, আর কিছু শোনার নেই। চলো।'

'যন্ত্রটা খুলে আনব বোট থেকে?'

'কোন দরকার নেই। সেধে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়া। থাক ওটা ওখানেই।'

দশ

'আর এখানে কিছু করার নেই আমাদের,' হোটেলে ফেরার পথে বলল কিশোর। 'পিটার নেই এখানে। বেলিমে ফিরে যেতে হবে।'

'পিটার নেই মানে?'

'শুনলে না ওদের কথা? হফম্যান বলল যার খোঁজে এসেছে সে রয়েছে তার জায়গায়। নিশ্চয় পিটারের কথা বলেছে। আমার বিশ্বাস পিটার আমেরিকা থেকেই বেরোয়নি।'

'তার মানে আমেরিকায়ই ফিরে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। আবার ডিয়ারভিলে গিয়ে তদন্ত চালাব। বোকার মত এখানে এসে ঘোলাপানি খেয়েছি। পারভির চাল। কায়দা করে সে-ই আমাদেরকে আমেরিকা থেকে বের করে এনেছে।'

'বুঝলাম,' গাল চুলকাল রবিন। 'বেলিমে ফিরবে কি করে?'

'যে ভাবে এসেছি সে ভাবেই। প্লেনে করে।'

'কিন্তু কডি কি বসে আছে আমাদের জন্যে?'

'না থাকলে অন্য কারও প্লেন ভাড়া করব। এখানে ছোট প্লেনের অভাব নেই। এয়ারপোর্টে দেখোনি?'

সেদিন রাতে আর কিছু ঘটল না। বোটে যাওয়ার টোপ ফেলেই নিশ্চিন্ত রয়েছে

পারভি। আশা করছে এক সময় না এক সময় বোটে যাবেই কিশোর আর রবিন। তার সে আশায় গুড়ে বালি দিয়ে পরদিন সকালে উঠেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। সোজা চলে এল এয়ারপোর্টে। কডি হোয়েরটার খোঁজ করল।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজার একজন খাঁটি ব্র্যাজিলিয়ান, মাথায় চকচকে টাক, বললেন, 'প্লেনটা চেনা থাকলে গিয়ে খুঁজে বের করে নাওগে। ওরকম অনেক প্লেন আসে এখানে, সব পাইলটের নাম মুখস্থ রাখা সম্ভব না।'

একধার থেকে খুঁজতে শুরু করল ওরা।

'কিশোর, ওই যে ওইই প্লেনটা চেনা চেনা লাগছে না?'

'তাই তো। ওটাই। চলো তো, আরেকটু কাছে।'

কাছে এসে দেখা গেল সেই বিমানটাই যেটাতে করে ওরা এসেছিল। তারমানে ভাড়া পায়নি কডি, রয়ে গেছে।

'তুমি এখানে থাকো,' রবিনকে বলল কিশোর, 'আমি গিয়ে ওকে খুঁজে আনি।'

আধ ঘণ্টা পরে পাইলটকে ছাড়াই ফিরে এল সে। মাথা নেড়ে বলল, 'নাহ্, পেলাম না। একজন বলল তিনটের দিকে বেলিমে চলে যাবে। এখন কোথায় কেউ বলতে পারল না।'

'এখানেই বসি তাহলে। এখানেই নিরাপদ। পারভি কিছু করতে পারবে না।'

একটা হ্যাঙ্গারের পাশে বসে পড়ল ওরা। এখান থেকে বিমানটার ওপর নজর রাখা যায়। আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে এল কডি। ছেলেদেরকে দেখে ভুরু কোঁচকাল। ওরা বলল, বেলিমে ফিরে যেতে চায়।

'ভালই হলো, ব্যাটা মানা করে দিল যাবে না,' কডি বলল। 'একজন ভাড়া করেছিল। আজ তিনটেয় ফ্লাই করার কথা। এখন ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিল, আজ যেতে পারবে না। আরও দু'চারদিন থাকবে। রেগেমেগে আসছিলাম, খালিই চলে যাওয়ার জন্যে...'

বিকেলের দিকে বেলিমে পৌঁছল ওরা। রাতের জন্যে ছোট একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করল। রাতের খাওয়ার পর ঘরে এসে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আমেরিকান কনসুলেটে এসে সেই ভদ্রলোকের দেখা পেল ওরা। তিনি বললেন, 'তোমাদের পাসপোর্টের ঝামেলা গেছে। চুরি যাওয়াগুলো বাতিল করে দিয়েছি। এই যে আইডেনটিফিকেশন কার্ড, বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' কিশোর বলল।

প্লেনের টিকেট কাটল ওরা। বাড়িতে কেবল পাঠাল, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবে। আর কিছু করার নেই আপাতত। হোটেলে যাওয়ারও কোন দরকার নেই। এয়ারপোর্টে চলল ওরা।

নির্দিষ্ট সময়ে স্টার্ট নিল বিমানের ইঞ্জিন। জানালার কাছে বসেছে রবিন। চলতে শুরু করার আগের মুহূর্তে কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'কিশোর, দেখো!'

কিশোরও দেখল, বিমানের হোল্ডে তোলা হচ্ছে একটা খাঁচা, তাতে একটা বানর। হাউলার মাংকি। খাঁচার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। শিকের ফাঁকে নাকটা গুঁজে দিয়ে কালো কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছে এয়ারপোর্টের ব্যস্ততা।

'সেই বানরটাই?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় না। ওটা এত ভদ্র নয়। সারাক্ষণই দাঁত খিঁচাতে থাকে।'

সময়মতই লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছল প্লেন। কাস্টমস থেকে বেরোতে গিয়ে দেখল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা ওদেরই অপেক্ষায়।

মুসার কাঁধে হাত রেখে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখনই আসছি জানলে কি করে?'

'আব্বার একটা কাজ করে দিচ্ছিলাম। এই সময় ফোন করলেন তোমার আম্মা। তোমাদের আসার কথা বললেন।'

মুসার সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর। বলল, 'চলো, বেরোই।'

'চলো। ও হ্যাঁ, আরেকটা খবর আছে। মিস্টার সাইমন লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে কোথায় যেন গেছেন। এখনই আসবেন, প্লেনে। তাঁর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, কিম বলল।'

'কেন?'

'কি যেন একটা জরুরী কাজে গেছেন। কিম বলতে পারল না।'

'তাহলে দেখাই করে যাই। খিদে পেয়েছে। চলো, একটা কফি শপে বসি। খেতে খেতে কথাও বলা যাবে।'

কফি শপে ঢুকল তিনজনে। জানালার কাছের একটা টেবিলে বসল, যাতে প্লেন ল্যাণ্ড করলে দেখা যায়। খাবারের অর্ডার দিল।

ট্রেতে করে দিয়ে গেল ওয়েইট্রেস।

কোকের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এদিকের কি খবর, মুসা?'

'গলফ বল তুলতে গিয়ে ডুবে মরল কেউ?' হাসল রবিন।

এক কামড়ে ডোনাটের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চিবাতে চিবাতে মুসা বলল, 'আমার এই স্ক্যাভিনজিং ব্যবসাটাকে আর সিরিয়াসলি নিতে পারলে না তোমরা। জানো কত লাভ? হাজারখানেক বল তুলে ফেলেছি আমরা। একেকজনের ভাগে একশো ডলার করে আসবে।'

'মন্দ না,' কিশোর বলল। 'বলের খবর জানতে চাইছি না। হুইসপারউডের খবর কি? সব ঠিকঠাক আছে?'

'ঠিকঠাক? ওই ভূতের আড্ডায় কোন কিছু ঠিক থাকতে পারে? মিসেস রেমন উধাও হয়ে গেছে।'

থমকে গেল কিশোর। 'উধাও?'

'উধাও! গায়েব! নিখোঁজ, যা বলো।'

'খুলে বলো সব,' গম্ভীর হয়ে গেছে রবিন। হাসি চলে গেছে মুখ থেকে।

'আমরা তো আমাদের বল তোলা নিয়ে ব্যস্ত। তোমরা চলে যাওয়ার পরদিন রেমনের বাড়িতে ঢুকে খবরটা শুনলাম। মাথা গরম হয়ে গেছে তাঁর। চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছেন। জানালেন, নিজের ঘর থেকে নাকি গায়েব হয়ে গেছেন মিসেস।'

'নার্স কোথায় ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডোরিয়া? ঘরে ছিল না?'

'সে বলল সে নাকি কিছু শোনেনি। ওই সময় আরেক ঘরে লাঞ্চ খাচ্ছিল। খেয়ে

গিয়ে দেখে তার রোগী বিছানায় নেই। চেঁচাতে শুরু করল তখন। তোমাদের দোষ দিতে লাগল। তোমরা নাকি খেপিয়ে দিয়েছ মিসেস রেমনকে, সে জন্যেই তিনি পালিয়েছেন।'

'গুড!' বিরক্ত হলো না খুশি হলো কিশোর, বোঝা গেল না। 'আরও একটা রহস্য যোগ হলো। ভাল এক কেস নিয়ে পড়েছি। প্রথমে উধাও হলো পিটার রেমন, এখন গেল তার মা।'

'সবগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে,' রবিন বলল। 'বাজি ধরে বলতে পারি সব কিছুর পেছনে রয়েছে শয়তান ডেংগু পারভি।'

'ডেংগু পারভিটা আবার কে?' জানতে চাইল মুসা।

'সে এক লম্বা কাহিনী,' তিক্তস্বরে বলল রবিন। 'আমাদের জ্বালিয়ে খেয়েছে। পরে শুনো···'

'তোমার বিশ্বাস নাটের গুরু সে-ই?'

'হ্যাঁ।'

'ও।' চুপচাপ ডোনাট চিবাল কিছুক্ষণ মুসা। মুখ তুলে বলল, 'আমার ধারণা, পিটারের কাছ থেকে গোপনে চিঠিটিঠি পেয়েছেন মিসেস রেমন। কোথায় আছে জানিয়েছে। ব্যস, দেখা করতে চলে গেছেন তিনি।'

'তা হতে পারে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ব্র্যাজিলে তো খুঁজে পেলাম না ওকে। ঘুরে মরলাম কেবল। শুধু ঘোরাই নয়, কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচেছি।'

'বলো না, শুনি।'

বলতে আরম্ভ করল কিশোর। আচমকা ওর বাহুতে হাত রাখল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'কোন দিকে তাকিয়ো না! শোনো, পানামা হ্যাট পরা কোন লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে?'

'না তো।'

আমারও না,' রবিন বলল, 'কেন?'

'দরজায় একজন লোককে দেখলাম। মনে হলো তোমাদের ওপরই নজর।'

এগারো

কেউ যাতে কিছু সন্দেহ না করে এমনি করে আস্তে ঘুরে তাকাল রবিন। কই, কেউ তো নেই দরজায়। বলল, 'চলে গেছে।'

'ছিল। তোমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল, যেন অনেক দিন পর হারানো জিনিস ফিরে পেয়েছে।'

ভাবনাটা মাথায় আসতে ঝট করে পিঠ সোজা করল রবিন। 'কিশোর, পারভি না তো? বেলিম থেকে আমাদের পিছে পিছে এসেছে?'

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'লোকটা দেখতে কেমন?'

'ছোটখাট। গালে পোড়া দাগ। স্টীল রিমড চশমা।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'পারভি নয়।'

'ও না হলে ওর দলের কেউ,' বলল কিশোর। 'হয়তো চিনতে পারেনি

আমাদের। তিনজন দেখে সন্দেহ হওয়াও স্বাভাবিক। ভুল লোকের ওপর নজর রেখেছে ভেবে চলে গেছে।'

'বেশ কিছুক্ষণ ধরেই দেখেছি,' মুসা বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে একভাবে তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে। রবিন ঘুরতে যেতেই চলে গেল।'

'ওই যে, একটা প্লেন আসছে,' কিশোর বলল। 'ওটাই হবে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'চলো, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। এলে দেখা করব।'

খাবারের টাকা মিটিয়ে দিয়ে কফিশপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। যাত্রীরা যেখান দিয়ে বেরোয় তার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খানিক পরেই আসতে দেখল মিস্টার সাইমনকে। হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'মিস্টার সাইমন।'

'আরি তোমরা?' সাইমন বললেন। 'ব্র্যাজিল থেকে ফিরলে কখন?'

'এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। মুসার কাছে শুনলাম আপনি বাইরে থেকে ফিরছেন, তাই বসে ছিলাম। দেখা করার জন্যেই।'

'তো, কি খবর তোমাদের?'

'সুবিধে করতে পারিনি,' জানাল কিশোর। 'চলুন না, কোথাও গিয়ে বসে বলি?'

ঘড়ি দেখলেন সাইমন। 'ঠিক আছে, চলো।'

এয়ারপোর্ট ওয়েইটিং রুমে বসল ওরা। ছোট একটা গোল টেবিল ঘিরে বসল সবাই। হাতের কালো ব্রিফকেসটা হাতছাড়া করলেন না সাইমন, টেবিলে রেখেও হাতলটা ধরে রাখলেন। কিশোরের সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বললেন, 'মূল্যবান কাগজপত্র আছে এতে। কেড়ে নিয়ে গেলে বিপদে পড়ব। নেয়ার ভয় আছে।' চট করে চারপাশে চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিলেন তাঁদের ওপর কেউ নজর রাখছে কিনা কিংবা কাছাকাছি বসে শুনছে কিনা।

'আপনার পাসপোর্ট জালিয়াত দলের সন্ধান পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পেয়েছি। চোরাই পাসপোর্ট নিয়ে পার হতে গিয়ে এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে একটা লোক। তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।'

হেসে মুসা বলল, 'তার মানে একটা কেস তিন গোয়েন্দার হাত ফসকাল। সেটা আপনিই সমাধান করে ফেললেন।'

সাইমনও হাসলেন। চারপাশে আরেকবার তাকিয়ে কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামালেন, 'না, এখনও সমাধান হয়নি। কেবল একটা লোক ধরা পড়েছে। রাঘব বোয়ালটাকে ধরতে এখনও অনেক কাঠখড় পোড়ানো বাকি। আশা ছেড়ো না। বলা যায় না তোমাদের সাহায্য চেয়েও বসতে পারি। যাক, এখন তোমাদের খবর বলো। কতটা এগোল? পিটার রেমনের খোঁজ পেলে?'

ব্র্যাজিলে নিজেদের ব্যর্থতার কথা জানাল কিশোর আর রবিন। কয়েকবার যে মরতে বসেছিল সেকথাও বলল। এমনকি কুৎসিত বানরটার কথাও।

ভ্রূকুটি করলেন সাইমন। 'রেমনের কেসটা এতটা মারাত্মক হবে ভাবিনি। তাহলে তোমাদের পাঠাতাম না।'

'ব্র্যাজিল থেকে তো জান নিয়ে ফিরলাম,' রবিন বলল, 'লাভের মধ্যে আরেকটা রহস্য যোগ হয়েছে। এখন পিটারের মা মিসেস রেমনকেও পাওয়া যাচ্ছে

না। তিনিও নাকি গায়েব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মুসাকে ওই বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলাম, নজর রাখার জন্যে। সে-ই বলল।'

সব কথা আরেকবার খুলে বলল মুসা।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থেকে সাইমন বললেন, 'মুসা, গলফ বল বাদ দিয়ে তোমার এখন হুইসপারউডের ওপর নজর রাখা উচিত। বিল আর টমের সাহায্যও নিতে পারো, ওরা রাজি থাকলে।'

'ওরা তো রাজিই,' মুসা বলল।

'আসলে, গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে অন্য কোন কাজ করা যায় না। গলফ বল তুলতে না গিয়ে যদি সারাক্ষণ তোমরা বাড়িটার ওপর নজর রাখতে তাহলে হয়তো মিসেস রেমন নিখোঁজ হতে পারতেন না। কিংবা কোথায় গেলেন জেনে যেতে পারতে।'

গাল চুলকাল মুসা, 'হুঁ, ভুলই হয়ে গেছে। ভাবতেই পারিনি ওরকম একটা ব্যাপার ঘটবে।'

'তিনজনে একসাথে না গিয়ে বিল কিংবা টমের একজনকে রেখে যেতে পারতে?' রবিন বলল।

'বললাম না, ভাবিনি। তাহলে তো রেখেই যেতাম।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বলে উঠল মুসা, 'ও শোনো, বলতে ভুলে গেছি, অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটছে। বিল আর টমও দেখেছে। ওরাও তখন আমার সাথে কাজ করছিল।'

'কি দেখলে?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিশোর।

'ছাতের ওপর আলো। কয়েকবার জ্বলল নিভল, তারপর একেবারে নিভে গেল, আর জ্বলল না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।'

'এইই?' নিরাশ মনে হলো রবিনকে।

'না। আজব শব্দও শুনতে পেয়েছি। মনে হলো কেউ চিৎকার করছে। প্রথমে মনে হলো ভুল শুনেছি, দেখাটাও চোখের ভুল। কিন্তু বিল আর টমও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। তিনজনের একই ভুল হতে পারে না।'

'খোঁজ নিয়েছ?'

'চেষ্টা করেছি। বেড়া ডিঙিয়ে গলফ কোর্সে ঢুকে পড়লাম। তবে আমরা যখন গিয়ে ওখানটায় পৌঁছলাম, কিছু দেখলামও না, শুনলামও না।'

চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন সাইমন, চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই দেখছেন লোকটাকে। শুরুতে কিছু মনে করেননি, কিন্তু একদৃষ্টিতে কিশোর আর রবিনের দিকে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলো তাঁর।

নিচু গলায় ছেলেদেরকে বললেন, 'যে ভাবে কথা বলছ, চালিয়ে যাও, কোনদিকে তাকাবে না। আমি আসছি।'

লোকটার দিকে তাকালেন না সাইমন। বাথরুমে যাচ্ছেন যেন, এমনি ভঙ্গি করে

এগোলেন। ওয়েইটিং রুমে আরও দু'চারজন লোক আছে, তারা যার যার কাজে ব্যস্ত। প্লেনের অপেক্ষা করছে বোধহয়। বই পড়ছে, পত্রিকা পড়ছে। অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই।

আস্তে করে ঘুরে লোকটার পেছনে চলে এলেন সাইমন। লোকটার মনোযোগ তখন কিশোরদের ওপর। আস্তে করে বললেন সাইমন, 'এই যে মিস্টার...'

কথা শেষ হলো না তাঁর। চমকে উঠল লোকটা। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই পালানোর চেষ্টা করল। পারবে না বুঝতে পেরে আক্রমণ করে বসল। ঘুসি মারতে গেল সাইমনের মুখে।

চট করে পাশে সরে গিয়ে খপ করে লোকটার হাত ধরে এক মোচড় দিলেন সাইমন। একবার মাত্র ডান হাতটা উঠল নামল তাঁর, চোখের পলকে ঢিল হয়ে গেল লোকটার শরীর। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়তে শুরু করল লোকটা। ধরে তাকে আলগোছে শুইয়ে দিয়ে 'বেহুঁশ হয়ে গেছে! বেহুঁশ হয়ে গেছে!' বলে চিৎকার করলেন। তিনিই যে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছেন বুঝতেই পারল না কেউ। এতই দ্রুত সেরে ফেলেছেন কাজটা।

বই আর কাগজ থেকে মুখ তুলে কৌতূহলী হয়ে তাকাল যারা মুখ গুঁজে পড়ছিল। উঠে দাঁড়াল দু'জন লোক। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

চিৎকার শুনে ছুটে এল এয়ারপোর্টের দারোয়ান আর কর্তব্যরত পুলিশ।

লোকটার বোতাম খুলে টেনেটুনে পোশাক ঢিল করে দেয়ার ছুতোয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন সাইমন। টেনে বের করলেন পাসপোর্ট। আমেরিকান পাসপোর্ট। নাম লেখা রয়েছে বিংহ্যাম মরিসন। এক পলক দেখেই বুঝে ফেললেন, নকল পাসপোর্ট।

'আপনি ওর পকেটে হাত দিয়েছেন কেন?' কাঁধের ওপর থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

পেছনে ফিরে তাকালেন সাইমন। একজন পুলিশ অফিসার। উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে আইডেনটিটি বের করে দেখালেন তিনি।

একনজর দেখেই সশ্রদ্ধ কণ্ঠে পুলিশ অফিসার বলল, 'ও, আপনিই ভিকটর সাইমন! সেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ! মাপ করবেন, স্যার, চিনতে পারিনি। তা কি দেখলেন?'

'জাল পাসপোর্ট।'

'তাই নাকি? তাহলে তো ব্যাটাকে আটক করতে হয়।'

'হ্যাঁ, করুন। জাল পাসপোর্টের তদন্তই করছি আমি এখন। অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে একে।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। কিশোরের কাছাকাছি সরে গিয়ে প্রায় কানে কানে বলল, 'এই লোকটাই, বুঝলে, একেই তখন চোখ রাখতে দেখেছিলাম তোমাদের ওপর! কফি শপের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল!'

বারো

ডাক্তারকে খবর দেয়া হলো।

'শিওর এ ব্যাটা পারভির দলের লোক,' রবিন বলল। 'পেশাদার খুনী হলেও অবাক হব না।'

'কাপড়চোপড় তো পরেছে দক্ষিণ আমেরিকান লোকের মত,' কিশোর বলল। 'ব্র্যাজিল থেকেই আমাদের অনুসরণ করে এসেছে মনে হচ্ছে।'

ডাক্তার এলেন। সঙ্গে এলেন আরেকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। মিস্টার সাইমনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কথা শুনেই এলাম। ব্যাপারটা কি?'

'জাল পাসপোর্ট। আরও কোন সিরিয়াস ব্যাপার আছে। একে ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।'

ডাক্তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মরিসনের জ্ঞান ফেরাতে বেশিক্ষণ লাগল না। এক গ্লাস পানি চাইল। এনে দেয়া হলো তাকে। পানি খেয়ে প্রথম কথাটাই বলল সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চায়। অফিসার বললেন, থানায় যেতে হবে।

কিছু জানতে পারলে জানানো হবে সাইমনকে কথা দিলেন তিনি।

মরিসনকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

'এবার?' রবিনের প্রশ্ন। 'রকি বীচেই ফিরে যাব?'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন সাইমন।

'কি এটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'বিমানের রশিদ। একটা বাক্স আনা হয়েছে। আন্দাজ করতে পারো কি আছে ওতে?'

'একটা বানর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'আস্তে! কেউ শুনে ফেলবে,' চারপাশে তাকালেন সাইমন। 'মরিসনের পকেটে পেয়েছি। আরেকটা কাগজ ছিল, দেখে পকেটে রেখে দিয়েছি আবার। একটা হেলথ সার্টিফিকেট। তাতে বলা হয়েছে সব ধরনের টিকা আর ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে বানরটাকে যাতে রোগ ছড়াতে না পারে। আমেরিকায় ঢোকানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

'দেখি,' সাইমনের হাত থেকে রশিদটা নিল কিশোর। মাথা নাড়ল, 'হুঁ। খোঁজ নিতে যেতে হয়।'

'তার মানে রকি বীচে ফিরছি না আমরা এখন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সূত্র খুঁজতে ব্র্যাজিলে চলে গিয়েছিলাম আমরা। হাতের কাছে পেয়ে গিয়ে না দেখে কি করে যাই?' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'মুসা, তোমার এখন কি কাজ?'

'আর কি?' হাত ওল্টাল মুসা। 'বল তোলা। ডিয়ারভিলে ফিরে যেতে হবে।'

সাইমন বললেন, 'আমার কাজ আছে। তোমাদের কাজ করো, আমি চললাম। জরুরী দরকার হলে ফোন করো।'

ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'মুসাকে বলল কিশোর, 'তুমি ডিয়ারভিলেই চলে যাও। নজর রাখোগে। নতুন কিছু জানলে হেডকোয়ার্টারে ফোন করো। আমরা এদিকের কাজ সেরে বাড়ি চলে যাব। যোগাযোগ করব তোমার সাথে। যাও।'

মুসাও চলে গেল।

এয়ারপোর্টের একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কিশোর, বিমানে করে আনা জন্তুজানোয়ারগুলো কোন্‌খানে রাখা হয়। গুদামের মত বাড়িটা দেখিয়ে দিল লোকটা। বাড়িটার অ্যাটেনডেন্টকে রশিদ দেখিয়ে কিশোর বলল, বানরটা কেমন আছে দেখতে চায়। ওরা দেখে চলে যাবে। পরে এসে ওটার মালিক ওটাকে নিয়ে যাবে। মালিক কি হয় ওদের এই প্রশ্নের জবাবে কিশোর বলল, ওদের বন্ধু। রশিদ হাতে আছে, কাজেই কোন সন্দেহ করল না লোকটা। বানরের খাঁচাগুলো কোন্‌দিকে দেখিয়ে দিল।

বিশাল ঘর। সারি সারি খাঁচা একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

'বাপরে বাপ, এ-কি কাণ্ড!' বলে উঠল রবিন। 'আস্ত চিড়িয়াখানা!'

শিশু জলহস্তী থেকে শুরু করে সিংহ, বাঘ, জেব্রা, তাপির, হরিণ, সাপ আর রাজ্যের যত জানোয়ারে বোঝাই গুদাম। কুকুর বেড়ালও আছে প্রচুর।'

'এত সব জানোয়ারের মালিক কে?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একজনের তো নয়, অনেকের,' জবাব দিল অ্যাটেনডেন্ট। 'কুকুর-বেড়ালগুলোর বেশির ভাগই প্যাসেঞ্জারদের, সময় মত এসে যার যার মাল বুঝে নিয়ে যাবে। বুনো জানোয়ারগুলো কয়েকজনের, তার মধ্যে বেশি হলো একটা লোকের। জানোয়ারের ব্যবসা করে। চিড়িয়াখানা আর সার্কাসের জন্যে পাঠিয়েছে।'

'ডেংগু পারভি,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

খাঁচার নম্বর দেখে হাউলার মাংকিটাকে খুঁজে বের করল ওরা। দেখেই চিনতে পারল। বেলিম এয়ারপোর্টে এটাকেই দেখেছিল। ভদ্র স্বভাব। ওদেরকে দেখেই শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে দিল যেন হাত মেলানোর জন্যে।

চোয়াল ডলল কিশোর। 'উঁহু, এটা সেই বানরটা নয়। ওটা তো একটা শয়তান। এর মত ভদ্র নয়।'

হাসল রবিন। 'এর বংশ ভাল আরকি। ওটার মত শয়তান নয়।'

আর কিছু করার নেই এখানে। যাওয়ার জন্যে ঘুরল দু'জনে, এই সময় দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখল দু'জন লোককে। একজনের পরনে হুইপকর্ড জ্যাকেট আর করডুরয় প্যান্ট। আরেকজনের গায়ে ট্রেঞ্চ কোট, মাথায় স্ন্যাপ-ব্রিম হ্যাট। কঠিন কর্কশ চেহারা। কিশোরদের বেশ কিছুটা আগে আগে হাঁটছিল অ্যাটেনডেন্ট, তার কাছে এসে দাঁড়াল লোকগুলো।

'একটা বানর নিতে এসেছি,' বলল করডুরয় প্যান্ট।

'রশিদ দেখি?'

'হারিয়ে ফেলেছি,' শীতল কণ্ঠস্বর। 'তবে নম্বরটা মনে আছে। ওতে হবে না?'

লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে অ্যাটেনডেন্ট। একটানে রবিনকে নিয়ে একটা জলহস্তীর খাঁচার আড়ালে চলে এল কিশোর। অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'নম্বর কত?'

'চার তিন আট নয় সাত।'

কিশোরদেরকে যে খাঁচাটা দেখিয়েছে সেই খাঁচার সামনে লোকগুলোকে নিয়ে গেল সে। একই নম্বর। বলল, 'এইটাই। আপনারা দাঁড়ান, আমি সুপারভাইজারকে ডেকে আনি। রশিদ ছাড়া দিতে পারব না।'

'যাও,' বলল স্ন্যাপ-ব্রিম। আমরা আছি।'

'একটু আগে আপনার বন্ধুদেরকেও তো বানরটা দেখতে পাঠিয়েছেন, তাই না?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যাটেনডেন্ট।

'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল স্ন্যাপ-ব্রিম।

'এই তো একটু আগে…'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে অ্যাটেনডেন্টকে থামিয়ে দিল করডুরয় প্যান্ট, 'অত কথার দরকার নেই। যাও, সুপারভাইজারকে নিয়ে এসো। আমাদের তাড়া আছে।'

অ্যাটেনডেন্ট বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দুই ধার দু'পাশ থেকে চেপে ধরল দু'জনে। বয়ে নিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। নিঃশব্দে পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। একটা স্টেশন ওয়াগনে খাঁচাটা তুলতে দেখল। আরও একটা ব্যাপার দেখল, যা লোকগুলোর চোখে পড়ল না। তোলার সময় কাত হয়ে গিয়েছিল খাঁচাটা, বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট পড়ে গেল রাস্তায়, খেয়ালই করল না ওরা

চলতে শুরু করল স্টেশন ওয়াগন। ছুটল কিশোর আর রবিন। গাড়িটার নম্বর টুকে নিতে লাগল কিশোর, রবিন নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলে ভরে ফেলল তার জ্যাকেটের পকেটে।

'ব্যাটাদের পিছু নিতে পারলে ভাল হত,' রবিন বলল।

'তা হত,' নোটবুকটা পকেটে ভরতে ভরতে জবাব দিল কিশোর, 'কিন্তু আমাদের গাড়ি কোথায়? ট্যাক্সি ডেকে ওঠার আগেই ওরা চলে যাবে। থাক। নম্বরটা তো নিলাম।'

'এখানে থাকলে অ্যাটেনডেন্ট এলে বিপদে পড়ব। চলো, কেটে পড়ি।'

দ্রুত হেঁটে এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। গতি কমাল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রবিন বলল, 'এবার দেখা যাক, প্যাকেটটায় কি আছে?'

বাদামী কাগজের মোড়ক ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল রবারের একটা কুৎসিত মুখোশ।

'এ তো বানরের চেহারার মুখোশ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

তেরো

'এটা দিয়ে কি করে ওরা, কিশোর?'

'বুঝতে পারছি না!'

'খাঁচার বানরটাকেই পরিয়ে দেয় না তো? যাতে ওটাকে ভয়ঙ্কর লাগে?'

'পরাতেও পারে।' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। 'রবিন, একটা কথা ভাবছি। হাউলার মাংকির খাঁচার রশিদ পাওয়া গেল মরিসনের পকেটে। ওর কাছে জাল পাসপোর্টও পাওয়া গেছে। ধরা যাক সে ডেংগু পারভির লোক। পাসপোর্ট জাল করে। এমনও তো হতে পারে, মিস্টার সাইমন যাদের খোঁজ করছেন তারা ডেংগুর দলেরই লোক। ডেংগুই তাদের দলপতি।'

'মন্দ বলোনি,' আনমনে মাথা নেড়ে বলল রবিন। 'ডেংগুটা একটা বর্ন ক্রিমিন্যাল। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'তার মানে, দুই দুটো নিখোঁজ এবং বানর রহস্যের সাথে আরও একটা রহস্য যোগ হলো। একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগ আছে।'

'তা থাকতেই পারে।'

'মিস্টার সাইমনের সাথে আলোচনা করা দরকার। আর এখানে কোন কাজ নেই। চলো, বাস ধরি।'

বাসে করে রকি বীচে ফিরল ওরা।

সেই দিনই দেখা করল মিস্টার সাইমনের সঙ্গে।

সব শুনে ডিটেকটিভ বললেন, 'মরিসনের পকেটে জাল পাস-পোর্ট পেয়েই ডেংগুর ওপর সন্দেহ হয়েছে আমার। খোঁজও নিয়েছি। ব্র্যাজিলিয়ান এমব্যাসি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না। বেলিমে বাস করে সে। কোন পুলিশ রেকর্ড নেই। স্ক্যাণ্ডালে জড়ায়নি কখনও।'

'যাই হোক,' কিশোর বলল, 'লোকটা অসৎ, এটা আমরা বুঝতে পারছি। এখন তো মনে হচ্ছে একই কেসের তদন্ত করছি আমরা। আপনি সমাধান করতে পারলে আমাদের কেসের কিনারা হবে, আবার আমরা কিছু করতে পারলে আপনার সুবিধে হবে।'

'হ্যাঁ, সে রকমই লাগছে। পাসপোর্ট জালিয়াতদের ধরতে পারলে পিটার রেমনের খোঁজ পেয়ে যেতে পারি। আবার পিটারকে তোমরা ধরতে পারলে জালিয়াতের দলের সর্দারটার নাম জানতে পারব আমি।'

পরদিন সকালে রবিনের গাড়ি নিয়ে হুইসপারউডে চলে এল সে আর কিশোর। খোশমেজাজে রয়েছে মুসা। ওদেরকে দেখেই বলে উঠল, 'এসেছ। দারুণ চলছে আমাদের ব্যবসা।'

'তাই নাকি?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' বিল জবাব দিল। 'কাল রাতে আরও দুশো বল তুলেছি।'

'খুব ভাল কণ্ডিশনে আছে বলগুলো,' টম যোগ করল। 'ধুয়েটুয়ে নিলে ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

মুসা জানাল, 'আজ রাতে আবার যাব অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে। বড় একটা ডোবা আছে, সেটা থেকে বল তুলব।'

'ভাল,' বলল কিশোর। 'এবার আসল কথা বলো। মিসেস রেমনের খবর কি?'

'এখনও ফেরেননি।'

'মিস্টার রেমন?'

'তিনি ঘরেই আছেন।'

'চলো দেখা করে আসি।'

ডেস্কে বসে কাগজপত্র দেখছেন মিস্টার রেমন। শব্দ শুনে মুখ তুলে কিশোরদেরকে দেখে অবাক হলেন।

'হাল্লো, মিস্টার রেমন,' কিশোর বলল, 'আপনার স্ত্রীর কথা শুনলাম। খারাপই লাগছে।'

'অ্যাঁ?' হ্যাঁ। খালি গোলমাল। শান্তি আর নেই কোন কিছুতে। তোমাদের খবর কি? পিটার কোথায়?'

'পাইনি।' সব কথা খুলে বলল কিশোর।

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার রেমন। 'হুঁ। তার মানে কিছুই করতে পারোনি।' হঠাৎ ফেটে পড়লেন তিনি, 'আসলে আমারই দোষ। বোঝা উচিত ছিল, পুলিশ যে কাজ করতে পারেনি সেকাজ কয়েকটা বাচ্চা ছেলের ওপর দেয়া উচিত হচ্ছে না।'

'একেবারে কিছুই করতে পারিনি আমরা, একথা বললে ভুল হবে, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'কিছু কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি যাতে বোঝা যায় আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমেরিকাতেই আছে।'

'তাকে আটকে রেখেছে ডেংগু পারডি,' রবিন বলল।

'ওই নামই শুনিনি আমি,' রেমন বললেন। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ঠিক আছে, আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো পিটারকে। এরপর আর কিছু বলতে আসবে না আমাকে।'

'মিস্টার রেমন,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'পুলিশ কি আপনার স্ত্রীকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার কাজ তুমি করো।'

'একই লোক দু'জনকে কিডন্যাপ করে থাকতে পারে,' রবিন বলল। 'পিটার আর মিসেস রেমনকে।'

'আমার মনে হয় না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার রেমনের কণ্ঠ। 'জানালায় বাঁধা একটা দড়ির সিঁড়ি পাওয়া গেছে। একেবারেই বোধহয় মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ওর। তোমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। পিটারকে খুঁজে বের করো।'

গেস্টহাউসে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। মুসা বলল, 'মিসেস রেমনের ব্যাপারে পাত্তাই দিলেন না মিস্টার রেমন।'

'আমাদের ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে,' কিশোর বলল।

'পিটারকে খুঁজে বের করতেই হবে,' রবিন বলল, 'নইলে মানইজ্জত আর থাকবে না। কিন্তু করব কি করে? এগোনোর কোন পথই তো দেখছি না।'

'আছে। অলিম্পিক হেলথ ক্লাব। রাতের বেলা আজব চিৎকার আর আলো দেখতে পেয়েছে ওখানে মুসারা। রাতে গেস্ট হাউসে জানালা দিয়ে আমাদের ঘরে এসে পড়েছিল গলফ বল। সেটাও ওই ক্লাবের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভালমত খোঁজ নিতে হবে।'

রবিন বলল, 'ঢুকবে কি করে ওখানে?'

'কোন অসুবিধে নেই,' সমাধান করে দিল মুসা। 'আজ রাতে বল ভুলতে যাচ্ছি আমরা। বল তোলার ছুতোয় কাজটা সেরে ফেলা যাবে।'

সারাদিন আর কোন কাজ নেই। বাড়িতে দেখা করে আসতে চলে গেল বিল আর টম। মিস্টার রেমনের ওখানেই রইল তিন গোয়েন্দা। নজর রাখল বাড়ির ওপর।

সন্ধ্যায় এসে হাজির হলো আবার বিল আর টম। পাঁচজনে মিলে গলফ ক্লাবে রওনা হলো। ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল গলফ কোর্সের ম্যানেজার এরিক জুনেকারের সঙ্গে। এত মানুষ দেখে ভুরু কোঁচকালেন। কৈফিয়তের সুরে মুসা বলল, কাজ বেশি, তাই আরও দু'জন বন্ধুকে আনতে হয়েছে। কিশোর আর রবিনের কথা বলল সে।

বড় একটা ডোবার দিকে চলল ওরা। ওটা থেকে আর বল তোলেনি মুসা। কিনারের দিকটায় সাকশন পাইপ দিয়ে কাজ সারতে পারবে, কিন্তু মাঝখানে ডুবুরি ছাড়া কাজ হবে না। অনেক বড় হাতার মত জিনিস নিয়ে এসেছে। ওগুলো দিয়ে ডোবার তলার কাদামাটি সহ অন্যান্য জিনিস খুঁচিয়ে তুলে ঝুড়িতে রাখে বিল আর টম। বল ছাড়াও আরও নানা জিনিস উঠে আসে। প্রায় সবই অপ্রয়োজনীয় জিনিস।

মাঝরাত পর্যন্ত বল তোলা চলল। ক্লান্ত হয়ে মুসা বলল, 'অনেক হয়েছে। পুকুরের তলায় আর বোধহয় কিছু নেই। দেখা যাক এখন, কি উঠেছে।'

ঝুড়িতে করে কাদামাটি ধুয়ে সাফ করার পর বেরিয়ে পড়ল জিনিসগুলো। মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'এই দেখো, কি জিনিস!'

সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল। মুসার হাতে মেয়েদের একটা জুতো।

হেসে টম বলল, 'নিশ্চয় খেলতে এসেছিল মহিলা। খালিপায়ে বাড়ি যেতে হয়েছে। কিন্তু পানিতে পড়ল কি করে?'

কেউ সেকথার জবাব দেয়ার আগেই মুসা বলল, 'খাইছে! দেখো কাণ্ড!'

মুসার হাতের দিকে তাকিয়ে অন্যেরাও অবাক হলো। মরচে ধরা একটা পিস্তল।

এই সময় শোনা গেল কথা। কয়েকজন লোক আসছে।

চোদ্দ

ডোবার দিকেই এগিয়ে এল লোকগুলো। ছেলেদের ওপর চোখ পড়তেই ধমক দিল একজন, 'এই, এখানে কি করছ?'

'বল তুলছি,' মুসা বলল।

'কে ঢুকতে দিল তোমাদের?'

'এরিক জুনেকার।'

'তাঁর সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে,' বিল বলল, 'বল তোলার। যা পাব অর্ধেক দিতে হবে তাঁকে।'

'কি যে করে এরিক বুঝি না! দেখি, ওকে বলতে হবে। এরকম গোলমেলে জায়গায় আর আসব না আমরা।'

সঙ্গীদেরকে নিয়ে গটমট করে চলে গেল লোকটা।

'কোন কারণে খেপে আছে লোকগুলো,' বিড়বিড় করে আনমনেই বলল কিশোর। 'কেন খেপল?' মুসার দিকে তাকাল সে।

'আমি কি জানি?' হাত নাড়ল মুসা।

'কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে এখানে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলতে বলতেই আজব শব্দ আর আলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। তাকাল ছাতের দিকে। আলোও নেই। শব্দও নেই। দেখা আর হলো না। লোকগুলো সব গড়বড় করে দিয়েছে। হয়তো আজ আর দেখা যাবে না কিছু।

'তো, কি করব এখন?' মুসার প্রশ্ন।

'আর কিছু করার নেই এখানে। হুইসপারউডে ফিরে যাব। কাল পিস্তলটার ব্যাপারে কথা বলব পুলিশের সাথে।'

পরদিন সকালে বিল আর টমকে নিয়ে বল তুলতে গেল মুসা। কিশোর আর রবিন পিস্তলটা নিয়ে চলল থানায়। ডোবায় পাওয়া জুতোটাও নিল সঙ্গে। ডিয়ারভিল থানার চীফ নিকলসনকে ডেস্কেই পাওয়া গেল। আসার কারণ বলল কিশোর।

জুতো এবং পিস্তলটা দেখলেন চীফ। টেবিলে রাখা পেন্সিলটা একবার সামনে একবার পেছনে গড়াতে লাগলেন। ভাবছেন। মুখ তুলে বললেন, 'অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে খুব একটা যাই না আমি। তবে এবার যেতে হবে। আগে পিস্তলটা ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে টেস্ট করে নিই, তারপর যাব। বসবে? টেস্টের রিপোর্ট শুনে যেতে পারো তাহলে।'

'নিশ্চয়ই,' প্রায় একই সঙ্গে বলল রবিন আর কিশোর।

শ্যাওলা পরিষ্কার করতেই বেরিয়ে পড়ল পিস্তলের নম্বর। এখনও বেশ ভাল অবস্থায় রয়েছে, গুলি করা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চীফের অফিসে রিপোর্ট নিয়ে এলেন ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট।

উঠে গেলেন নিকলসন। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন একটা ফাইল নিয়ে। ফাইলের রিপোর্ট আর ব্যালিস্টিক রিপোর্টটা পাশাপাশি রাখলেন। চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে আপনমনেই বললেন, 'ইনটারেস্টিং!'

'কি, স্যার?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুই বছর আগে ডিয়ারভিলের পোস্ট অফিসে একটা ডাকাতি হয়েছিল। যে করেছে তার নাম আরনিং সিনডার। এটা তার ফাইল,' ফাইলে টোকা দিলেন তিনি। পিস্তলটা তুলে নিলেন হাতের তালুতে। 'এই পিস্তল দিয়েই ডাকাতিটা করা হয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সিরিয়াল নম্বর মিলে যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে একটা বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, এখন ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট মিলিয়ে দেখে বলছে এই পিস্তল থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল গুলিটা।'

'সিনডার কি দাগী আসামী?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'দাগী নয়, জেল খাটার কোন রেকর্ড নেই। তবে বিপজ্জনক। খুন করতেও বাধে না। ডাকাতির সময় একজন দারোয়ানকে গুলি করেছে। অল্পের জন্যে বেঁচেছে লোকটা। কাঁধে লেগেছে। আরেকটু নিচে লাগলেই হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যেত। তার মানে মেরে ফেলার জন্যেই গুলি করেছিল সিনডার। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমরা

ওকে, পাইনি। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাতি করে কি কি নিয়েছে?'

'আজব ব্যাপার হলো সেইটাই। টাকা পয়সা কিছুই ছোঁয়নি। নিয়েছে একগাদা পাসপোর্ট।'

'পাসপোর্ট?' যেন এই কথাটাই শুনবে আশা করেছিল কিশোর। অবাক হলো না সে। 'এই পাসপোর্টের কেসের ওপরই এখন তদন্ত করছেন ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমন।' সংক্ষেপে জাল পাসপোর্টের কথাটা চীফকে জানাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'সিনডারের ছবি আছে?'

ফাইল থেকে একটা ছবি বের করলেন নিকলসন। চৌকোণা মুখ লোকটার। সোনালি চুল। নাকটা খাড়া, মাঝখানে সামান্য উঁচু। নিরাশ হলো কিশোর। ডেংগু পারভির সঙ্গে চেহারা মেলে না। তবু জিজ্ঞেস করল, 'সিনডার কি অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের মেম্বার?'

মাথা নাড়লেন চীফ। 'না। পিস্তলটা গলফ কোর্সের ডোবায় গেল কি করে সেটা বুঝতে পারছি না।'

'জুতোটার ব্যাপারে কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

আবার মাথা নাড়লেন নিকলসন, 'তা-ও বুঝতে পারছি না। পানিতে বেশিদিন ছিল না, এটাই কেবল বলতে পারি।'

'আচ্ছা,' কিশোর বলল, 'মিসেস রেমনের জুতো না তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' তুড়ি বাজাল রবিন, 'দৌড়ানোর সময় পা থেকে খুলে গিয়েছিল হয়তো। না কি খুন করে ফেলে দেয়া হয়েছে, কি বলেন?'

জুতোটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নিকলসন। 'খোঁজ নেব। মহিলারই যদি হয়ে থাকে, গরুখোঁজা করে ফেলব সমস্ত গলফ কোর্স।'

হুইসপারউডে ফেরার পথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল দুই গোয়েন্দা। রবিন বলল, 'আমি আন্তরিক ভাবে চাইছি জুতোটা মিসেস রেমনের না হোক।'

কিশোর বলল, 'তাঁর না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অনেক মহিলা আসে গলফ খেলতে। ওদের কারও হতে পারে। আর মিসেস রেমনই বা কেন ডোবার ধার দিয়ে দৌড়াবেন? ওরকম দৌড়াতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। খোঁজ নিলেই বেরিয়ে পড়বে তিনি কে। আবার বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে তাঁকে। একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ, দিনের বেলা নিখোঁজ হয়েছেন তিনি।'

'তাহলে গেলেন কোথায়? নাকি কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর।

হুইসপারউডে ফিরে দেখা গেল রকি বীচে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে টম আর বিল।

'কি ব্যাপার? এখনই চলে যাচ্ছ যে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আর থেকে কি করব?' জবাব দিল বিল, 'এখানকার কোন ডোবাই আর বাকি নেই, সবগুলোতে দেখা হয়েছে। অহেতুক এখানে বসে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে স্ক্যাভিনজিং অভিযান চালাই।'

'এমন সময়ে যাচ্ছ,' কিশোর বলল, 'যখন চারদিকেই কেবল রহস্য আর রহস্য। এখনই তো মজা।'

'দরকার হলেই ফোন করো আমাদের,' টম বলল। 'যত কাজ থাকে ফেলে চলে আসব।'

'মুসা, তুমি কি করবে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

মুসা জবাব দেয়ার আগেই ফোন বাজল। বিল ধরল। বলল, 'মুসা, তোমার।'

রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা। 'হালো।'

অচেনা একটা কণ্ঠ বলল, 'গলফ কোর্সগুলোর কাদা ঘেঁটে মরছ, তুমিই তো সেই লোক?'

'কাদা ঘেঁটে মরছি না, বল তুলছি,' গরম হয়ে বলল মুসা।

'ওই একই কথা। কাদা ঘেঁটে যা যা তুলেছ সবই আছে তোমার কাছে?'

'কেন?'

'একটা ব্যবসা করতে চাই।'

'কি ব্যবসা? কত টাকার?'

কান খাড়া করে শুনছে অন্য চারজনে। মুসার জবাব থেকেই আন্দাজ করতে পারছে টেলিফোনে কি কথা হচ্ছে।

'এক হাজার ডলারের।'

শিস দিয়ে উঠল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বলল তাকে।

'কি চায় জিজ্ঞেস করো,' কিশোর বলল।

ওপাশ থেকে বলল লোকটা, 'কি হলো? চুপ করে আছ কেন?'

'না, ভাবছি,' মুসা বলল, 'অনেক টাকার ব্যাপার তো। ব্যবসাটা কি বলে ফেলুন?'

'আমি জানি, গলফ কোর্সের পুকুর-ডোবা থেকে বল তোলো তুমি। অলিম্পিক হেলথ ক্লাবেও তুলেছ। তার থেকেই একটা জিনিস চাই।'

'বল?'

'না। পিস্তলটা।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। ইশারায় জানতে চাইল কিশোর, কি হয়েছে? রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে তাকে জানাল মুসা।

কিশোর বলল, 'জিজ্ঞেস করো, কখন চায়? কিভাবে দিতে হবে?'

জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আপনি এসে নিয়ে যাবেন?'

'না,' জবাব দিল লোকটা। 'একটা গলফ ব্যাগে জিনিসগুলো ভরে অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের দক্ষিণে যে ছোট বনটা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু এলম গাছটার নিচে রেখে আসবে আজ রাতে। সরে যাবে ওখান থেকে। আধ ঘণ্টা পরে আবার যাবে। টাকা পাবে গাছের গোড়ায়। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ব্যাপারটা গোপন রাখবে, যদি টাকাটা পেতে চাও।'

লাইন কেটে গেল। কিশোরকে সব বলল মুসা। বলল, 'আশ্চর্য! একটা পুরানো পিস্তলের জন্যে এত টাকা দিতে চায়!'

'নিশ্চয় কোন কারণ আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।
'মুসা যে পিস্তলটা পেয়েছে জানল কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।
'জানাটা কঠিন কিছু না। গলফ কোর্স তো গোপন জায়গা নয়। নিশ্চয় তোলার সময় কাছাকাছি কেউ ছিল। দেখে ফেলেছে। হতে পারে যে চাইছে সে-ই দেখেছে। যা-ই হোক, আসল কথাটা হলো পিস্তলটা কেন দরকার তার? সিনডারের সাথে কোন যোগাযোগ আছে?'
'লোকটা সিনডারই নয় তো?'
'দেখা দরকার।'
'সিনডারটা কে?' জানতে চাইল মুসা।
ব্যালিস্টিক রিপোর্টের কথা ওকে জানাল রবিন।
'ও, তাহলে ওই ব্যাটাই,' গাল চুলকাল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল, 'কি করা যায় বলো তো?'
'ওই যে বললাম দেখা দরকার। এমনও হতে পারে, এই পিস্তল এবং সিনডারের সাথে পিটারের নিখোঁজের নিশ্চয় কোন সম্পর্ক রয়েছে। আগেই পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই। চলো, আগে আমরা গিয়ে দেখি, তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।'
'তার মানে পিস্তলটা লোকটাকে দেয়ার কথা বলছ তুমি? ওটা তো রয়েছে পুলিশের কাছে। নিয়ে যাব কি?'
'খেলনা পিস্তল। কাগজে মুড়ে ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়ে রাখবে গাছের তলায়। লুকিয়ে থাকবে। লোকটা এলে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে সিনডার কিনা?'
'আমি তো চিনি না...'
'আমরা চিনব। আমি আর রবিন। থানার ফাইলে ওর ছবি দেখে এসেছি।'
'তুমি তো তাহলে যাচ্ছ না এখন,' বিল বলল মুসাকে। 'তার মানে কয়েকদিন গলফ তোলা বন্ধ। আমরা আর থেকে কি করব? বাড়ি চলে যাই। দরকার হলে ডেকো।'
কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, যাও।'
লাঞ্চের পর রকি বীচে রওনা হয়ে গেল বিল আর টম।
রাতে গাড়ি নিয়ে বনটার কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা। বনের একটু দূরে নেমে গেল কিশোর আর রবিন, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগ হাতে সোজা এগোল এলম গাছের দিকে, কোন রাখঢাক নেই, ইচ্ছে করেই ওরকম খোলাখুলি চলেছে। লোকটা নজর রেখে থাকলে যাতে ওর চোখে পড়ে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে একটা ঝোপের ভেতরে এসে ঢুকল কিশোর আর রবিন, এলম গাছটা চোখে পড়ে এখান থেকে।
ব্যাগ রেখে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠল মুসা। অপেক্ষা করতে লাগল লোকটার আসার।
সময় কাটতে লাগল। চাঁদ উঠল। বিচিত্র আলোআঁধারি আর ছায়া ছড়িয়ে পড়ল বনতলে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকল।
আরাম করে হেলান দিয়ে বসেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেল মুসার।

'আসে না কেন ব্যাটা?' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'বাঁকা হয়ে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। মুসা আছে আরামে...'

কথা শেষও হলো না তার। কি যেন একটা নড়ে উঠল গাছের ডালে। সেদিকে তাকাল দু'জনে। কিশোর বলল, 'রেডি! এসে গেছে! পালাতে দেয়া চলবে না!'

ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে এগিয়ে এল একটা কালো ছায়া। দু'জনের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে লাফিয়ে নামল মাটিতে। ব্যাগটা তুলে নিয়েই চোখের পলকে উঠে গেল আবার ডালে।

'সেই বানরটা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'গেল তো নিয়ে! ধরতে পারলাম কই?'

'না পারলেও একেবারে বিফল হইনি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, সিনডার যে-ই হোক, তার সাথে সম্পর্ক আছে ডেংগু পারভির। সব কিছুই এখন সরাসরি আঙুল দেখাচ্ছে অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের দিকে।'

এই সময় দৌড়ে এল মুসা। সে-ও দেখেছে, গাছ থেকে একটা জীব নেমে এসে ব্যাগটা তুলে নিয়ে গেছে। হাউলার মাংকির গল্প কিশোর আর রবিনের মুখে শুনেছে সে। দুয়ে-দুয়ে চার করে মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি। বুঝতে পেরেছে ব্যাগটা কে নিয়ে গেল।

হুইসপারউডে ফিরে চলল ওরা।

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে এই সময় ফোন এল মুসার। সেই লোকটা। কড়া গলায় বলল, 'কাল রাতে বেশ ভালই একটা চালাকি করেছ। তবে এটাই শেষ বলে দিলাম। আর যদি করো,' হুমকি দিল সে, 'ভাল হবে না। আবার যোগাযোগ করব আমি। যা দিতে বলব ঠিক তাই দেবে। আরেকবার গলফ বল আর ইঁট দিয়ে আমাকে ঠকাবে, তা হবে না।'

কেটে গেল লাইন।

কিশোর আর রবিনকে জানাল মুসা লোকটা কি বলেছে।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। মুখ তুলল, 'যোগাযোগ করুক আগে, বলুক, তারপর বুদ্ধি আরেকটা বের করা যাবে। তুমি থাকো এখানেই, ফোনের অপেক্ষা করো। আমি আর রবিন অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে যাবো তদন্ত করতে।'

'আচ্ছাহ্,' বসে থাকতে ভাল লাগবে না মুসার, তবু থাকতেই হবে। আর কারও সঙ্গে নিশ্চয় কথা বলবে না লোকটা।

হেলথ ক্লাবে এসে এরিক জুনেকারের সঙ্গে দেখা করল কিশোর। বলল, গলফ খেলার অনুমতি চায়।

'ইমপসিবল!' বললেন জুনেকার। 'এখানে শুধু মেম্বাররাই খেলতে পারে।' ডেস্কে রাখা একটা রেজিস্টারে চাপড় দিয়ে বললেন, 'এই খাতায় যাদের যাদের নাম লেখা আছে।'

'কোন মেম্বারের মেহমান হলে?'

'তাহলে পারবে।'

'খাতাটা দেখতে পারি?' রেজিস্টারটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'পরিচিত কেউ

বেরিয়েও যেতে পারে।'

'নাও,' ঠেলে দিলেন জুনেকার।

দ্রুত তালিকায় চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। পাশে থেকে ঝুঁকে এসে রবিনও দেখতে লাগল। ওর চোখেই প্রথমে পড়ল নামটা। ডানিয়েল রেমন।

জুনেকারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মিস্টার রেমনের রেফারেন্সে খেলতে পারব? তিনি আমাদের পরিচিত।'

'পারবে। তবে মিস্টার রেমন যদি আমাকে বলেন। সরি, কিছু মনে করো না। ভাবছ হয়তো বেশি কড়াকড়ি করছি। আসলে এটাই নিয়ম।'

'না না, কিছু মনে করছি না।' টেলিফোন সেটের দিকে হাত বাড়াল কিশোর, 'তিনিই বলবেন আপনাকে। কিন্তু মিস্টার রেমনকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। জুনেকারকে বলল সেকথা।

'সরি,' জুনেকার মাথা নাড়লেন। তাঁর কথা ছাড়া...'

হাত নেড়ে কিশোর বলল, 'থাক, জোরাজুরি করব না। নিয়মের বাইরে কিছু করতে বলছি না আপনাকে। আচ্ছা, মিস্টার রেমনের ছেলে পিটারও কি গলফ খেলে?'

'না। বড়জোর টেবিল টেনিস। তা-ও অন্য কারও সাথে খেলে না। আমাদের এখানকারই এক কর্মচারী, মিক ডরমারের সাথে কেবল খেলে।'

'ডরমার? আছে এখন?'

'আছে। লকার রুমে। দেখা করতে চাও?...বেশ, ওই দরজাটা দিয়ে চলে যাও। পেয়ে যাবে।'

'থ্যাংকস।'

লকার রুমেই পাওয়া গেল মিককে। হালকা-পাতলা অল্পবয়েসী একজন লোক, গলফ খেলার কিছু সরঞ্জাম লকারে তুলে রাখছে। শব্দ শুনে তাকাল।

পনেরো

'আপনি মিক ডরমার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

চোখের ওপর থেকে লম্বা চুল সরিয়ে ভাল করে তাকাল মিক, 'হ্যাঁ। কি করতে পারি তোমার জন্যে? গলফ খেলবে?'

'না, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম,' রবিন বলল।

'কি কথা?'

'মিস্টার রেমন কি এখানে খেলতে আসেন?'

'আসেন। তবে খুব একটা পারেন না। সব সময়ই হারেন। ভীষণ বদমেজাজী। হেরে গিয়ে মাঝে মাঝেই বল, ব্যাট, সব ছুঁড়ে ফেলে দেন পানিতে।'

'তাঁর ছেলে পিটারকে কেমন মনে হয়?' জানতে চাইল কিশোর।

'ভাল। বাপের চেয়ে ছেলেটা অনেক ভাল স্বভাবের। তবে গলফ খেলে না। কেবল টেবিল টেনিস। আমার সাথেই খেলে।'

'তার মানে বন্ধুত্ব আছে আপনার সাথে?'

'আছে।'
'নিশ্চয় মনের কথাও বলে আপনাকে?'
'বলে। ছেলেটার মনে অনেক দুঃখ। বাড়িতে শান্তি নেই। বাপের সাথে বনিবনা নেই। একেক সময় নাকি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে।'
'কোথায় যেতে চায় বলেছে কখনও?'
'অনেক জায়গার কথাই তো বলেছে।' কপাল কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল মিক, 'দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ, ভারত, শ্রীলংকা, হংকং...'
'ব্র্যাজিল?'
'অ্যাঁ? হ্যাঁ, মনে হয় বলেছে। ভুলে গেছি।'
মিকের কাছ থেকে মূল্যবান কোন তথ্য জানা যাবে না, বুঝতে পারল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'হাউলার মাংকির কথা কিছু জানেন?'
খুব সামান্য হলেও চমকে গেল মনে হলো লোকটাকে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। মাথা ঝাঁকাল, 'শুনেছি, আমাজনের জঙ্গলে পাওয়া যায় ওই বানর। টেলিভিশনেও ডকুমেন্টারি দেখেছি।'
নাহ্, কিছু জানা থাকলেও এই লোকের পেট থেকে কথা আদায় করা যাবে না। সাংঘাতিক ধুরন্ধর। বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। কোথাও লুকিয়ে থেকে ক্লাব হাউসটার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব রবিনকে দিয়ে থানায় চলল কিশোর। মিসেস রেমনের ব্যাপারে কিছু জানা গেছে কিনা খোঁজ নেবে।
চীফ নিকলসনকে অফিসেই পেল। তিনি বললেন, খোঁজ নেয়ার জন্যে অফিসার পঠিয়েছেন। এখনও ফেরেনি। ইচ্ছে করলে কিশোর বসতে পারে।
বসল কিশোর।
ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে এলেন অফিসার ফ্র্যাংক নরিস, যাঁকে তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্ট দিলেন চীফকে, মিসেস রেমনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের লোকেরা। আশপাশের অনেককে জিজ্ঞেস করেছেন, কেউই ওরকম চেহারার কোন মহিলাকে গলফ কোর্সের ভেতরে বা বাইরে দেখতে পায়নি। জুতোর মাপও নিয়েছেন হুইসপারউডে মিস্টার রেমনের বড়িতে গিয়ে। মেলে না। ডোবায় পাওয়া জুতো মিসেস রেমনের জুতোর চেয়ে অন্তত দুই নম্বর বড়। আরেকটা খবর পেয়েছেন। কয়েক রাত আগে একজন মহিলাকে গলফ কোর্সের ধার দিয়ে ছুটে যেতে দেখা গেছে। হেলথ ক্লাবের একজন কর্মচারীই এই খবরটা দিল। কিন্তু মহিলা দেখতে কেমন বলতে পারল না। অন্ধকার ছিল তো, চেহারা দেখতে পায়নি।
আর বসে থেকে লাভ নেই। নিকলসনকে ধন্যবাদ দিয়ে থানা থেকে বেরোল কিশোর। কি করবে এখন? গেস্টহাউসে ফিরে যাবে? এত তাড়াতাড়ি গিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে মুসাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেবে ফোনটোন পেয়েছে কিনা সে, তারপর চলে যাবে গলফ কোর্সে। রবিনের সঙ্গে বসে সে-ও নজর রাখবে।
একটা ফোন বুদ থেকে ফোন করল কিশোর। মুসা জানাল, ফোন করেনি লোকটা। বসে থেকে থেকে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার, বেরিয়ে পড়তে চায়। তাকে বেরোতে মানা করে দিল কিশোর। যতক্ষণ না ফোন আসে বসে থাকতেই

হবে। তার বিশ্বাস, ফোন করবেই লোকটা।

লাইন কেটে দিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এল সে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল গলফ ক্লাবে যাওয়ার জন্যে।

হেলথ ক্লাবে এসে কোথাও রবিনকে দেখতে পেল না সে। গেল কোথায়? অনেক খুঁজল। কোথাও না পেয়ে শেষে ধরেই নিল গেস্টহাউসে চলে গেছে। ফোন করে জেনে নেবে? না, দরকার নেই। এখনও গিয়ে পৌঁছে না থাকলে কিছু বলতে পারবে না মুসা। তার চেয়ে তারও চলে যাওয়া ভাল। গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোবে। তেমন বুঝলে আজ রাতেও ক্লাব হাউসের ওপর নজর রাখবে।

গেস্ট হাউসে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। মুসার চেহারা দেখেই অনুমান করল কিছু একটা ঘটেছে। প্রায় ছুটে এল মুসা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কিশোর, লোকটা ফোন করেছিল!'

'কি বলে?'

'রবিনকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা! পিস্তলটা চায়। না দিলে নাকি রবিনের ক্ষতি হবে। কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না ওটা আমাদের কাছে নেই!'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলেছে?'

'একটা ঠিকানা দিয়েছে। ওখানে পিস্তলটা নিয়ে গিয়ে রবিনকে মুক্ত করে আনতে বলেছে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'আবার থানায় যেতে হবে। পিস্তলটা নিতে হবে চীফ নিকলসনের কাছ থেকে।'

'কিন্তু পুলিশের কাছে যেতে মানা করেছে ওরা...'

'না গেলে পিস্তল নেব কি করে?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারছি না!'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। ভাবছে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছে। শেষে বলল, 'মিস্টার সাইমনকে ফোন করব। দেখি, তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা।'

বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার সাইমনকে। ফোন ধরলেন। সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভেব না। ব্যবস্থা করছি। ল্যারিকে পাঠাচ্ছি। সে তোমাদের সাথে যাবে দরকার হলে। পুরানো পিস্তলও জোগাড় করা যাবে। নিয়ে যাবে সে। এইবার ধরতে হবে ব্যাটাকে। তোমরা তৈরি থাকো।'

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। মুসাকে জানাল, ল্যারি আসছে পুরানো একটা পিস্তল যোগাড় করে নিয়ে।

মিস্টার সাইমনের পাইলট এবং সহকারী ল্যারি কংকলিন। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। ভরসা করা যায় তার ওপর।

আপাতত ল্যারি কংকলিনের আসার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই কিশোর আর মুসার।

আসতে অনেক দেরি করে ফেলল ল্যারি। পিস্তল জোগাড় করতেই দেরি হয়ে গেছে।

হাতে নিয়ে অস্ত্রটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ডোবায় যেটা পেয়েছিল সেটার মতই চেহারা। মুখ তুলে বলল, 'সিরিয়াল নম্বর যদি ওদের মনে থাকে তাহলেই মুশকিলে পড়ব।'

'কিছু করার নেই,' মুসা বলল। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। কোনভাবে তো আগে ঢুকি ব্যাটাদের আড্ডায়, তারপর বোরোনোর উপায় একটা হয়েই যাবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তো, যাচ্ছি কিভাবে আমরা? একসাথে?'

'না, তোমার ভটভটি নিয়ে তুমি আগে যাবে,' মুসার ঝরঝরে জেলপিটার কথা বলল কিশোর। 'আমি আর ল্যারি যাব পেছনে! কোনভাবেই ওদের সন্দেহ জাগানো চলবে না। তুমি আগে ঢুকবে। তারপর সুযোগ বুঝে আমরাও ঢুকে পড়ব।'

ছোট একটা ব্রিফকেসে পিস্তলটা ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মুসা। তার পেছনে ল্যারির কনভার্টিবল নিয়ে চলল কিশোর আর ল্যারি।

শহরের একধারের পুরানো একটা র‍্যাঞ্চের ঠিকানা দিয়েছে লোকটা। অনেক আগে ওটা র‍্যাঞ্চ ছিল, হাত বদল হওয়ার পর ওখানে করা হলো ডেইরি ফার্ম। চলেনি বোধহয়, কিংবা অন্য কোন কারণে ফার্ম তুলে দিল মালিক। এখন এমনিই পড়ে আছে। বাতিল, পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না মুসার। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতেই রাস্তা বলে দিল। মেইন রোড থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক যেতে হলো কাঁচা রাস্তা ধরে। দেখতে পেল গাছপালায় ঢাকা গোলাবাড়ি আর ছাউনিগুলো।

ভাঙা গেট। পাল্লা কাত হয়ে ঝুলছে। ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা। মূল বাড়িটার সামনে নিয়ে গিয়ে গাড়ি রাখল। ব্রিফকেস হাতে নামল। দ্বিধা করল একবার। তারপর এগোল বাড়িটার দিকে।

র‍্যাঞ্চটা দেখা যেতেই গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে ল্যারি। ওখানেই গাড়ি রেখে সে আর কিশোর নামল। গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোল বাড়ির দিকে। মুসাকে ঢুকে যেতে দেখল মূল বাড়ির ভেতরে।

ঘরের ভেতর আবছা আলোয় রবিনকে চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে দেখল মুসা। আর কেউ নেই। রবিনকে একা রেখেই চলে গেছে? বিশ্বাস হলো না। নিশ্চয় ধারেকাছে কোথাও লুকিয়ে আছে লোকটা। মুসা পুলিশ নিয়ে এসেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করবে। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে তারপর সামনে আসবে।

ভেতরে ঢুকল মুসা। রবিনের মুখে কাপড় গোঁজা। চোখাচোখি হলেও কথা বলতে পারল না রবিন।

'কই,' জিজ্ঞেস করল মুসা রবিনকেই, 'পিস্তল যে আনতে বলল সে কই?' এগিয়ে গিয়ে রবিনের মুখ থেকে কাপড় বের করে আনল।

জোরে জোরে কয়েকবার দম নিল রবিন। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'জানি না। ছিল এতক্ষণ। তোমার গাড়ির শব্দ শুনেই লুকিয়েছে।'

'পিস্তল এনেছ?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল মুসা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। মিক ডরমার!

'আ-আপনি ফোন করেছিলেন?'

'না,' মুচকি হাসল লোকটা। 'তবে আমাকে এখানে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিস্তল এনেছ?' হাত বাড়াল সে।

নীরবে ব্রিফকেসটা বাড়িয়ে দিল মুসা।

ডালা খুলল মিক। পিস্তলটা বের করে হাতের তালুতে নিয়ে দেখতে লাগল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'দেখে তো ঠিকই লাগছে।'

'রবিনকে তাহলে নিয়ে যেতে পারি?'

মুখ তুলল মিক। কুটিল হাসি হাসল। 'এত তাড়াতাড়ি? থাক না ক'দিন আমাদের মেহমান হয়ে। বস্ যদি বলেন ছেড়ে দিতে ছেড়ে দেব। তবে অনেকু বেশি জ্বালাতন করেছ তোমরা। ছাড়বেন বলে মনে হয় না।'

প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল মুসা। ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে গেল মিকের দিকে।

'খবরদার!' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, আরেকজন লোক ঘরে ঢুকেছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। বিস্মিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'মিস্টার পারভি? আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি,' শয়তানী হাসিতে ভরে গেছে ডেংগু পারভির মুখ। 'ধরা তাহলে পড়লে শেষ পর্যন্ত।' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বন্ধু কোথায়? আসল বিচ্ছুটা?'

'কার কথা বলছেন?'

'আহা, ন্যাকা, যেন কিছুই জানে না। কিশোর পাশার কথা বলছি। কনভার্টিবলটা ঠিকই দেখেছি রাস্তায় থামতে। নিশ্চয় ওই ছেলেটা অনুসরণ করে এসেছে তোমাকে। আর কেউ রয়েছে নাকি সাথে?'

মুসা বুঝতে পারল, ল্যারিকে দেখেনি পারভি। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, আর কেউ নেই। পুলিশকে জানাইনি আমরা।'

'বোকামি করেছ,' আবার খিকখিক করে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল পারভি। 'যাও, তোমার বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসো। কোন চালাকির চেষ্টা করবে না। তাহলে ও মরবে,' রবিনকে দেখাল সে।

ডেকে আনতে হলো না কিশোরকে। ঢুকে পড়ল ঘরে। বলল, 'আমি এসেছি। কি বলবেন?'

'বাহ্, চমৎকার! এই না হলে প্রাণের দোস্ত। গুড। দাঁড়াও, আগে পিস্তলের নম্বরটা দেখি, তারপর বলব কি করা হবে।'

পিস্তলের নম্বরটা দেখে হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল পারভির মুখ থেকে। চিৎকার করে বলল, 'আবার ফাঁকি! শয়তানের চ্যালা! আজ তোদের ছাড়ব না...' বলতে বলতেই পিস্তল তাক করল সে কিশোরের দিকে।

একসঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে গেল কিশোর। পারভিকে সই করে ঝাঁপ দিল মুসা। গুলি ফুটল বিকট শব্দে। ঘরে ঢুকল ল্যারি কংকলিন। তার হাতেও পিস্তল।

কিশোরের গায়ে গুলি লাগেনি। পারভির পিস্তলধরা হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে মুসা, যাতে আর গুলি করতে না পারে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকার মত

দাঁড়িয়ে আছে মিক। তারপরেও বাঁচতে পারল না সে, ল্যারির পিস্তলের বাড়ি খেতেই হলো। বেহুঁশ হয়ে গেল।

মুসা, কিশোর, ল্যারি, তিনজনের বিরুদ্ধে একজন। কিছুই করতে পারল না পারভি। পরাস্ত হয়ে ধরা দিতে হলো।

ষোলো

'পারভি তোমার কাছে কি কি কথা জানতে চেয়েছে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

পারভি আর মিককে ধরে হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল ওরা। তারপর পুলিশকে খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে বন্দিদেরকে নিয়ে গেছে। ওরা, মানে তিন গোয়েন্দা আর ল্যারি চলে এসেছে মিস্টার রেমনের বাড়িতে, গেস্ট হাউসে। তিনি বাড়িতে নেই, কাজেই ডেংগু পারভিকে ধরার কথাটা জানানো যায়নি।

আসার পথেই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এসেছে। কাজেই এখন আর খাওয়ার ঝামেলা নেই। আলোচনায় বসল। একই সঙ্গে বিশ্রামও হয়ে যাচ্ছে।

রবিন জবাব দিল, 'মিস্টার সাইমনের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে জানে। তিনি যে পাসপোর্ট জালিয়াতদের ধরতে চাইছেন, একথাও জানে। সে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করল।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁট টান দিয়ে একবার ছেড়ে দিল কিশোর, 'জানে তাহলে!'

'ভালমত জানে।'

'আর কি জিজ্ঞেস করল?'

'মিস্টার সাইমন এখন কোথায়? আমাদের সাথে যোগাযোগ আছে কিনা, এসব।'

'আমাদের সন্দেহই তাহলে ঠিক হলো। পাসপোর্ট জালিয়াতিতে সে-ও আছে।'

'আছেই তো,' মুসা বলল। 'নইলে এত কৌতূহল কেন?'

'আর কি?' ল্যারি জানতে চাইল।

'পিটারের কথা। সে কোথায়? কি করছে? কখন বাড়ি ফিরবে? এসব প্রশ্ন।'

'আশ্চর্য!' শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এসব তো তারই জানার কথা। তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কেন? অবশ্য চালাকি হতে পারে। এসব জিজ্ঞেস করলে হয়তো তুমি ভাববে পিটারের ব্যাপারে সে কিছু জানে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ল্যারি।

কিশোর বলল, 'পারভি ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু রহস্যগুলোর সমাধান এখনও হয়নি। পিটার কোথায় জানি না। তার মা কোথায় জানি না। পাসপোর্ট জালিয়াতদের বস্‌কে জানা যায়নি। হাউলার মাংকিটাও একটা বিরাট রহস্য…'

'আরি, ভুলেই গিয়েছিলাম!' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। উঠে গিয়ে ড্রয়ার টেনে বের করল এয়ারপোর্টে বানরের খাঁচা থেকে পড়ে যাওয়া মুখোশটা। 'এটা তো একটা সূত্র। দেখো তো, কিছু বের করা যায় কিনা?'

'দেখি,' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ল্যারি, হাত বাড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে?'

সব কথা খুলে বলল কিশোর আর রবিন।

'আমার কি মনে হয় জানো? সব কিছুর জবাব পাওয়া যাবে ওই অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে। ওটার ওপর নজর রাখতে বলেছেন আমাকে মিস্টার সাইমন। তাই রাখছি। রোগী হিসেবে যোগ দিয়েছি ওখানে। দু'হপ্তা ধরে বাতের চিকিৎসা করাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল ল্যারি। মুখোশটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'থাক এটা আমার কাছে। কাজে লাগতে পারে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ক্লাবে।'

'ওটার ওপর নজর পড়ল কেন মিস্টার সাইমনের?'

'বলতে পারব না। নিশ্চয় গোপনে কোন খবর পেয়েছেন। ইনফর্মারের তো অভাব নেই তাঁর। চলি। ওখানে গিয়ে তদন্ত চালাই। বলা যায় না, পিটারকেও পেয়ে যেতে পারি ওখানে। পেলে তোমাদের জানাব। তোমাদেরও জানা থাকল, আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'ওই ক্লাবটা তো মনে হয় পারভির হেডকোয়ার্টার। যদি তার দলের কেউ আপনাকে চিনে ফেলে?'

'এতদিন যখন পারেনি আর পারবে না। পারভি রয়েছে হাজতে। সে যে এসে চিনবে তারও কোন উপায় নেই। যাই হোক, সাবধানেই থাকব।'

বেরিয়ে গেল ল্যারি।

কেসটা নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করল তিন গোয়েন্দা। সেদিন আর নতুন কিছু ঘটল না।

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে ওরা এই সময় বাজল টেলিফোন। কিশোরই ধরল, তাকেই চাইছেন চীফ নিকলসন। বললেন, 'কিশোর? সাংঘাতিক খবর আছে!'

নতুন কিছু জানতে পারলে যেন তাকে জানায় এই অনুরোধ করে এসেছিল কিশোর। কথা রেখেছেন চীফ। 'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল সে।

'টেলিফোনে বলব? না আসবে?'

'আসছি।'

'আমাদের রেকর্ডে নেই,' নিকলসন বললেন। তাঁর টেবিলের সামনে তিনটে চেয়ারে বসেছে তিন গোয়েন্দা। 'তাই পারভির আঙুলের ছাপ তুলে নিয়ে এফ বি আই-এর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আশ্চর্য এক রিপোর্ট দিল ওরা?'

'কি?' প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দা।

টেবিলে রাখা ফাইলটা খুললেন চীফ। একটা ফটোগ্রাফ বের করে ঠেলে দিলেন ছেলেদের দিকে। 'দেখো।'

'আয়রনিং সিনডার,' রবিন বলল। 'আগেও দেখেছি।'

'দেখেছ.' মাথা ঝাঁকালেন নিকলসন।

'ব্যাপারটা কি বলুন তো, স্যার?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ডেংগু পারভি আর আরনিং সিনডারের আঙুলের ছাপ অবিকল এক।'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। তারপর মুসা বলল, 'ইমপসিবল! দু'জন লোকের আঙুলের ছাপ এক হতেই পারে না!'

'অথচ হয়েছে,' মিটিমিটি হাসছেন চীফ।

কিশোর বলল, 'তার মানে পারভি আর সিনডার একই লোক।' ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল সে।

'তা কি করে হয়?' মুসার প্রশ্ন, 'পারভির মুখ আরেকটু চাপা।'

'নাকও আরও খাটো,' বলল রবিন।

'ভুরুর কাছটাও অন্য রকম।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন নিকলসন। 'তাছাড়া পারভির চুলও কালো, সোনালি নয়। চুলের রঙ অবশ্য ডাই করে বদলে ফেলা যায়। কিন্তু চেহারা?'

'প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে,' কিশোর বলল।

'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি। আজকাল তো এটা কোন ব্যাপারই না,' হাত নাড়লেন নিকলসন। 'এমন করে বদলে ফেলে চেহারা, নিজের মাও চিনতে পারে না। দিব্যি তখন পুলিশের নাকের ওপর দিয়েই ঘুরে বেড়ায়। তবে একটা জিনিস মিলছে না, আচরণ। পারভিকে মনে হচ্ছে খুব ভদ্র, চালাক। কিন্তু রেকর্ড বলে, সিনডার ছিল ঠিক উল্টো।'

'হতে পারে, আচরণও বদলে ফেলেছ,' রবিন বলল। 'তার নতুন দলের সদস্যরা হয়তো অন্য রকম, তাদের সাথে থাকতে থাকতে...এই, কিশোর, কি ভাবছ?'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর। যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে উঠে এল। 'উঁ? ও, পিটার রেমন?'

'মানে? এখানে মিস্টার রেমনকে পেলে কোথায়? কথা হচ্ছে পারভিকে নিয়ে।'

'রবিন, পিটারের কবিতাটা তোমার মনে আছে?'

'আছে। কেন?'

'কবিতা?' নিকলসন বুঝতে পারছেন না।

'পিটারের ঘরে তার লেখা একটা কবিতা পেয়েছিলাম আমরা। লিখেছিল, আমার জীবনটা একটা দেয়ালে ঘেরা নগরী/পালাতেই হবে আমাকে এখান থেকে/যতক্ষণ আমি আমি থেকে যাব/ জেলখানাই রয়ে যাবে এটা আমার।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন চীফ। 'আমি আমি থেকে যাব...মানে আসল চেহারা থাকবে...তুমি বলতে চাইছ সে-ও প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে চেহারা বদলে নিয়েছে যাতে চোখের সামনেই লুকিয়ে থাকতে পারে!'

'অসম্ভব কি?' উঠে দাঁড়াল কিশোর। উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল। 'অতিকল্পনাও বলতে পারেন। তবে সম্ভাবনাটা ফেলে দেয়া যায় না। পারভি চেহারা বদলেছে। তার দলে যদি যোগ দিয়ে থাকে পিটার তাহলে সে-ও বদলাতে পারে। পারে না?'

'জানি না,' নিজের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বললেন নিকলসন। 'পিটার

যদি চেহারা বদল করেই মুক্তি পেতে চায় তাহলে তাকে কিডন্যাপ করতে যাবে কেন পারভি?'

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা দরকার,' পরামর্শ দিল রবিন।

'সে মুখ খুলছে না,' নিকলসন বললেন। 'চ্যালাটাকে জিজ্ঞেস করা দরকার। ওকে এখনও কিছু জিজ্ঞেস করিনি। চলো, দেখবে।'

চীফকে ঢুকতে দেখে ভয়ে ভয়ে তাকাল মিক। তিন গোয়েন্দার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। তাকে বললেন চীফ, 'দেখো, উল্টোপাল্টা কিছু বললে এখন সবই তোমার বিরুদ্ধে যাবে। তার চেয়ে যা জিজ্ঞেস করি, জবাব দাও, তোমার ব্যাপারে ভাল রিপোর্ট দেব। বলব, তুমি পুলিশকে সাহায্য করেছ। তাতে সাজা কমতে পারে।'

'কি জানতে চান?'

'প্রথমেই অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের কথা। কি কি চলছে ওখানে?'

'চলছে তো অনেক কিছুই। চমকে দেয়ার মত খবর আছে আমার কাছে।'

'বলে ফেলো, শুনি।'

'অত বোকা ভাববেন না আমাকে। ইনফর্মারদের অবস্থা কি হয় জানা আছে। জেলে আর কতদিন থাকব? একসময় না একসময় ছাড়া পাবই। কেটে তখন টুকরো টুকরো করে আমার লাশ বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দেয়া হবে।'

'তারমানে,' কিশোর বলল, 'তুমি বলতে চাইছ গলফ কোর্সের পানিতে ওরকম বস্তা খুঁজলে পাওয়া যাবে। পিটারকে বস্তায় ভরে ফেলে দেয়া হয়েছে।'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। উকিলকে ছাড়া আমি কোন কথাই বলব না।'

চাপাচাপি করে, লোভ দেখিয়ে, কিছুতেই কিছু হলো না। আর একটা কথাও বের করা গেল না মিকের মুখ থেকে।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে অফিসে ফিরে এলেন আবার চীফ। 'একটাই করার আছে এখন। সার্চ ওয়ারেন্ট তৈরি করে অলিম্পিক হেলথ ক্লাবে চলে যাওয়া। পানিতে একটা বেআইনী পিস্তল পাওয়া গেছে। তদন্ত করতে ঢোকার ছুতো আছেই।'

'আমাদেরকে নেবেন সঙ্গে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'চলো। এ কেসের প্রায় সবকিছুই তো তোমরা করলে। দেখো, আরেকটু সাহায্য করতে পারো কিনা।'

'পারব,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।

ওয়ারেন্ট তৈরি করে পুলিশের দু'জন ডিটেকটিভকে সঙ্গে নিয়ে হেলথ ক্লাবে চললেন নিকলসন। তিন গোয়েন্দাও পুলিশের গাড়ির পিছে চলল ওদের গাড়িতে করে। ক্লাব হাউসে ঢুকতেই সামনে পড়লেন ম্যানেজার এরিক জুনেকার। আসার কারণ জানালেন চীফ।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ম্যানেজারের চেহারা। বললেন, 'ঠিক আছে, যান। তবে কিছু পাবেন না।'

ম্যানেজারের অফিস থেকেই খোঁজা শুরু করল দুই ডিটেকটিভ। তিন গোয়েন্দা গেল অন্যদিকে, অবশ্যই চীফের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে। সুইমিং পুলের কাছে

চলে এল ওরা। জনাকুড়ি লোককে দেখা গেল পানিতে, কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ পানির নিচে নাক নিয়ে গিয়ে চুপচাপ ভাসছে।

এখানে কিছু নেই। এক্সারসাইজ রুমের কাছে চলে এল ওরা। দরজা দিয়েই দেখতে পেল ব্যায়াম করছে কয়েকজন লোক।

'এখানেও কিছু পাওয়া যাবে না,' রবিন বলল।

এরপর জিমনেশিয়ামে এল ওরা। দুটো দল বাস্কেটবল খেলছে। আর চারজন লোক খেলছে মেডিসিন বল। নেই। কিছু নেই এখানেও।

দুই সহকারীকে নিয়ে স্টীমরুমে চলল কিশোর। ভারি তোয়ালে জড়িয়ে চুপচাপ বসে স্টীম নিচ্ছে তিনজন লোক। ল্যারিকে চিনতে কোনই অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। এমন ভান করল পাইলট, যেন চিনতেই পারেনি। আরেক দিকে তাকিয়ে যেন আনমনেই বলল, 'বাপরে বাপ! দম বন্ধ হয়ে আসে! ভেনটিলেশন সিসটেম আরও ভাল করা উচিত।'

ল্যারির দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর সহকারীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, এখানে ভীষণ গরম।'

বাইরে বেরিয়েই নিচু গলায় বলল সে, 'ওই কথা বলে নিশ্চয় কিছু বোঝাতে চেয়েছে আমাদেরকে ল্যারি। কোন সূত্র দিতে চেয়েছে। নইলে কথা বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না তার।'

'কি বোঝাতে চাইল?' মুসার প্রশ্ন।

শ্রাগ করল কিশোর, 'বুঝতে পারছি না। কথাটা মনে গেঁথে রাখো। সময়মত জবাব পেয়ে যাব।'

'চলো,' রবিন বলল, 'পুলিশ কি আবিষ্কার করল দেখি।'

ম্যানেজারের অফিসে এসে ওরা দেখল, মিককে নিয়ে কথা হচ্ছে। জুনেকার বলছেন, 'ওই ব্যাটাকে তো চাকরি থেকেই বরখাস্ত করেছি আমি। যখন বুঝলাম শয়তান লোক, আর এক মুহূর্তও রাখিনি।'

'ডেংগু পারভিকে চেনেন?'

'না।'

'আরনিং সিনডারের নাম শুনেছেন?'

'না। তবে, অনেক লোকই তো আসে যায় এখানে, চিকিৎসা করায়, হয়তো ওরা দু'জনও এসেছিল। কতজনের নাম মনে রাখা যায় বলুন?'

খোঁজা শেষ করে ফিরে এল ডিটেকটিভরা।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করলেন নিকলসন।

না। কিচ্ছু নেই,' জবাব দিল একজন। 'একেবারে ধোয়ামোছা।'

একবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন ম্যানেজার। 'আপনারা কি খুঁজতে এসেছেন বলুন তো? কি পাবেন আশা করেছিলেন?'

'না, নির্দিষ্ট কোন কিছু না,' জবাব দিলেন চীফ। 'আপনার গলফ কোর্সে একটা ডোবায় একটা পিস্তল পাওয়া গেছে যে, ওটার ব্যাপারেই তদন্ত।'

'তাহলে সন্তুষ্ট হয়েছেন আশা করতে পারি,' কঠিন হয়ে উঠল ম্যানেজারের

কণ্ঠস্বর, চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাও নেই আর। 'কাজ শেষ হলে দয়া করে আপনারা যান। পুলিশ দেখলে বিরক্ত হতে পারে আমার মেম্বাররা।'

'অল রাইট, মিস্টার জুনেকার,' নিকলসন বললেন, 'যাচ্ছি। বিরক্ত করার জন্যে...'

এই সময় বাজল টেলিফোন। তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন জুনেকার। ওপাশের কথা শুনে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলেন চীফের দিকে, 'আপনার।'

শুনতে শুনতে চেহারায় রক্ত জমল নিকলসনের, রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিয়ে ডিটেকটিভদের দিকে ফিরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'জলদি চলো!'

ক্লাবহাউস থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড় দিলেন গাড়ির দিকে চীফ। পাশে ছুটতে ছুটতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'ডেংগু পারভি পালিয়েছে!'

'কি করে!'

'পালাতে সাহায্য করা হয়েছে।'

'তার দলের লোক?'

'তার দলেরই। তবে লোক নয়। একটা বানর!'

সতেরো

খবরটা তিন গোয়েন্দাকেও তাজ্জব করে দিল।

'কিভাবে সাহায্য করল?' জানতে চাইল রবিন।

'ওখানে না গেলে বলতে পারব না,' নিকলসন বললেন। স্কোয়াড কারে উঠে দুই ডিটেকটিভকে নিয়ে থানায় রওনা হয়ে গেলেন। পেছনে আগের মতই নিজেদের গাড়িতে চলল তিন গোয়েন্দা।

চীফকে ফোন করেছিল অফিসার ওয়েবলি। অফিসে নিকলসনের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কি করে পালিয়েছে পারভি জানা গেল তার কাছে। বলল, 'ছাত থেকেই সম্ভবত পাইপ বেয়ে নেমেছিল বানরটা। ভেন্টিলেটর দিয়ে ঢুকে সেলের সামনে চলে গেল। শিকের বাইরে থেকেই একটা বোমা আর পিস্তল দিল পারভিকে।'

'তারপর?' জানতে চাইল রবিন।

ওয়েবলি বলল, 'তালার নিচে বোমাটা রেখে তালা ভাঙল পারভি। আশেপাশে যারা ডিউটিতে ছিল দৌড়ে গেল দেখতে। প্রচুর ধোঁয়া, বালি আর প্ল্যাস্টার খসে পড়তে দেখল তারা।'

'পারভি তখন কোথায় ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বিছানার তলায়। বেরিয়ে এসে পিস্তল দেখিয়ে অস্ত্র ফেলতে বাধ্য করল গার্ডদের। ওদেরকে আরেকটা ঘরে তালা দিয়ে রেখে বানরটাকে নিয়ে পালাল।'

'বানরটা দেখতে কেমন?' জানে কি জবাব পাবে, তবু জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অত ভয়ংকর বানর নাকি আর দেখেনি ওরা। দাঁত খিঁচিয়ে মুখ ভেঙচে ভয় দেখাতে লাগল। কাছে গেলে কামড়ে দিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'ওই বানরটাই!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।
'কোনটা?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল ওয়েবলি।
'আমাদের পরিচিত একটা হাউলার মাংকি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওটার সাথে এটার বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।'
'আরও একটা ব্যাপার হতে পারে,' রবিন বলল। 'বানরটা হয়তো আদপে বানরই না। মুখোশ পরা মানুষ।'
'এ তো আবার নতুন কথা শোনাচ্ছ,' অবাক হলো ওয়েবলি। 'কেন একথা বলছ জানি না, তবে তোমার অনুমান ভুল। কারণ এটা ফুট তিনেক লম্বা, মানুষ অত খাটো হয় না। তাছাড়া লম্বা লেজ আছে। যাই হোক, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল পারভির জন্যে। বানরটাকে নিয়ে উঠে পড়ল তাতে। চলে গেল গাড়িটা। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা, কিছুই করতে পারলাম না আমরা।'
'মিকও পালিয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।
'না, তাকে ফেলে গেছে পারভি। নেয়ার চেষ্টাই করেনি। মিকের সেলে পাহারা বাড়িয়ে দিয়েছি আমি।'
আর কিছু জানার নেই। তিন গোয়েন্দার কিছু করারও নেই এখানে। কয়েদী পালিয়েছে, এখন যা করার পুলিশই করবে। হুইসপারউডে ফিরে চলল ওরা।
গেস্টহাউসে ঢুকেই ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ল মুসা। 'আমার মাথা গরম হয়ে গেছে, পেটের মধ্যেও গুড়ুগুড়ু। রবিন, ভাই আমার, তোমার রান্নার তো সুনাম আছে। কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ দাও না বানিয়ে। চলো, আমিও তোমাকে সাহায্য করি।'
রবিনও মুসার মতই শ্রান্ত, তারও খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে রওনা হলো দু'জনে। পেছন পেছন এল কিশোর। মুসাকে বলল, 'এত ঝামেলায়ও তোমার ক্ষুদা নষ্ট হয়নি।'
'তোমার হয়েছে?'
'নাহ্। তবে আরও অনেকক্ষণ না হলেও কিছু হবে না। থাকতে পারব।'
'তুমি হলেগে কিশোর পাশা, তোমার কথাই আলাদা। আমি সাদাসিধা মুসা আমান, পৃথিবীতে এত কষ্টের মধ্যে আছি। সামান্য খাবারটাও যদি ঠিকমত না পাই তাহলে বেঁচে কি করব?'
তা-ও তো বটে। এত বড় দর্শনের পর আর কথা চলে না। চুপ হয়ে গেল কিশোর। তবে খাওয়ার বেলায় দেখা গেল, মুসার চেয়ে আগ্রহ কম নয় তার এই মুহূর্তে। আসলে খিদে তিনজনেরই পেয়েছে।
পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে রবিন বলল, 'পারভি যতক্ষণ ছাড়া আছে, আমাদেরও বিপদ আছে।'
'মনে আছে আমার,' মুসা বলল। 'সে জন্যেই পেট ভরে নিচ্ছি। শক্তি দরকার। ভূতকে ভয় পাই বলে ওরকম একটা ছুঁচো আর তার বান্দরকে ভয় পাব নাকি?'
'বাহ্বা বাহ্বা, এই না হলে মুসা আমান,' মুসার পিঠ চাপড়ে দিল রবিন। দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল। 'কিশোর, স্টীমরুমে একটা কথা বলেছিল ল্যারি। তুমি বললে সূত্র। কোন মানে করতে পেরেছ?'

'ভেনটিলেশন শব্দটার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত জবাব,' কিশোর বলল। 'ক্লাবহাউসের ভেনটিলেশন সিসটেম বিরাট। হয়তো কোন কারণ আছে ওটার কথা বলার। আজ রাতে গিয়ে দেখব। কাজে লাগে ওরকম ছোটখাট কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে যাব সাথে করে।'

'যেমন?' মুসার প্রশ্ন।

'যেমন, লিসেনিং ডিভাইস আর মিনি ট্র্যান্সমিটার। আরও টুকি-টাকি কিছু জিনিস।'

খাওয়ার পরে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর আরেকবার হালকা কিছু খেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রবিনের ফোক্স ওয়াগেনটাই নিল, তবে চালাল মুসা। তার জেলপি নিল না, আধমাইল দূর থেকেও ওটার ভটভটি শোনা যায়। আর যেভাবেই কাজে লাগুক, গোয়েন্দাগিরিতে অন্তত চলবে না ওই জিনিস।

গলফ কোর্সের কাছে এসে পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল মুসা। গাড়ি এনে রাখল একটা জংলা জায়গায়। নামল তিনজনে। জিনিসপত্র বের করে নিয়ে নিঃশব্দে এগোল ক্লাবহাউসের দিকে।

অনেক উঁচু বাড়ি। রাতের বেলা ভেনটিলেটর চোখে পড়ল না। ভালমত দেখতে হলে ওখানে উঠতে হবে। সে জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে কিশোর। সাথে করে স্কেলিং ল্যাডার নিয়ে এসেছে। মুসাকে বলল, 'তুমি এটাকে ধরে রাখো। আমরা উঠছি।'

নিচে থেকে মইটাকে ধরে রাখল মুসা। উঠতে শুরু করল কিশোর। পেছনে দড়ির বাণ্ডিল কাঁধে নিয়ে রবিন ওকে অনুসরণ করল।

খাটো হয়েছে মইটা। ওপরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর, বাকি উচ্চতাটা কিভাবে পার হবে। ছাতে ওঠা প্রয়োজন। ভেনটিলেটরের ওপরে একটা দুই-ইঞ্চি ডায়া পাইপের মাথা বেরিয়ে থাকতে দেখল। ছাতের পানি পড়ার পাইপ। রবিনের হাত থেকে দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এক মাথা খুলে একটা ফাঁস তৈরি করল। এক হাতে মই ধরে রেখে আরেক হাতে পাইপের মাথা সই করে ছুঁড়ল ফাঁসটা। মিস করল। আবার ছুঁড়ল। আবার মিস। তৃতীয়বারের বার ফাঁসটা পাইপ গলে ঢুকে পড়ল। টেনে ফাঁসটা পাইপের গায়ে আঁট করে নিল সে। আরও দু'বার টেনে দেখল ঠিকমত লেগেছে কিনা। তারপর দেয়ালে পা ঠেকিয়ে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাইপের কাছে পৌঁছে ওটা ধরেই শরীর মুচড়ে উঠে গেল ছাতে। নিচে তাকিয়ে রবিনকে ওঠার ইঙ্গিত করল।

রবিনও উঠে পড়ল।

'কিশোর বলল, 'এবার ভেনটিলেটরটা দেখি।'

ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে গলা লম্বা করে ভেনটিলেটরটা দেখতে লাগল দু'জনে। মৃদু গুঞ্জন তুলে চলেছে পাখা। পাশের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল অনেক নিচে আলোকিত ঘর।

'লোকজন আছে মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'দেখি কি বলে?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা লিসেনিং ডিভাইস বের করে তার ধরে যন্ত্রটা ঢুকিয়ে দিল ভেনটিলেটরের ফাঁক দিয়ে। আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল নিচের দিকে।

ইয়ারফোনের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনে। স্পষ্ট শোনা গেল কথা। বেশ জোর গলায় কথা বলছে কয়েকজন মানুষ।

'ল্যারি ব্যাটাকে ধরা দরকার,' বলল একটা কণ্ঠ। 'খোঁজ নিয়েছি। গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের লোক সে। পাক্কা শয়তান। এখনই না আটকাতে পারলে বারোটা বাজাবে আমাদের।'

'তখনই বলেছিলাম আমি, ব্যাটাকে সন্দেহ হচ্ছে আমার,' বলল আরেক কণ্ঠ। ডেংগু পারভির গলা চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। 'শুনলে না। বাতের চিকিৎসা না ছাই! ব্যাটা এসেছে টিকটিকিগিরি করতে।'

'অত ভাল সেজো না,' বলল তৃতীয় আরেকটা কণ্ঠ। 'তুমিই বা কি ভালটা করতে পেরেছ শুনি? খুব তো গলাবাজি করলে, বাহাদুরি করলে, ব্র্যাজিলে একবার পাঠালে আর ফেরত আসতে দেয়া হবে না বিচ্ছুগুলোকে। পাঠিয়ে আরও বেকায়দা হলো। অনেক কিছু জেনে এল আমাদের। তোমাকে চিনে ফেলল। বুঝল, পিটার রেমন নেই ওখানে। কিছু করতে পারলে? পারলে না। এখানে ডিয়ারভিলে থাকলেই বরং ভাল হত, ঠিক সামলে ফেলতে পারতাম আমরা। তাছাড়া অত কিছু জানতেও পারত না ওরা। বেশি চালাকি করতে গিয়েই গোলমালটা বাধালে।'

'ঠিক,' বলল প্রথম লোকটা, 'এখন ওরা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কারণ অনেক কিছু জেনে গেছে আমাদের। ইচ্ছে করলেই এখন বিপদে ফেলতে পারে। পাঠানোর যে কি দরকারটা ছিল ওখানে বুঝি না। এখানেই না হয় ঘুরে মরত আর কিছুদিন। আর যেচে গিয়ে ওদের সঙ্গে তোমারই বা দেখা করার কি প্রয়োজন ছিল?'

ছেলেগুলো এতটা চালাক বুঝতে পারিনি। পারভি বলল, 'ভয় নেই। এখনও কিছু হয়নি। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে, কিছুই হবে না আমাদের। নতুন আরেকটা প্ল্যান করেছি।'

'প্ল্যান তো কতই করো,' বলল দ্বিতীয়জন। 'দেখো, এটাও না ফসকায়।'

'ফসকাবে না। ল্যারি আর ছেলেগুলোকে খতম করে দেব আমরা। তারপর মাল নিয়ে সরে পড়ব। আর কারও কিছু বলার আছে?'

নেই। আলোচনা ওখানেই শেষ করার কথা বলল পারভি। চেয়ার ঠেলার শব্দ হলো।

ডিভাইসটা তুলতে শুরু করল কিশোর। ফিসফিসিয়ে বলল, 'যথেষ্ট শুনেছি। এখনই গিয়ে চীফ নিকলসনকে বলতে হয়।'

কয়েক গজ উঠেই কিসে যেন আটকে গেল ডিভাইসটা। জোরে টান দিল কিশোর। ছুটে এল বটে যন্ত্রটা, কিন্তু ঝটকা লাগায় ধাতব কিছুতে বাড়ি লেগে খটাং করে উঠল। শুনে ফেলল নিচের লোকেরা।

'কিসের শব্দ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পারভি।

'নিশ্চয় ভেনটিলেটর শ্যাফটে উঠেছে কেউ!' বলল আরেকজন।

'জলদি খবর দাও এরিককে,' হুকুম দিল পারভি। 'গার্ড পাঠাক। সিগন্যাল লাইট জ্বেলে দাও! হাঁ করে আছ কেন? জলদি যাও!'

ছাতের কোণ থেকে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল আলোক সংকেত। ডিভাইসটা ছেড়ে দিল কিশোর। ওটা টানাটানি করে সময় নষ্ট করার আর কোন মানে হয় না।

দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে গিয়েই লক্ষ্য করল, মইটা নেই। কি হয়েছে দেখার জন্যে টর্চ জ্বালল। না, মইয়ের চিহ্নও নেই। কিছু একটা হয়েছে। মইয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্যভাবে নামার কথা ভাবল সে। 'এসো,' বলেই ছাতের ওপর দিয়ে দৌড় দিল অন্য পাশে চলে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু ওখানে এসেও নামার কোন উপায় দেখতে পেল না।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ট্র্যাপডোরের ঢাকনা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল তিনজন অস্ত্রধারী প্রহরী। ধরে ফেলল দুই গোয়েন্দাকে। ট্র্যাপডোর দিয়ে নামিয়ে আনল একটা লিফটের মধ্যে।

নিচে নেমে থামল লিফট। বেরিয়েই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল কিশোর আর রবিন। আরও পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়। কুৎসিত ভয়ংকর চেহারা।

বানরের মুখোশ পরেছে ওরা!

'অতিকায় পাঁচটা হাউলার মাংকি!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'ঠিক বলেছ,' ওর কথা শুনে ফেলেছে পারভি, বেরিয়ে এল এক পাশ থেকে। 'হাউলার মাংকিরই দর্শন পাবে তোমরা। এবং আসলটার। এই, ছেড়ে দাও ওকে।'

ঘরের কোণের খাঁচাটা চোখে পড়ল গোয়েন্দাদের। ওটার দরজা খুলে দিল একজন লোক। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে এল আসল হাউলার মাংকি। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিক করে উঠল ক্ষুরধার দাঁত। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসতে লাগল কিশোর আর রবিনের দিকে।

আঠারো

আরও কাছে এলে বানরটার হাতে একটা ধারাল ছুরি ধরিয়ে দেয়া হলো। সেটা নাচিয়ে শরীর দুলিয়ে কিশোর আর রবিনকে ঘিরে এক অদ্ভুত নাচ শুরু করল ওটা। সেই সাথে তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'আরি!' অবাক হয়ে ভাবল কিশোর, 'এ তো ম্যাকুমবা নাচ! বেলিজে যেটা দেখেছি!'

বানরটাকেও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে ভুডুর ওই নাচ। নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল বানরটা। ছুরি তুলে রেখেছে। আরেকটু এগোলেই ছুরি মারতে পারবে কিশোরের গায়ে। ওটার মাথার ওপর দিয়ে সে আর রবিন দু'জনেই দেখতে পেল নিঃশব্দে খুলে গেল একটা দরজা। মুখোশ পরা আরেকজন লোক ঢুকল। কিশোরকে মারার জন্যে ছুরিটা তুলেছে হাউলার মাংকি, ঠিক এই সময় পকেট থেকে পিস্তল টেনে বের করে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'থামো!'

ডাক শুনে চমকে গিয়ে ফিরে তাকাল বানরটা। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। এক থাবায় চেপে ধরল বানরটার ছুরি ধরা হাত। ওটার আরেক হাত চেপে ধরল রবিন। আটকে ফেলল জানোয়ারটাকে। পিস্তল দেখিয়ে তখন অন্যদের অস্ত্র ফেলার আদেশ দিচ্ছে আগন্তুক। বানরটাকে টেনেহিঁচড়ে খাঁচার কাছে নিয়ে

চলল দুই গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।

'থ্যাংকস,' আগন্তুককে বলল কিশোর। 'ঠিক সময়ে এসেছেন।'

মুখোশ টেনে খুলল ল্যারি। নড়ে উঠল পারভির দলের একজন, একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারল ল্যারিকে সই করে। হাতে লেগে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল। আরও দু'জন ঝাঁপ দিল ল্যারির দিকে। বাকি তিনজন ধরতে এল কিশোর আর রবিনকে।

জুডোর প্যাঁচ কষে একজনকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল কিশোর। আরেকজনের ঘাড়ে কারাতের কোপ বসাল রবিন। পড়ে গেল এই লোকটাও। তৃতীয়জনের সঙ্গে লাগল দু'জনে মিলে।

ল্যারিও মারপিট কম জানে না। দেখতে দেখতে চিত করে দিল দু'জনকে। মেঝে থেকে আবার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল। একে একে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। ওদেরকে দেয়ালের কাছে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলল। আদেশ মানতে বাধ্য হলো ওরা। গোমড়া মুখে চলে গেল দেয়ালের কাছে।

দরজা খুলে গেল আবার। ছুটে ভেতরে ঢুকল মুসা আমান। পেছনে ঢুকলেন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন, চীফ নিকলসন আর কয়েকজন পুলিশ।

'আপনি!' সাইমনের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'আপনাকে পেল কোথায়?'

'চীফ নিকলসনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। একটা লোক ধরা পড়েছে, ওর কাছে জাল পাসপোর্ট ছিল। ডিয়ারভিল থানায় নিয়ে আসা হয় ওকে। জানতে পেরে আমিও ছুটে আসি। অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের খবর ফাঁস করে দিচ্ছিল সে-ই, এই সময় ছুটতে ছুটতে থানায় ঢুকল মুসা।'

'তোমরা ছাতে উঠে যেতেই একটা লোককে আসতে শুনলাম,' দুই বন্ধুকে জানাল মুসা। 'মইটা নিয়ে চট করে সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম গাছের আড়ালে। তার একটু পরেই দেখি আলো জ্বলতে শুরু করেছে। কোন উপায় না দেখে দৌড় দিলাম থানায়।'

'এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে?' কিশোর বলল, 'তবে ল্যারি না এলে এতক্ষণে হাসপাতালে যাওয়ার অবস্থা হয়ে যেত আমাদের।'

ল্যারির প্রশংসা করতে লাগলেন সাইমন।

তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে ল্যারি বলল, 'আসল কাজটা তো ওরাই করেছে। মুখোশটা আনতে না পারলে অত সহজে ঢুকতে পারতাম না আমি।'

দেয়ালের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর মুখের মুখোশ এক এক করে খুলতে লাগল একজন পুলিশ অফিসার। চতুর্থ মুখোশটা খুলতেই বলে উঠল রবিন, 'গামু!'

কিশোর বলল, 'বেলিমের ওঝা এখানে কি করছে? তার মানে আমেরিকান ক্রিমিন্যাল গিয়ে ব্র্যাজিলে ওঝা সেজেছিল?'

লজ্জা দেখা দিল গামুর চোখে।

নিচের ঠোঁট ধরে টান দিয়ে ছেড়ে দিল একবার কিশোর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গামুর দিকে। ওঝার মুখে হাত বোলাল একবার। চোয়ালের নিচে একটা আঙুল ঢুকিয়ে আচমকা টান মেরে খুলে আনল আরেকটা মুখোশ। এ-কি! এ যে মিস্টার ড্যানিয়েল রেমন!

'আশ্চর্য!' বিশ্বাস করতে পারছেন না সাইমন। 'রেমন, আপনি!'

'আশ্চর্য আরও আছে,' ল্যারি বলল। 'দাঁড়ান, নিয়ে আসি।' কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরেকজনকে। এক তরুণ। লম্বা লম্বা চুল। চোখের চশমা বোকা বোকা করে তুলেছে মুখটাকে। ফ্যাকাসে চেহারা।

'এই হলো পিটার রেমন,' ল্যারি বলল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

রবিন বলল, 'আমাদের নাকের ডগাতেই বসে ছিল, আর আমরা ঘুরে এলাম সেই কোন কোন দেশ থেকে! আসলে ইচ্ছে করে ভুল পথ দেখানো হয়েছিল আমাদের।'

'আমি আশা করেছিলাম,' পিটার বলল, 'আরও অনেক আগেই আমাকে বের করে ফেলবে তোমরা। আমাকে আটকে রেখেছিল শয়তানগুলো। ল্যারি আজ না দেখলে মেরেই ফেলত।'

ল্যারিকে বলল কিশোর, 'খুলেই বলুন না সব।'

জবাব দিলেন সাইমন, 'আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছে ল্যারি। আমিই ওকে বুদ্ধি দিয়েছিলাম হেলথ ক্লাবে রোগী সেজে আসতে। ব্যবসাটা ভালই খুলেছিল ডেংগু পারভি। প্ল্যাস্টিক সার্জারির ব্যবস্থা রেখেছিল। দাগী আসামীদের চেহারা বদলে দিয়ে, জাল পাসপোর্ট করে ওদেরকে নতুন পরিচয় দিয়ে দিত। প্রচুর টাকা নিত বিনিময়ে।'

'এরকম একটা কাজ এতদিন ধরে কি করে চালিয়ে গেল ওরা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন, 'অলিম্পিক হেলথ ক্লাবের মত এরকম একটা জায়গা...'

'অসুবিধে হয়নি,' ল্যারি বলল। 'এই ঘরটাতেই চলত ওদের যত শয়তানী কর্মকাণ্ড। পুরো বাড়ি থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এটাকে, ফলে ম্যানেজার আর তার চ্যালারা ছাড়া ক্লাবের আর কেউ কল্পনাই করতে পারত না এখানে এই কাণ্ড চলছে। ছাতে আলো জ্বলতে দেখেছ তোমরা। সংকেত দিত ম্যানেজার, ওর চ্যালাদের উদ্দেশ্যে, বাইরের কেউ ঢুকেছে কিনা দেখার জন্যে।'

নীরবে ফুঁসছে পারভি। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল ল্যারিকে, 'ঘরটা খুঁজে বের করলেন কি করে? পুলিশের সাথে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমরা, তখন তো পাইনি?'

'গোপন পথে ঢুকতে হয়। জানা না থাকলে কিংবা খোলা না থাকলে দরজা দেখতেই পাবে না কেউ। ঢোকার আরও একটা পথ আছে। ওপর থেকে, লিফটে করে। এই ঘরেই ওই যে দরজাটা দেখছ, ওটা দিয়ে অপারেটিং রুমে ঢোকে। ওখানে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করা হয়। কে করত জানো? ডানিয়েল রেমন ওরফে গামু।'

আরেকবার তাঁর দিকে তাকাল কিশোর, 'আর আমরা কিনা তাঁকে ভেবেছি ভুডুর ওঝা!'

'লজ্জাই লাগছে আমার বলতে,' পিটার বলল, 'ওদের এই সব অপরাধের কথা জেনে ফেলেছিলাম আমি। সে জন্যেই আমাকে ধরে এনে আটকে রেখেছিল এখানে।'

'তার মানে তুমি বাড়ি থেকে পালাওনি?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল পিটার। 'আমার আব্বা ক্রিমিনালদের সাথে জড়িয়ে পড়েছে

শুনেই ঝগড়া শুরু করি। তারপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে তৈরি হই। ব্যাংকে যাই টাকা তোলার জন্যে। ম্যানেজার আব্বাকে ফোন করে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে ধরে আনে আব্বা।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। পায়চারি শুরু করল। বলল, 'পালানোর চেষ্টা করেছি আমি। দুই দুইবার পালিয়েছিলাম। কিন্তু আবার ধরে আনা হয়েছে আমাকে। আলোর সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দেয়া হত প্রহরীদেরকে বন্দি পালিয়েছে...হুইসপারউড থেকে ধরে আনা হয়েছে আমাকে দু'বারই...'

'আমাদের জানালা দিয়ে বলটা তাহলে তুমিই ছুঁড়েছিলে?' অনুমান করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আলো দেখে আমি ভেবেছিলাম, জনি আছে ঘরে। জানতাম না, তোমরা আছ। সে আমার বন্ধু। তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম গলফ ক্লাবে আটকে রাখা হয়েছে আমাকে। আরেকবার চলে গিয়েছিলাম প্রপাতের কাছে। আম্মা টের পেয়েছিল। ছুটে গিয়েছিল আমার কাছে। স্নিক লোকজন নিয়ে এসে আবার ধরে নিয়ে যায় আমাকে। তৃতীয়বার বেরিয়ে আর গলফ কোর্সই পেরোতে পারেনি।'

'পিটার,' রবিন বলল, 'তোমাদের আম্মা বাড়ি নেই, নিখোঁজ হয়েছেন, জানো একথা?'

'আম্মা নিখোঁজ?'

কাশি দিলেন চীফ নিকলসন। বললেন, 'তিনি আর নিখোঁজ নন। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। খবর পেয়েছি আমরা।'

'এটাও তাহলে আব্বার কাজ। কাউকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে,' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল পিটার। 'আসলে আম্মার কোন রোগই নেই। আব্বার কাজকর্মে অসুস্থ হয়ে গেছে। আমি নিখোঁজ হওয়াতে নিশ্চয় অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।'

মুখ নামিয়ে রেখেছেন মিস্টার রেমন। লজ্জায় মাথা তুলতে পারছেন না। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কেন একাজ করলেন, মিস্টার রেমন?'

'টাকা!' বললেন তিনি। কিশোরের মনে হলো, বহুদূর থেকে কথা বলছে একজন মানুষ, কণ্ঠটাও অপরিচিত। 'সার্জন ছিলাম ভালই ছিলাম। টাকা ছিল না, কিন্তু জীবনে শান্তি ছিল। তারপর কি যে হলো, টাকার লোভ হলো। শুরু করলাম ব্যবসা, ভালই কামাতে লাগলাম। হুইসপারউডে বাড়ি কিনলাম। লোভ বাড়তেই থাকল। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে বসলাম। গেল লোকসান হয়ে। সব কিছু যেতে বসল। মরিয়া হয়ে টাকা ধার করলাম, ব্যবসা বাঁচানোর জন্যে, চড়া সুদে। ডেংগু পারভির কাছ থেকে। এক বন্ধু যোগাযোগ করে দিয়েছিল। টাকা নিয়েও কিছুই করতে পারলাম না। ব্যবসা ডুবলই। ওদিকে সুদেআসলে মিলে টাকার অঙ্ক লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়তে লাগল। সুযোগ বুঝে অফার দিয়ে বসল আমাকে ডেংগু, তার কাজ করে দিলে টাকা তো শোধ করতেই হবে না, বাড়তি আরও দেবে। কি আর করব? রাজি হয়ে গেলাম। পিটারকে আটকে রাখবে ওরা, একথায় রাজি হয়েছি একটামাত্র কারণে, ও বেঁচে থাকবে। সব জেনে ফেলেছিল বলে বাইরে থাকলে ওকে মেরেই ফেলত ডেংগু...'

'ফেললে ফেলত! আমি কি তোমাকে অপরাধ করে টাকা কামাতে বলেছিলাম?'

'আর লজ্জা দিসনে পিটার...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'পিটারের খবর আপনি জানেন, তার পরেও তাকে খোঁজার জন্যে আমাদের কেন ডাকলেন?'

'আমার স্ত্রীকে শান্ত করতে। পিটারের জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিল সে। তোমাদেরকে কাজে লাগিয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, যে পিটারকে খোঁজা হচ্ছে...'

'নোটটা তাহলে আমার পকেটে আপনিই রেখেছিলেন,' রবিন বলল।

'বেকার ঘুরিয়ে আনলেন আমাদের ব্র্যাজিল থেকে,' বলল কিশোর। 'আর আমরা পারলাম না বলে কি ধমকটাই না দিলেন। কিন্তু ওখানে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করা হলো কেন?'

'আমি মারতে চাইনি,' রেমন বললেন। 'ডেংগুর কাজ। সে বলল, ওখানে গিয়ে কিছু ডর্‌ভয় না দেখালে তোমাদের সন্দেহ জাগতে পারে। ও যে সত্যি সত্যিই মেরে ফেলতে চাইবে কল্পনাই করিনি। নিশ্চয় এমন কিছু জেনে গিয়েছিলে তোমরা, যা তার জন্যে হুমকি হয়ে গিয়েছিল...'

রেমনের কথা এখন ছিঁচকাঁদুনী মনে হতে লাগল রবিনের। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ল্যারিকে জিজ্ঞেস করল, 'রোগী হওয়াতেই বোধহয় আপনি জেনেছিলেন ভেন্টিলেটর দিয়ে এঘরের ওপর চোখ রাখা যায়? আমাদের সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন?'

'জেনেছি রোগী সাজাতেই। ভেন্টিলেটরের কথা বলে বোঝাতে চেয়েছিলাম, যত সব শয়তানী ভেন্টিলেটরের নিচের ঘরটাতেই হয়।'

'যাক,' সাইমন বললেন, 'সব রহস্যেরই সমাধান তাহলে হলো।' নিকলসনের দিকে ফিরলেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? যাওয়া যাক...'

'একটু দাঁড়ান,' হাত তুলল কিশোর। 'একটা রহস্যের কিনারা এখনও হয়নি।' বানরের খাঁচাটার কাছে চলে এল সে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাউলারটা। 'রবিন, মুসা, একটু এসো তো। সাহায্য করো আমাকে। কি কারণে রেগে যায় বানরটা দেখতে চাই।'

খাঁচার দরজা খুলল সে। খ্যাঁচখ্যাঁচ করে উঠে পিছিয়ে গেল বানরটা। রবিন আর মুসা এসে চেপে ধরল ওটাকে। জোর করে ওটার মুখ থেকে একটা মুখোশ খুলে নিল কিশোর। মুখোশটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল বানরটা। জুলজুল করে তাকাল ওদের দিকে। যেন বোঝার চেষ্টা করছে কে ওকে একমুঠো বাদাম কিংবা একটা কলা উপহার দেবে।

'অবাক কাণ্ড!' পায়ে পায়ে খাঁচার কাছে চলে এসেছেন সাইমন। 'মুখোশ পরলেই মনে হয় রেগে ওঠে বানরটা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর, 'এর কারণ আছে।' মুখোশটা উল্টে ফেলতেই কানের ফুটোর কাছে লাগানো ছোট ছোট দুটো ইয়ারফোন বেরিয়ে পড়ল। 'রেডিওতে সংকেত দিয়ে কেউ আদেশ দিত বানরটাকে।'

পারভির দিকে তাকাল কিশোর। দৃষ্টি স্থির হলো শার্টের কলারের ওপর।

জায়গাটা ফুলে আছে মনে হলো। উসখুস করতে লাগল পারভি। চোখ ফিরিয়ে নিল।

তার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। শার্টের কলারের নিচে থেকে বের করে নিল একটা কলার মাইক, তার আর একটা সাউণ্ড সেনডিং ইউনিট। সাইমন আর নিকলসনের দিকে ফিরে বলল, 'খুব আস্তে বিড়বিড় করে আদেশ দিত পারভি। সেটাই অনেক বেশি জোরাল হয়ে গিয়ে ঢুকত ইয়ারফোনে, যন্ত্রগুলো কানের ফুটোতে লেগে থাকায় বিকট শব্দ হত, সহ্য করতে পারত না বানরটা, খেপে গিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। লোকটা মানুষ না, একটা পিশাচ।'

পকেট থেকে বিস্কুট বের করে বানরটাকে খেতে দিল মুসা। মুহূর্তে ওটা তার বাধ্য হয়ে গেল। হাউলারের এখনকার চেহারা দেখে বিশ্বাসই করা যায় না খানিক আগে ওটাই ছুরি মারতে গিয়েছিল কিশোরকে।

'বেলিমে আমাদের হোটেলে চুরি করতে ঢোকার সময় কিন্তু ওর মুখোশ ছিল না,' রবিন বলল।

'সে জন্যেই তো খেপেনি।'

'মনে হচ্ছে, গ্রাও পারার ক্লার্কটাও ডেংগুর দলের লোক। কিংবা টাকা খাইয়ে বশ করেছে ওকে।'

'তা তো করেছেই।' পারভির দিকে তাকাল কিশোর, 'আগেই নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছিলেন ক্লার্ককে জ্যাকেটটা সাজিয়ে রাখতে?'

একটা মুহূর্ত দৃষ্টির আগুনে কিশোরকে ভস্ম করার চেষ্টা চালাল পারভি। ব্যর্থ হয়েই যেন চোখ ফিরিয়ে নিল আরেক দিকে। জবাব দিল না।

'অসুবিধে নেই,' নিকলসন বললেন। 'চেহারার বর্ণনা আর নামঠিকানা দিয়ে ব্র্যাজিল পুলিশকে জানিয়ে দেব। সব ক'টা শয়তানকে ধরে জেলে ভরবে।'

'আরেকটা কথা,' মুসা এক আঙুল তুলল, 'আমাকে পিস্তলের জন্য ফোন করেছিল কে?'

'আর কে?' জবাব দিল কিশোর। 'এই পালের গোদাটিরই কাজ। জনাব ডেংগু পারভি।'

আসামীদের নিয়ে চলে গেলেন চীফ নিকলসন। মিস্টার সাইমন আর ল্যারিও রওনা হয়ে গেলেন রকি বীচে। সে রাতটা হুইসপারউডের গেস্ট হাউসে তিন গোয়েন্দাকে কাটিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল পিটার। রাজি হয়ে গেল ওরা।

গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'শেষ দিকে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি থেকে পালিয়েছ তুমি। প্রচুর টাকা ছিল সাথে। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে চেহারা বদলে নিয়েছ। বাড়িটা তোমার কাছে জেলখানা ছিল বলেই ওরকম করে মুক্ত করে নিয়েছ নিজেকে।'

'কেন হলো এই ধারণা?'

'তোমার কবিতা পড়ে। তোমার টেবিলের ড্রয়ারে পেয়েছি। ওটাকে সূত্র ভেবেছি।'

মুচকি হাসল পিটার। 'ভুল করেছ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কি জন্যে লিখেছিলে ওটা? মানে কি?'

'যে লিখেছে সে জানে।'

'তুমি লেখোনি!'

'না। একটা ম্যাগাজিন থেকে টুকে রেখেছিলাম, ভাল লেগেছিল বলে। তবে মনে হয়েছিল আমার জীবনের সাথে মিলে যাচ্ছে।'

-ঃ শেষ ঃ-

ভলিউম ২০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০